মাসুদ রানা
আক্রমণ
দুইখন্ড একত্রে
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা
প্রকাশনী

মাসুদ রানা

আক্রমণ

দুইখন্ড একত্রে

কাজী আনোয়ার হোসেন

আতাসী ভয়ানক বিপদে। মার্শিয়ার চোখে জল। তাই মধ্যপ্রাচ্যের এক প্রতিরক্ষা কেন্দ্রে মিথ্যা পরিচয়ে অনুপ্রবেশ করতে হল রানাকে। এয়ারফাইটার স্টেশনটিকে ঘিরে ফেলেছে ইসরাইলি চক্রান্তের জাল, খুব শীঘ্রি আসছে চূড়ান্ত আক্রমণ।

সময় ফুরিয়ে আসছে দ্রুত। তুঙ্গে উঠছে সন্দেহ আর অবিশ্বাস। এখন নিজের হাতে আইন তুলে না নিলে বাঁচানো যাবে না আতাসীকে।

কী করবে রানা?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুমঃ ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০
প্রজাপতি শো-রুমঃ ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০

মাসুদ রানা - ৬১, ৬২

আক্রমন ১,২

লেখকঃ কাজী আনোয়ার হোসেন

কৃতজ্ঞতায়ঃ তৌকির কবির তুষার

স্ক্যান ও এডিটঃ ফয়সাল আলী খান

ফ্রন্ট এবং ব্যাক কাভারঃ শ্যামল শাইখ

রানা ভলিউম ১৯

আক্রমণ

[দুইখণ্ড একত্রে]

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী
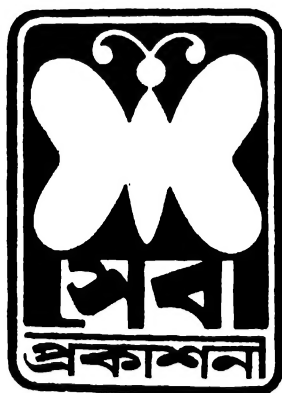
ISBN 984-16-7419-X

প্রকাশক ঃ
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

ভলিউম মুদ্রণঃ অক্টোবর, ১৯৯৩

প্রচ্ছদ পরিকল্পনাঃ আসাদুজ্জামান

রচনাঃ বিদেশী কাহিনী অবলম্বনে

মুদ্রাকরঃ
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানাঃ
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপনঃ ৮৩৪১৮৪
জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০

শো রুমঃ
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Rana Volume-19
AKROMAN
By: Qazi Anwar Husain

ছত্রিশ টাকা

সেবা'র আরও ক'টি সিরিজের ভলিউম

কিশোর থ্রিলার

ওয়েস্টার্ন

কুয়াশা

জুলভার্ন

পটভূমি

প্যালেস্টাইনী মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়স্থল লেবাননের ওপর শ্যেনদৃষ্টি পড়েছে ক্রমাগত গেরিলা আক্রমণে অতিষ্ঠ ইসরায়েলের। তার উদ্দেশ্য পূরণের হাতিয়ার হয়ে উঠলো উগ্র দক্ষিণপন্থী খ্রীস্টানদের ফালাঞ্জিস্ট পার্টি। শুরু হল মুসলমান ও খ্রীস্টানদের মধ্যে দাঙ্গা, পরে তা পরিণত হল রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধে। লেবাননের শতকরা ৫৫ জন অধিবাসী মুসলমান, সমানাধিকারের ভুয়া দাবি তুলে ফালাঞ্জিস্টরা আসলে রক্তপাতের মাধ্যমে চাইল মুসলমানদেরই সংখ্যালঘু বানাতে। কিন্তু সিরিয়া ও অন্যান্য আরবদেশের হস্তক্ষেপে শেষ পর্যন্ত কোণঠাসা হয়ে গেল ফালাঞ্জিস্টরা. পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন প্রেসিডেন্ট সুলেমান ফ্রাঞ্জি। উদার ও বামপন্থী খ্রীস্টানরা এগিয়ে এলেন লেবাননের শান্তি ফিরিয়ে আনার কাজে। বিপদ দেখলো ফালাঞ্জিস্টরা, আর তাদের মরণ-কামড় দেয়ার শেষ সুযোগ করে দিতে ভয়ংকর ষড়যন্ত্র নিয়ে এগিয়ে এল ইসরায়েল...।

আক্রমণ ১

প্রথম প্রকাশঃ জুন, ১৯৭৮

এক

নাবাতিয়া। লেবানন।

এয়ারফাইটার স্টেশনটার পুবদিকে ধু-ধু মরুভূমি, একটা ঘাস পর্যন্ত নেই কোথাও। দিগন্তরেখার কাছে অস্পষ্ট পাহাড়টাকে পিরামিড আকৃতির এক টুকরো মেঘের মত দেখাচ্ছে। উত্তর এবং পশ্চিমে ছাড়াছাড়া ভাবে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়, মাঝেমধ্যে চোখে পড়ে ছোট ছোট ঝোপ। দক্ষিণে গড়ে উঠেছে শহর। ছোট ছোট বাড়িঘর, নিচু পাহাড় আর সবুজ গাছপালার সমারোহ ওদিকে।

এইমাত্র পজিশন নিয়েছে ওরা গানপিটে। এখনই কিছু দেখতে পাওয়ার কথা নয়, তবু আকাশের দিকে স্থির হয়ে আছে কয়েকজোড়া নিষ্পলক চোখ।

মাথার উপর থেকে ক্রমশ ঢালু হয়ে নেমে গেছে নীলচে আকাশ। এক ফোঁটা মেঘ নেই কোথাও। নিঃসঙ্গ একটা চিল শুধু চক্কর মারছে মাথার উপর। চিলটাকে দেখে কেন যেন রেবেকার কথা মনে পড়ে গেল রানার। বুকের কাছে কোমল একটি স্থানে মুহূর্তে বিঁধলো এক শূন্যতা।

পজিশন নেয়ার বিশ সেকেন্ড পর ঝন ঝন শব্দে নিস্তব্ধতা ভাঙল টেলিফোন। অপারেশন কন্ট্রোলরুম থেকে জানিয়ে দেয়া হল সঙ্কেতঃ

এক ঝাঁক পাখি আসছে ডিম পাড়তে। দক্ষিণ পশ্চিম দিক থেকে।

সংখ্যা? জানা নেই।

নিশ্চল মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকল ওরা। চোখ কুঁচকে সূর্যের চারদিকে দৃষ্টি ফেলছে। একটা অস্পষ্ট গুঞ্জন শুনতে পাওয়ার আশায় সজাগ রেখেছে কান।

আরও দেড় মিনিট পেরিয়ে গেল। পাঁচটা বাজে এখন। আগের অবস্থাই, কোথাও কোন শব্দ নেই।

এক এক করে কাটল আরও তিনটে নিঃসাড় মিনিট। সেই একই অবস্থা। তারপর হঠাৎ অলস বাতাসে ভর করে ভেসে এল শব্দ। অস্পষ্ট একটা গুঞ্জন।

আসছে।

জাফরীর চোখে ধরা পড়ল প্রথম। ঠিক যেন সূর্যের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল এক ঝাঁক পায়রা।

একসঙ্গে, একভাবে উড়ে আসছে প্লেনগুলো। ঝাঁকের আকৃতি অটুট রাখার জন্যে একটু কাত হয়ে সামান্য উপরে উঠে গেল তৃতীয় সারির মাঝখানের প্লেনটা, রোদ লেগে পলকের জন্যে ঝিলিক দিল তার ডানা।

ফাইটার স্টেশনের পুবে এবং পনেরো থেকে বিশ হাজার ফুট উঁচুতে এখন ওগুলো। একযোগে নিচে নামছে গোটা ঝাঁক। কিন্তু সরাসরি ফাইটার স্টেশনের দিকে আসছে না। পনেরো হাজার ফুট উপর দিয়ে এগোচ্ছে অ্যারোড্রামের উত্তর-পুব প্রান্তের দিকে। ওদের আক্রমণের লক্ষ্য পাশের এদ্ দায়রা না নাবাতিয়া, ঠিক বুঝতে পারছে না এখনও রানা।

'কি ওগুলো?' বিরক্তির সাথে জানতে চাইল হুসাইন কাফা। গোটা বিমান-যুদ্ধটাই তার মতে ফালতু একটা ব্যাপার। ওর প্রিয় অস্ত্র, সবাই জানে, খাপমুক্ত বেয়োনেট।

'ক্যানবেরা নাকি?' বলল কুতুব দীন।

ভেঙচে উঠল জাফরী। 'চোখের মাথা খেয়েছ? ক্যানবেরার নাক অমন ছুঁচালো হয় না, কতবার বলব এই এক কথা? ওগুলো B-58A হাসলার।'

জাফরী থামতেই খুক্ খুক্ করে কেশে উঠল বম্বারডিয়ার সাইয়িদ হাকাম।

নাবাতিয়াকে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে ঝাঁকটা। প্রতি মুহূর্তে নিচে নামছে। যাচ্ছে এদ্ দায়রার দিকে।

তারপর চোখের পলকে লিডার প্লেনটা হঠাৎ পুরো কাত হয়ে ঝাঁক থেকে একাকী উঠে গেল। পরমুহূর্তে তাকে অনুসরণ করল ঝাঁকের আরও দুটো প্লেন। বিরাট একটা বৃত্ত রচনা করার ভঙ্গিতে ছুটছে বম্বার তিনটে। ওদের আক্রমণের লক্ষ্য নাবাতিয়া না এদ্ দায়রা, এখনও ঠিক বোঝা গেল না। বৃত্ত রচনার ফাঁকেই লিডারটা সিধে হল, কিন্তু স্থির থাকল না সেই অবস্থায়। ধীরে ধীরে আবার কাত হল সে। ডানদিকের ডানার আগাটা মাটির দিকে এখন। তিন সেকেন্ড মাত্র, তারপরই গোত্তা খাওয়ার ভঙ্গিতে নামতে শুরু করল নিচে। ঠিক পিছনেই রয়েছে অন্য দুটো প্লেন।

ঝাঁক থেকে এক এক করে কাত হয়ে বেরিয়ে আসছে, ডাইভ দিয়ে নামছে নিচে। পিটের ভিতর কথা নেই কারও মুখে। দম বন্ধ করে রেখেছে সবাই, বোমার আওয়াজ শোনার অপেক্ষায় আছে।

হুসাইন কাফা এই প্রথম দেখছে ডাইভ অ্যাটাক। শিকারী ঈগলের মত বোমারুগুলোকে নামতে দেখে হাত দুটো নিশপিশ করে উঠল তার।

কালিঝুলি মাখা শার্টের আস্তিন দিয়ে কপালের ঘাম মুছল গানার রানা। অ্যান্টি-এয়ারক্র্যাফ্ট গানের কোন শব্দ নেই। ওদের ফাইটারগুলোর একটাকেও আকাশে দেখা যাচ্ছে না। ওদের এবং হেদোগ আকুরার মাঝখানে পড়ে আছে প্রতিরোধে অক্ষম এদ্ দায়রা। আক্রমণটা হত্যাযজ্ঞ ছাড়া কিছু নয়।

'ওই শুরু হল!'

বম্বারডিয়ার গওহর জুমলাতের কথা কানে ঢুকতে চোখ কুঁচকে তাকাল রানা। চিক চিক করে উঠল রোদ লেগে বোমাগুলোর সাদা সাদা গা। বোমা প্রসব শেষ করে আকাশে সমান্তরাল হল লিডার। নাক উঁচু করে উঠে যাচ্ছে উপরে। বাকি প্লেনগুলো এক এক করে অনুসরণ করছে তাকে। রানার মনে হল, বোমার এই অবিরাম প্রপাত

বুঝি কখনও থামবে না আর।

শেষ বোমারুটা সমান্তরাল হয়ে উঠে যাচ্ছে, এই সময় মাটির দিকে তাকাল ও। মরু-উত্তাপে ধূসর প্রান্তরটা ঝাপসা। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর এদ্ দায়রার হ্যাঙ্গার আর কাটাকুটি দাগের মত রানওয়ে দেখতে পেল ও। ঠিক মাঝখানের একটা জায়গার মাটি আর পাথর ছিটকে উঠল উপরে। কয়েক মুহূর্ত পরই এল ভারি, ভরাট বিস্ফোরণের শব্দ। পায়ের তলার মাটি কাঁপতে থাকল থরথর করে।

ঠিক তখনই কে যেন বলল, 'এবার এদিকে আসছে শালারা!'

আবার সেই ঝাঁকের আকৃতি নিয়েছে বোমারুগুলো। মোট এগারোটা, প্রত্যেকটি কাত হয়ে আছে। প্রতিমুহূর্তে উঠে যাচ্ছে উপরে, সেই সাথে এগিয়ে আসছে নাবাতিয়ার দিকে।

শব্দ হতে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা। কাঁপা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে অস্পষ্ট শব্দ বেরিয়ে আসছে কাফার। চোখ দুটো আতঙ্কে বিস্ফারিত। বোমারুগুলো মাথার উপর, দশ হাজার ফুট উঁচুতে পৌঁছেচে। কি ঘটতে যাচ্ছে তা এখন অনুমান করার সময় পর্যন্ত নেই কারও।

তিন ইঞ্চি অ্যান্টি-এয়ারক্র্যাফট গানের বিকট শব্দে হকচকিয়ে গেল কাফা। আগেই সাবধান করে দেয়া হয়েছিল তাকে, তবু কয়েক সেকেন্ডের জন্যে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে। তারপরই অবশ্য ছোঁ মেরে কেড়ে নিল সে রানার হাত থেকে তৃতীয় শেলটা।

দ্বিতীয় শেলটা বেরিয়ে যাচ্ছে। চোখ ধাঁধানো আগুনের আলো দেখা গেল গান-মাজলে। কামানটা পিছন দিকে ধাক্কা খেয়েছে, অমনি আগুনের লকলকে শিখা উড়ে এসে পিছনের ব্রীচ রিঙটাকে ঢেকে ফেলল মুহূর্তের জন্য।

গানলোডিংয়ের দায়িত্বে রয়েছে কাফা। রানার মুখের দিকে তাকাবার ফুরসত নেই তার এখন। শেল নিয়ে লোড করাতেই সে ব্যস্ত, আকাশের দিকে তাকাচ্ছেই না—ভুলেও। ভয় তাড়াবার এটা একটা কৌশল তার বিপদকে দেখতে না পেলে ভয় কিসের?

শেল হস্তান্তর করার ফাঁকে চট্ করে মুখ তুলল রানা। প্রকাণ্ড কালো একটা ক্রস চিহ্নের মত দেখাচ্ছে এখন ঝাঁকটাকে, ঠিক মাথার উপর। হালকা সবুজ রঙের ডানা বোমারুগুলোর, খাড়া হয়ে আছে মাটির দিকে। ওদের শেলগুলো যেখানে বিস্ফোরিত হচ্ছে সেখানে ছোট্ট সাদা ধোঁয়া দেখা গেল। এক সেকেন্ড পরই চোখ নামিয়ে নিল ও। ডিটাচমেন্ট কমান্ডার গওহর জুমলাত হুঙ্কার ছাড়ল, 'সিজ ফায়ার!'

হাতে এখন একটা সেল রানার। থমকে গেল ও। নৈরাশ্যে ছেয়ে গেল মনটা। কিছুই নামাতে পারেনি ওরা।

রানার পিঠ চাপড়ে দিল ডিটাচমেন্ট কমান্ডার। 'ওয়েল ডান, গানার মাসুদ রানা। এই তোমার প্রথম অভিজ্ঞতা, তাই না? নার্ভাস হয়ে পড়োনি দেখে খুব খুশি হয়েছি।'

আর সব গানাররা চেয়ে আছে রানার দিকে। একটা হাসি ফুটতে যাচ্ছিল,

মাঝপথে সেটাকে ঠোঁট থেকে মুছে ফেলল ও। টান টান করল বুকটা। 'প্যালেস্টাইনী মুক্তিযোদ্ধা আমি, কমান্ডার। নার্ভাস হওয়া নয়, ইসরায়েলকে নার্ভাস করাই আমার প্রতিজ্ঞা।' আরেকবার রানার পিঠ চাপড়ে দিল ডিটাচমেন্ট কমান্ডার জুমলাত।

লেবানীজ আর্মির খ্রীষ্টান সৈন্যদের বার। মুসলমান সৈন্যদের এখানে প্রবেশ-অধিকার নিয়ন্ত্রিত হলেও, নিষিদ্ধ নয়।

ছত্রিশটা হাত তিনটে টেবিল চাপড়াচ্ছে। অসম্ভব গুমোট পরিবেশ। নিশ্চল, উত্তপ্ত বাতাসে ভরাট হয়ে আছে সিগারেটের ধোঁয়া। প্রবেশ-পথের কাছেই গানারদের সাথে রানা যেখানে বসে আছে সেখান থেকে বার কাউন্টারটা কোনরকমে দেখা যাচ্ছে। মাতালের লালচে চোখের মত বার কাউন্টারের উপর পাশাপাশি জ্বলছে দুটো ল্যাম্প। ল্যাম্পের আলোয় কিছুই পরিষ্কার নয়, ছায়াগুলোই শুধু বড় হয়েছে। ওদের আর বার কাউন্টারের মাঝখানে মানুষের অসংখ্য মুখ ছাড়া দেখার কিছু নেই। ঘামে চক চক করছে সজীব মুখগুলো, এঁকেবেঁকে ওঠা সিগারেটের ধোঁয়া বিচিত্র সব মুখোশের মত লাগছে দেখতে।

ডান পাশে ইসরায়েল সেজে দাঁড়িয়ে আছে টেবিলের উপর একজন গানার। কাগজের তৈরি বোমারু বিমান ছুঁড়ছে তার দিকে সঙ্গীরা। এরপরের তিনটে টেবিলে আঠারোজন একযোগে গাইছে কোরাস, মুণ্ডপাত করছে ইসরায়েলের। সেই সাথে চাপড়াচ্ছে টেবিল।

বার-কাউন্টার থেকে বিয়ারের ক্যান আসছে খ্রীস্টানদের টেবিলে। খালি করে ওরা সাজিয়ে রাখছে টেবিলের উপরই পাশাপাশি। কোন্ টেবিলে ক'টা ক্যান জমছে, সে ব্যাপারে অনেকেরই তীক্ষ্ণ নজর।

মধ্য-আগস্ট। নাবাতিয়া ফাইটার স্টেশনে সন্ধ্যা নেমেছে। কোন-কোন দিন জমে যায় ওরা বারে, হৈ চৈ করে, বিয়ার খায়।

প্রথমদিকে উত্তেজনার অভাব ছিল না। একটা ফাইটার স্টেশন, সেখানে বৈচিত্র্যের কোন অভাব থাকার কথা নয়। সায়দা, এদ্ দামুর, বৈরুত, হাসবায়া, জেজিন এবং টায়ার ফাইটার স্টেশন দেখেছে রানা এখানে আসার আগে। ওসব জায়গায় অবস্থা অন্য রকম। প্রতিদিন নতুন কিছু না কিছু ঘটেছেই। কিন্তু এখানকার অবস্থা একেবারে উল্টো।

কংক্রিটের রানওয়ে নিথর পড়ে আছে। ইট আর কংক্রিটের বিল্ডিংগুলো দিনের পর দিন রোদে পুড়ছে। উত্তপ্ত ধুলোয় চারদিক আচ্ছন্ন থাকে সব সময়। মাথার উপর শত্রু বিমান আসে কদাচ। দিনে রাতে কয়েকবার তারা নাবাতিয়ার পাশ ঘেঁষে চলে যায়। আরও ভিতরে ঢুকে যুদ্ধ করে আসে বৈরুত ফাইটার স্টেশনের সাথে।

আন্ডারগ্রাউন্ড শেলটার থেকে ওদের ফাইটার বিমানগুলো বড় একটা বেরোয় না। না বেরোলেও ইঞ্জিন ঠিক রাখার জন্যে স্টার্ট দেয়া হয় নিয়মিত। চারদিকের মাটির নিচে থেকে উঠে আসে বিকট গর্জন। ওরা অপেক্ষায় থাকে সবাই। কিন্তু অপেক্ষাই সার। শত্রু বিমান আসে না নাবাতিয়ার উপর। স্নায়ুর উপর চাপ বাড়তে থাকে। ধুলোয়

ধূসরিত হয় চেহারা।

ধুলো, শব্দ আর নিস্তরঙ্গ সময়ই যে শুধু রানাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে তা নয়। আর সব ফাইটার স্টেশনের চেয়ে নাবাতিয়া অনেক দিক থেকে অনেক ভাল। মাত্র বছর দুয়েক আগে তৈরি করা হয়েছে এই স্টেশনটি, এরই মধ্যে, এই মরু শহরে, রাস্তার দু'পাশে দেখা যায় সবুজ ঘাস আর বড় বড় গাছ। কোথাও কোথাও রয়েছে ফুলের বাগানও। ফাইটার স্টেশনের বাইরে মরুদ্যানের ভিতর গড়ে উঠেছে স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি শহর। পনেরো দিন পর একবার বেড়িয়ে আসা যায়। নাবাতিয়ায় মেয়েরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুন্দরীদের তালিকার মধ্যে হয়ত পড়ে না, কিন্তু যোদ্ধা বলতে তারা অজ্ঞান। পাশের ফাইটার স্টেশন এদ্ দায়রার উপর ডাইভ বোম্বিং, ছোট্ট একটা তরঙ্গ তুলেছে নিভাঁজ সময়ের উপর, কিন্তু আর সকলের সাথে উৎসবে মেতে ওঠার মত মন নেই রানার। স্নায়ুর উপর থেকে কিছুতেই চাপ কমাতে পারছে না ও।

দায়ী নাবাতিয়ার এই পরিবেশ। কিছুই ঘটছে না, সেটা কারণ নয়। কিন্তু কিছু একটা ঘটার লক্ষণ পরিস্ফুট হয়ে উঠছে, সেটাই কারণ। ভিতরে ভিতরে কি এক উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছে যেন গোটা ফাইটার স্টেশন নাবাতিয়া। একটা বিস্ফোরণ ঘটতে যাচ্ছে। নিঃশব্দে বাজছে ধ্বংসের দামামা, অপেক্ষার মাঝখানে সেই ভয়াবহ শব্দ শুনতে পাচ্ছে রানা। ইতিমধ্যে গোটা মধ্যপ্রাচ্যের ভাব এবং চেহারা বদলে গেছে। কায়রোর নরম-গরম মনোভাব, এন নাকুরা আর টায়রার পতন, সোভিয়েট রাশিয়ার না-যুদ্ধ না-শান্তি নীতির আড়ালে গোপন অভিসন্ধি—যুদ্ধের গোটা আবহাওয়াটাকে করে তুলেছে অনিশ্চিত। বাতাসে ফিসফিস গুজব, লেবানন গ্রাস করতে যাচ্ছে ইসরায়েল। উগ্র ফালাঞ্জিস্ট খ্রীস্টানরা নাকি বাড়িয়ে দিয়েছে সর্বাত্মক সহযোগিতার হাত। লেবাননকে কব্জার ভিতর আনতে না পারলে গেরিলাদের নির্মূল করা সম্ভব নয়, এটা ইসরায়েল ও তার বন্ধুরা পরিষ্কার বুঝে ফেলেছে। কি হয় কি হয় একটা ভাব সবখানে। সত্যি কি হতে যাচ্ছে কেউ জানে না।

শুধু অপেক্ষার পালা চলেছে। একটা ব্যাপক আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে শত্রু, পরিষ্কার অনুমান করা যায়। বন্দর ঘাঁটি আর ফাইটার স্টেশনগুলো সবচেয়ে বেশি অনুভব করছে অবস্থাটা। আর নাবাতিয়ার বিপদ সবচেয়ে বেশি এই জন্যে যে এন নাকুরার পতন ঘটার পর বর্ডারের সবচেয়ে কাছের ফাইটার স্টেশন এখন এটা।

গোটা অ্যারোড্রামকে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘিরে সুরক্ষিত করা হয়েছে দিন কতক আগে। তাড়াহুড়ো করে অসংখ্য ট্রেঞ্চ খোঁড়া হয়েছে। ল্যান্ডিং-ফিল্ড আর অন্যান্য ডিফেন্স পয়েন্টগুলোকে রক্ষার জন্যে ইট আর কংক্রিটের প্রাচীর দাঁড় করানো হয়েছে রাতারাতি। বিমানবাহিনীকে সাহায্য করার জন্যে ডেকে আনা হয়েছে সিভিলিয়ানদের। গোটা নাবাতিয়া জুড়ে প্রস্তুতি চলেছে কেয়ামতের।

সেই প্রস্তুতিপর্ব শেষ হয়েছে, এখন শুধু অপেক্ষা।

উত্তেজনাটা সবচেয়ে বেশি টের পাওয়া যায় কন্ট্রোল টাওয়ার, অপারেশন কন্ট্রোল রুম আর হাসপাতালে। সবরকম ছুটি বাতিল করে দেয়া হয়েছে, এমন কি লোকাল লিভ

পর্যন্ত।
গানারদের অবস্থা যেন বেশি শোচনীয়। হয় গানপিটে থাকো, না হয় ছাউনিতে গিয়ে ঘুমোও। দু'ঘণ্টা পর পর গানপিটে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা, অমানুষিক পরিশ্রমের কাজ বলে মনে হয়। তার উপর, খাবারের টানাটানি।
সময় বয়ে যাচ্ছে। নৈরাশ্যের এটাও একটা কারণ রানার। আজ চারদিন হল ও এসেছে নাবাতিয়ায়। যে কাজ নিয়ে এসেছে তার কিছুই করতে পারেনি এখনও। যে অন্ধকারে ছিল সেই অন্ধকারেই রয়েছে ও।
'হ্যালো বয়েজ!' ছিঁড়ে গেল চিন্তার জাল, মুখ তুলতে রানা দেখল প্রকাণ্ড একটা মুখ হুমড়ি খেয়ে পড়েছে টেবিলের উপর। ট্রুপ সার্জেন্ট, সায়েদ সাবরী। 'জানি এখানে এলে সবাইকে পাব। খুব উৎসব হচ্ছে, কেমন? বেশ বেশ! কোন্ টেবিল রেকর্ড ভাঙল আজ, হাকাম?' টেবিলের উপর পাশাপাশি দাঁড় করানো বিয়ারের খালি ক্যানগুলো দেখিয়ে জানতে চাইল, 'ক'টা ওখানে?'
'আপনি আমাকে বাঁচান সার্জেন্ট!' সাইয়িদ হাকাম উঠে দাঁড়াল। 'ছোকরাদের পাল্লায় পড়ে এরই মধ্যে গিলতে হয়েছে আটটা, আর সম্ভব নয়। বিয়াল্লিশটা জমেছে, ওদের ইচ্ছা চুরাশিটা ক্যান খালি করে রেকর্ড ভাঙবে।'
'আরে যাচ্ছ কোথায়?' ট্রুপ সার্জেন্ট হঠাৎ খাদে নামাল গলা, 'তোমার আর সার্জেন্ট জায়েদীর সাথে জরুরী কিছু আলাপ আছে আমার, বসো। তাছাড়া, আজকের দিনটা উৎসব করা উচিত।' বারের দিকে চোখ পড়তে সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে পড়ল তার। কাউন্টারের টুলে দু'জন মেয়ে বসে আছে। 'ওই, এসে গেছে শাফা। ওর সাথে এখানে দেখা করার কথা আমার।'
'সঙ্গের মেয়েটি কে?' জানতে চাইল সার্জেন্ট জায়েদী।
জায়েদীর নিজের সাইটের একজন পুরানো গানার জবাবে বলল, 'জানি না। নিশ্চয়ই নতুন কেউ। টাওয়ারে নয় অপারেশন কন্ট্রোলরুমে কাজ করতে এসেছে।'
ওই সাইটেরই আরেকজন বলল, 'গত হপ্তায় একদল নতুন মেয়ে এসেছে, শুনেছি। তাদেরই একজন হবে।'
'ধারালো বেয়োনেটের মত চেহারাটা, তাই না?' রানার পাঁজরে কনুইয়ের গুঁতো মেরে জানতে চাইল কাফা।
গুঁতো খেয়েও মুখ ফেরাল না রানা। গলা উঁচু করে কাউন্টারের মেয়েটিকে দেখছে ও। সায়েদ সাবরীর হাতছানির উত্তরে সঙ্গিনীকে নিয়ে এদিকেই আসছে সে। চেহারাটা যেন পরিচিত।
'ঠিক,' বলল জাফরী, 'হুবহু বেয়োনেটের মত চেহারা। কিন্তু, কাফা, এই বেয়োনেট দিয়ে তুমি ইসরায়েলকে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করতে পারবে না! ওর দিকে নজর দিলে তোমার নিজের বুকই এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় হয়ে যাবে। জানো ও কার মেয়ে? বৈরুতের সৈয়দ ওমর বিন কাজ্জানীর নাম শুনেছ? ডেলী সান-এর মালিক! জ্বী-হাঁ, সৈয়দ কাজানীর মেয়ে ও—ইফফাত কাজানী।'

জাফরীর প্রতিটি শব্দ কানে ঢুকল রানার। ইফফাতকে চেনা চেনা লাগছিল, এখন পরিষ্কার চিনতে পারল ও, বছর তিন আগে ওর বন্ধু ডেলী সানের একজিকিউটিভ এডিটর দায়রা দাউদ পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্যে নিয়ে গিয়েছিল সৈয়দ কাজানীর চেম্বারে, সেখানেই দেখেছে ও ইফফাতকে। একবারই, মাত্র সাত কি আট সেকেন্ডের জন্যে। তবু স্মৃতি থেকে সম্পূর্ণ মুছে যায়নি চেহারাটা। কৃতিত্বটুকু অবশ্য ওর নয়, অনুভব করল রানা। এমন একটা চেহারা মেয়েটির, একবার দেখলে তারপর ভুলে যাওয়া বেশ কঠিন। ছোট, প্রায় গোল মুখ। দুনিয়ার সারল্য লেগে আছে সেখানে। জোড়া টানা ভুরু। ধবধবে সাদা চোখের জমিতে কুচকুচে কালো দুটো মণি। যখন হাসছে না তখনও মনে হয় এত হাসি কিভাবে ধরে রাখে মুখে!

কথাবার্তা শুনে মনে হল, শাফা চেনে না এমন কেউ নেই ফাইটার স্টেশনে। সেই সকলের সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে ইফফাতকে। 'এরা সবাই আর্টিলারীর লোক, ইফফাত।'

সবশেষে রানার দিকে তাকাল শাফা। মুখ খুলতে গিয়েও খুলল না। পাঁচ সেকেন্ড দেখল রানাকে। ভুরু কুঁচকে উঠছিল, কিন্তু পুরো কুঁচকে ওঠার আগেই হাসল।

জোর করে হাসল? ভাবল রানা।

'কে ও? ওকে তো চিনলাম না, সায়েদ?'

'ও মাসুদ রানা।' বলল ইফফাত।

কেঁপে উঠল বুক। সর্বনাশ! কতটুকু চেনে ওকে ইফফাত? কতটুকু শুনেছে বাপের কাছ থেকে ওর সম্পর্কে? পরিচয়টা যদি জানাজানি হয়ে যায়...।

'বৈরুতে সাংবাদিকতা করতাম, ইফফাতের বাবার পত্রিকায়,' বলল রানা। প্রতিমুহূর্তে আশঙ্কায় কাঁপছে বুক। মেয়েটা যদি প্রতিবাদ করে? যদি বলে, না, সাংবাদিক নয়...?

দু'জোড়া চোখ পরস্পরের দিকে নিবদ্ধ। ইফফাত সব সময় হাসে না, আবিষ্কার করল রানা। ইতস্তত করছে সে। পরিষ্কার বুঝতে পারল রানা, নিজের স্মৃতি ওকে ধোঁকা দিচ্ছে কিনা ভেবে দেখছে। স্মরণ করার চেষ্টা করছে মাসুদ রানা লোকটা সম্পর্কে বাবা তাকে ঠিক কি বলেছিল।

হঠাৎ হাসল ইফফাত। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল যেন রানার। বসল রানারই পাশে। 'সাংবাদিক? অসম্ভব!'

কালো হয়ে গেল রানার মুখ। ইফফাত শব্দ করে হাসছে।

'আমরা যে যাই করি না কেন, পরিচয় সকলের একটাই—মুক্তিযোদ্ধা,' শুরু হল তুমুল করতালি।

এত অল্প সময়ের মধ্যে দু'দুবার জ্বর এল এবং ছাড়ল, এর আগে এমন ঘটছে কিনা মনে পড়ল না রানার। কিন্তু বিপদ কেটে গেছে মনে করার কোন কারণ দেখল না ও। কাজানী পরিষ্কার জানে মাসুদ রানা বাংলাদেশের নাগরিক। তার মানে ইফফাতও জানে। কিন্তু কি ভেবে পরিচয়টা ফাঁস করল না সে?

ফাঁস করেনি, তার মানে এই নয় যে করবে না। হয়ত সময় নিয়ে আরও ভাবতে চাইছে। অথবা ঘনিষ্ঠ কারও সাথে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করা দরকার বলে মনে করছে। কি চলছে মেয়েটার মনের মধ্যে কে জানে!

ও প্যালেস্টাইনী নয়, একথা জানার সাথে সাথে স্টেশন কমান্ডার ফায়ারিঙ স্কোয়াডে পাঠাবে ওকে। কোন অজুহাত, কোন ব্যাখ্যা গ্রহণ করা হবে না।

ইফফাতের মুখের দিকে চেয়ে রইল রানা। ছোট একটা মেয়ে, তার মর্জির উপর নির্ভর করছে ওর অনেক কিছু। কিছু একটা করা দরকার। কিন্তু কি?

ইফফাতের সাথে এই মুহূর্তে আড়ালে কথা বলতে গেলে সবাই খারাপ চোখে দেখবে ব্যাপারটা। তাছাড়া ইফফাতই কি রাজি হবে?

সায়েদ সাবরী আর শাফাকে নিয়ে সবাই মশগুল, এই ফাঁকে ইফফাতের সাথে চোখাচোখি হতেই প্রশ্ন করল রানা, 'ফাইটার স্টেশনে কি করছো তুমি?'

'মাত্র দেড় মাসের ট্রেনিং শেষ করেই অপারেশন কন্ট্রোলরুমে চান্স পেয়ে গেছি,' বলল ইফফাত। 'কিন্তু আপনি এত থাকতে আর্টিলারীতে কেন?'

উত্তরে ভেবেচিন্তে পাল্টা প্রশ্ন করল রানা, 'বিশেষ কোন কারণ আছে বলে মনে করো নাকি?

অবাক হয়ে চেয়ে রইল ইফফাত। তারপর বলল, 'না,...মানে, আপনি কিছু মাইন্ড করলেন নাকি? আসলে...।'

দ্রুত আশপাশটা দেখে নিল রানা। কেউ লক্ষ করছে না ওদের। কি ছাই বলছে সায়েদ সাবরী কে জানে, সবাই মগ্ন হয়ে গিলছে তাই।

'তোমার স্মরণশক্তি খুব প্রখর,' বলল রানা। 'আমাকে দেখেছ মাত্র একবার, কিন্তু পরিষ্কার মনে রেখেছ। নামটা জানলে কিভাবে?'

এবার অবাক হবার পালা রানার। চোখের ভুল নয়, সত্যি সত্যি লাল হয়ে উঠতে দেখল ও ইফফাতের মুখ।

'নামটা জেনেছি বাবার কাছ থেকে,' ফিক করে এবার হেসে ফেলল সে। 'ঠোঁট সেলাই করা মানুষ, অনেক কৌশলে শুধু নামটাই আদায় করতে পেরেছিলাম।'

মিথ্যে কথা বলছে? মনে হল না। স্বস্তিবোধ করল রানা। ঠিক তখন কানে ঢুকল সায়েদ সাবরীর কথাগুলো। অনর্গল বলে চলেছে সে।

'মুশকিল হল, আমরা বেশিরভাগ সময় জানি না কখন একজন শত্রু গুপ্তচরের সাথে মেলামেশা করছি, তাদের ফাঁদে পা দিচ্ছি,' বলে চলেছে সায়েদ সাবরী, 'না জেনেই অনেক সময় আমরা তাকে মূল্যবান তথ্য দিয়ে ফেলি।'

'তাছাড়া, যে হারে স্টেশনের ভিতর আজেবাজে লোক ঢুকছে,' দ্বিতীয় সাইটের সার্জেন্ট জায়েদী বলল, 'গণ্ডায় গণ্ডায় স্পাই ধরা পড়লেও আমি আশ্চর্য হব না। গেটের পুলিসগুলো কোন কম্মেরই নয়! ইউনিফর্ম দেখলেই হয়, বিনা প্রশ্নে ঢুকতে দিচ্ছে ভিতরে।'

'মজুরদের কথাই ধরো,' বলল বম্বারডিয়ার সাইয়িদ হাকাম, 'ওরা সবাই

দেশপ্রেমিক এ আমি বিশ্বাস করি না। তারপর, নতুন যারা বদলী হয়ে এখানে আসছে তাদের সম্পর্কেই বা কতটুকু কি জানি আমরা?'

'কথাটা ঠিক,' বলল ডিটাচমেন্ট কমান্ডার গওহর জুমলাত। 'কিন্তু শুধু নবাগতদের বেলাতেই নয়। পুরানো আমরা যারা আছি তাদের মধ্যে কে কি ছিল, কোন রেকর্ড আছে? যে চেয়েছে সেই ঢুকতে পেরেছে বাহিনীতে। অথচ, আমার জানা মতে, শুধু লেবাননেই ইসরায়েলের লোক আছে বিশ হাজারের মত। এরা গত পনেরো বছর ধরে ইসরায়েলের নুন খাচ্ছে।'

'যেমন আতাসী। কে জানত শালা ইসরায়েলের হয়ে গুপ্তচর বৃত্তি করছে! সত্যি কথা বলতে কি, গোটা ব্যাপারটা খুবই কাঁচা,' বলল ট্রুপ সার্জেন্ট সায়েদ সাবরী। 'কে জানে, হয়ত এই ট্রুপেই আরও এক আধজন বেইমান রয়েছে, কিন্তু তাকে কেউ আমরা চিনতে পারছি না।'

'চিনি না তাও ঠিক নয়,' বলল ব্যারডিয়ার সাইয়িদ হাকাম। 'যেমন ধরো নাফাস কাবির। ওকে আমরা খুব ভাল করে চিনি। চিনি, কিন্তু কিছু করতে পারি না।' কেউ দেখতে পারে না নাফাসকে। একসময় সবাই ভাবত, সে ইসরায়েলের পক্ষে গুপ্তচর বৃত্তি করছে। 'আজকের বিকেলের কথাই ধরো। আমরা সবাই যখন হান্ড্রেড ফাইভএফ থান্ডারচীফগুলোকে গুলি করে নামাবার জন্যে গলদঘর্ম হচ্ছি, ও তখন থরথর করে ভয়ে কাঁপছে, যদি গুলি খেয়ে পড়ে যায় দু'একটা!'

'যাই হোক,' বলল ট্রুপ সার্জেন্ট, 'ইয়াসির ফারুকী আগামীকাল মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিচ্ছেন। ইতিমধ্যে বাইরে থেকে স্টেশনে যারা কাজ করতে আসছে তাদের প্রত্যেকের সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়ে দেখার কাজ শুরু হয়েছে, এবং আমরা প্রত্যেকে একটা করে স্পেশাল পাস পাচ্ছি, যার ফলে এখনকার মত সহজে যে-কেউ ক্যাম্পে ঢুকতে চাইলেও পারবে না!'

'কি ঘটেছে, আসলে?' জাফরীকে জিজ্ঞেস করল রানা। 'প্রথম থেকে শুনিনি আমি।'

'আমাদের ইন্টেলিজেন্স একজন ইসরায়েলি গুপ্তচরের কাছে এই অ্যারোড্রামের গ্রাউন্ড প্ল্যান পেয়েছে, ট্রুপ সার্জেন্ট সায়েদ সাবরী তাই তো বলছেন।'

'অ্যারোড্রামের গ্রাউন্ড প্ল্যান? কি করবে তা দিয়ে? আমার তো মনে হয়, ও ধরনের রুটিন ইনফরমেশন অনেক আগেই যোগাড় করা আছে তাদের।'

'কিন্তু প্রতি মাসেই কি বদল হচ্ছে না কিছু কিছু জিনিস?' বলল জাফরী, 'ধরো, ফাইটার অ্যারোড্রামগুলোকে অচল করাই তাদের এক নম্বর অবজেকটিভ। শুধু চব্বিশ ঘণ্টার জন্যেও যদি ফাইটার অ্যারোড্রামগুলোকে অচল করে রাখা যায়, আক্রমণ ষোলো আনা সফল না হওয়ার কোন কারণ নেই। মাত্র দু'মাস আগে এখানে ছয়টা লুইস গান বসানো হয়েছে, দুটোর দায়িত্ব নিয়মিত বাহিনীর লোকদের ওপর, বাকি চারটের দায়িত্ব এই ব্যাটারির অন্য এক ট্রুপের। আগে ছিল না, এখন আছে। এইরকম তিন ইঞ্চি গান রয়েছে দুটো, দুটো মোবাইল Bofors রয়েছে, একটা Hispano

রয়েছে—এসব ছাড়াও গ্রাউন্ড ডিফেন্সের সাজ-সরঞ্জাম বেড়েছে প্রচুর পরিমাণে। স্টেশনে সাফল্যের সাথে আক্রমণ পরিচালনা করার জন্যে এইসব তথ্য একান্ত দরকারী এবং মূল্যবান।'

খানিকপরই নিস্তব্ধতা দানা বাঁধল। সবাই অস্বাভাবিক চিন্তিত। গম্ভীর। শত্রুর লোক রয়েছে সাথেই, মোটেই প্রীতিকর নয় অনুভূতিটা। ডিটেলেড গ্রাউন্ড প্ল্যান সংগ্রহ করার চেষ্টা করছে ইসরায়েল, ভীতির কারণ এটাই। বোমা ফেলে অ্যারোড্রামগুলোকে সমতল করে দিতে চায় সে, পরিষ্কার বোঝা যায় এ থেকে। তালিকার মধ্যে নাবাতিয়াও আছে। ভাবনাটা রোমহর্ষক।

রানার চোখের মণি ঘুরছে। প্রত্যেকের দিকে একবার করে তাকাল ও। কে কি ভাবছে, পরিষ্কার বুঝতে পারল যেনঃ নাবাতিয়া এমন একটা জায়গা, উষর মরুভূমি ঘিরে রেখেছে তাকে চারদিক থেকে। এই জায়গা থেকে পালিয়ে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই। ভাগ্যে যাই থাকুক, এর ভিতর থেকেই সব কিছুকে বরণ করে নিতে হবে।

'গা ছমছম করে, তাই না?' অবশেষে বলল ইফফাতই। 'প্রত্যেকটা গান, প্রত্যেকটা ট্রেঞ্চ, প্রত্যেকটা কাঁটাতারের টুকরো সম্পর্কে বিশদ জানতে চায় ওরা—নিষ্ঠুর একটা আক্রমণের পরিকল্পনা বোঝা যাচ্ছে স্পষ্ট!'

'যাচ্ছে,' সায় দিল রানা, 'কিন্তু নিষ্ঠুর আক্রমণের হিংস্র জবাবও আমরা দিতে পারব। তুমি কি মনে করো?'

'অবশ্যই পারব,' বলল ইফফাত। 'কিন্তু কি জানেন, প্রথম যখন এখানে আসি, গোটা ব্যাপারটা তখন ইন্টারেস্টিং লেগেছিল আমার। ফাইটারগুলোর টেক-অফ ভীষণ উত্তেজিত করত আমাকে। লাউডস্পীকারে প্রস্তুত হওয়ার ডাক, ছুটোছুটি করে পাইলটদের জমায়েত হওয়া, রানওয়েতে ইঞ্জিনের কান ফাটানো গর্জন, তারপর টেক-অফের সিগন্যাল দেয়ার সময় ফ্লাইট লিডারের হাতটা তিন কিস্তিতে নেমে আসা—এসব কি যে ভাল লাগত, বলে বোঝাতে পারব না। এমন থ্রিল জীবনে কখনও পাইনি। দেখতে দেখতে মাটি ছেড়ে নিঃসীম আকাশে উঠে যায় ওরা। তারপর হয়ত শত্রু বিমানের ঝাঁকের ভিতর ঢুকে গিয়ে মরণপণ লড়াই বাধিয়ে দেয়। গর্ব অনুভব করতাম এই ভেবে যে এসবের সাথে আমিও রয়েছি। অপারেশন কন্ট্রোল রুম গোটা ফাইটার স্টেশনের সুইচ—সেখানে কাজ করা মানে গোটা আকোকে অনুভব করা,' কাঁধ ঝাঁকাল ইফফাত। 'কিন্তু সেই মেয়েলি রোমাঞ্চ এখন আর নিজের মধ্যে খুঁজে পাই না। ধুলো, বিকট শব্দ, কাজের চাপ আর অপেক্ষার বিরক্তি অসহ্য লাগে এখন।'

রানাকে হাসতে দেখে ইফফাত যেন একটু লজ্জাই পেল।

'বেশি বকবক করে ফেলেছি…।'

'তা নয়,' বলল রানা, 'হাসছি এই জন্যে যে আমার অনুভূতিও প্রায় তোমার মতই।'

'ফের একটা উৎসব হবে বলে মনে হচ্ছে,' জাফরী বলল রানার পিছন দিকে, রুমের বাইরে তাকিয়ে। 'কে যেন আসছে ছুটে। গরম কোন খবর থাকতে পারে।'

রানা পিছন ফিরল। ওদের দলের লোক একজন, গ্যাস মাস্ক আর হেলমেট পরে আছে দেখেই বোঝা যায় কি খবর নিয়ে আসছে সে। তাঁবুর ভিতর ঢুকে থমকাল সে, তারপর এল ওদেরই টেবিলের দিকে। চিৎকার করে বলল, 'টেক-পোস্ট।'

'জ্বালাতন আর কি!' সায়েদ সাবরী নিচু গলায় বলল।

'চমকপ্রদ কিছু নাকি হে?'

'নাহ্। রোজকার মত, সাধারণ কাকপক্ষী। একটা ইতিমধ্যেই চলে এসেছে প্রায় মাথার ওপর।'

দুই

হুড়মুড় করে তাঁবু থেকে চৌরাস্তায় বেরিয়ে এল ওরা। সন্ধ্যা জেঁকে বসেছে চারদিকে। সার্চলাইটগুলোর ফাঁকে ফাঁকে ছাউনিগুলো কালো বোরখা পরে দাঁড়িয়ে আছে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে। নক্ষত্রের জাল টাঙানো আকাশের দিকে তির্যকভাবে উঠে গেছে সার্চলাইটগুলো। কয়েকজন সাইকেলে চেপে বসল। জাফরীকে সাথে নিয়ে দৌড় শুরু করল রানা। মাথার উপর থান্ডারচীফ বোমারুর একঘেয়ে, ভোঁতা গুঞ্জন। আধো অন্ধকারে ওখানে কোথাও গা ঢাকা দিয়ে আছে, নাবাতিয়াকে পাশ কাটিয়ে দ্রুত বেগে ছুটে যাচ্ছে বৈরুতের দিকে।

চৌরাস্তার শেষ মাথা থেকে একটা Bofors tower তুলে নিল ওদের, তারপর নামিয়ে দিল ওদের গানপিটে। ছুটে গিয়ে লম্বা দোচালার ভিতর ঢুকল ওরা। যে যার স্টীল হেলমেট আর গ্যাসমাস্ক খুঁজে নিল। দুটো হারিকেনের কালিমাখা চিমনি ভেদ করে বেরিয়ে আসা আবছা আলোয় জায়গাটাকে দেখাচ্ছে নির্জন আর পরিত্যক্ত। টেবিলের উপর বাসন-পেয়ালায় অভুক্ত খাবার, তার মাঝখানে নিখুঁতভাবে সাজানো একটা দাবার বোর্ড। বিছানার উপর ওলট-পালট হয়ে পড়ে [illegible] াহান্নটা তাস। যেখানে যে অবস্থায় যা কিছু ছিল সেই অবস্থায় সব রেখে [illegible] ডটাচমেন্ট বেরিয়ে গেছে পজিশন নিতে।

বাইরে রাত যেন আরও ঘন হয়ে নেমেছে এরই মধ্যে। সার্চলাইটগুলোর মুখ উত্তর দিকে সরে গেছে। সেগু[illegible]র আভায় গানপিটটা কোনরকম দেখতে পাওয়া যাচ্ছেঃ স্যান্ডব্যাগের কালো বৃত্ত, মাঝখানে কামানের মোটা ব্যারেল মুখ তুলে আছে আকাশের দিকে। স্টীল হেলমেট পরা মূর্তিগুলো অস্থিরভাবে আগুপিছু ক[illegible]ছে।

পিটের দিকে এগোবার সময় ওদের সাথে দেখা হল কাফার। বিশাল বুকটা ঘনঘন উঠছে আর নামছে। বারের তাঁবু থেকে এতটা রাস্তা দৌড়ে আসতে হয়েছে তাকে। 'শালার ফাটা কপাল আর বলে কাকে,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল সে, 'তোমরা তো বেশ মজা করে টাওয়ারে চড়ে চলে এলে! শেষ ঢোকটা গিলতে একটু দেরি হওয়ায় এতটা রাস্তা ঘামে ভিজে আসতে হল আমাকে! আর ব্যাটা সায়েদ সাবরীকে দেখো, জামাইবাবু যেন শ্বশুর বাড়ি আসছেন, লজ্জায় পা ওঠে না। একটা যুদ্ধ চলছে, ওকে

দেখে তা মনেই হয় না।'

গানপিটে ঢোকার সময় ওরা দেখল মোটরবাইকের উপর বসে স্যান্ডব্যাগ প্রাচীরের উপর দিয়ে উঁকি দিয়ে তাইয়েব সায়ানীর সাথে কথা বলছে সার্জেন্ট গওহর জুমলাত। ডিউটিরত ডিটাচমেন্টের ইনচার্জ ল্যান্স বম্বারডিয়ার সায়ানী। মেয়েলি ধাঁচের মুখ। আড়াল থেকে ওর গলা শুনলে যে কেউ ওকে মেয়ে ভাববে।

'এইমাত্র ছাউনিতে কে ঢুকল? কাফা?' জানতে চাইল সার্জেন্ট। দু'দিকের ঠোঁট পর্যন্ত নেমে এসেছে তার চওড়া জুলফিঃ ছয় ফুটের উপর লম্বা। জাফরীকে মাথা দোলাতে দেখে সে বলল আবার, 'আমার ডিটাচমেন্ট তাহলে কমপ্লিট, সায়ানী। তোমরা সবাই আবার একটার সময় আসবে, তারপর আমরা বিদায় নেব। তার মানে, স্ট্যান্ড-ডাউন আর স্ট্যান্ড-টু-এর মাঝখানে তিন ঘণ্টা করে সময় পাচ্ছি আমরা। তুমি বরং সায়েদ সাবরীকে জানিয়ে দিয়ো নতুন নিয়মটার কথা।'

'জানাব,' চিকন গলায় বলল সায়ানী। 'যাই তাহলে, বেহেশতে গিয়ে উঠি। যাচ্ছ নাকি হে, আলী?'

'খোদার কসম, তোমার এই ন্যাকামো আমার একদম সহ্য হয় না,' মাথায় যেন আগুন ধরে গেছে সাদিকীন জগলুলের। তার এই লালচে চুলের জন্যেই সে বিখ্যাত। 'এই রকম সময়ে কাজ শেষ করে বিছানায় গেছি, মনেই পড়ে না। তিন ঘণ্টা ঘুমুতে পারব জেনে গানপিট থেকে বেরুচ্ছি—তিন বছরের এই বোধহয় প্রথম।'

'আনন্দে আটখানা হওয়ার কিছু নেই,' বম্বারডিয়ার গওহর জুমলাত বলল, 'যে কোন মুহূর্তে আমরা একটা পিলিমিনারি এয়ার-রেইড ওয়ার্নিং পেতে পারি অথবা পরিস্থিতি তেমন দেখলে গোটা ডিটাচমেন্টকে ডিউটিতে ডাকতে পারি আমি।'

'প্লীজ, সার্জেন্ট!'

দাঁত বের করে হাসল গওহর জুমলাত। 'চেষ্টা করব না ডাকার। যাও, ভাগো এবার।'

সায়ানীর ডিটাচমেন্ট বেরিয়ে গেল গানপিট থেকে। পিটের চারদিকে তাকাল গওহর জুমলাত। 'যাকের, তুমি বরং দু'নম্বর হও। আর জাফরী, তুমি নাও এলিভেশন সাইড। চার নম্বর হিসেবে কাফা তার আগের জায়গাতেই থাকুক। কে, কাফা নাকি?' দোতলার দিক থেকে একটা মূর্তিকে এগিয়ে আসতে দেখে হাঁক ছাড়ল সে। কাফা কাছে আসতে বলল, 'তুমি ফায়ার করছো। কুতুব দীন আর রানা অ্যামুনিশন নাম্বারস্। কুতুব, কাফার হাতে শেল দেবে তুমি। আর তোমার দায়িত্বে রইল টেলিফোনটাও,' শেষ কথাটা রানাকে লক্ষ্য করে।

রাতের প্রথম ক'টা ঘণ্টা নাবাভিয়া ফাইটার স্টেশনের আর সব রাতের মতই উত্তেজনাহীন ও একঘেয়ে। তিনটে মাত্র ডেক চেয়ার, পালা করে সেগুলোয় বসে বরাদ্দ সময়টুকু ঝিমিয়ে নেয়া ছাড়া করার কিছুই নেই। ক'মিনিট পরপরই একটা করে শত্রু-বিমান দক্ষিণ-পূব দিক থেকে আসছে। হ্যাঙ্গারের প্রকাণ্ড কালো ছায়াগুলো থেকে অনেক দূরে, আকাশের গায়ে সার্চ লাইটের সাদা ক্রস চিহ্নগুলো ফুটে উঠলে বোঝা

যায়, ওরা আসছে। সার্চলাইটের দায়িত্ব শত্রু-বিমানকে খুঁজে বের করা, নিজেদের আওতা পর্যন্ত অনুসরণ করা, তারপর পরবর্তী সার্চলাইট গ্রুপের দায়িত্বে ওগুলোকে ছেড়ে দেয়া। আকাশের গায়ে আলোর গতিবিধি অনুসরণ করলে উপকূল এলাকায় থাকতেই শত্রু-বিমানকে দেখা যায়, স্টেশনের অনেক উপর দিয়ে অথবা পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে বৈরুতের দিকে। নির্দিষ্ট একটা আকাশ পথ তৈরি করে নিয়েছে ওরা, পথ ছেড়ে বিপথে বড় একটা সরে যায় না।

অধিকাংশ বিমানই আসে আওতার অনেক উপর দিয়ে। মাথার উপর অন্ধকার চিরে ফালা ফালা করে দেয় সার্চলাইট, কিন্তু একটাকেও খুঁজে পায় না। মাঝেমধ্যে ওদের খুঁজে বের করার জন্যে প্লট দেয় অপারেশন কন্ট্রোলরুম, অনেক সময়ই দেয় না। শত্রু-বিমান হঠাৎ কখনও ফ্লেয়ার ফেলে নিচের দিকে। সশস্ত্র মহড়া দেয়া ছাড়া ওদের আর কোন উদ্দেশ্য আছে কিনা বোঝা যায় না, এ পর্যন্ত ওদের একবার মাত্র বোমা ফেলতে দেখে তাই মনে হয় রানার। তাছাড়া, বৈরুতের পথ আলোকিত করার জন্যে ওদের ফ্লেয়ার ফেলতে দেখে একটা কথাই মনে হয় ওর, অভিজ্ঞ পাইলটরা নতুনদের পথ চেনাচ্ছে—ট্রেনিং।

হঠাৎ পথ বদলে ফাইটার স্টেশন নাবাতিয়ার দিকে শত্রু-বিমানগুলো উড়ে আসছে বুঝতে পেরে গানপিটের ওরা সবাই চমকে উঠল। আক্রমণের জন্যে এবার ওদেরকেই বেছে নেয়া হয়েছে, সন্দেহটা ছড়িয়ে পড়ল সকলের মনে। ভোঁতা গুঞ্জনটা প্রায় নেই বললেই চলে, আর সব শব্দও অত্যন্ত ক্ষীণ, ওদিকে আকাশটা দেখাচ্ছে আশ্চর্য নিঃস্ব আর শূন্য। দূর উত্তর-পূবে একটা মাত্র সার্চলাইট, ফাইটার স্টেশন আল মোবাদার দিক থেকে বৈরুতের দিকে অগ্রসরমান ঝাঁক ঝাঁক রেইডারগুলোর পথটাকে আলোকিত করে রাখার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছে।

কানের কাছে হঠাৎ যেন বোমা ফেলল কাফা, 'ওই একটা আসছে!'

দক্ষিণ-পূবের অন্ধকার চিরে ক'টা সার্চলাইটের আলো উঠে গিয়ে দূরের খানিকটা আকাশ পরিষ্কার করে তুলল। সেই মুহূর্তে ঝনঝন শব্দে বেজে উঠল ফোনটা।

কলিং অল গানস। কলিং অল গানস। ওয়ান, টু, থ্রী—থ্রী?—ফোর।'

'ফোর,' বলল রানা।

'ফাইভ, সিক্স। আছ লাইনে তুমি, থ্রী?'

'থ্রী,' সাড়া দিল একটা গলা।

অপারেশন কন্ট্রোলরুম মেসেজটা দিল, 'শত্রু আসছে দক্ষিণ-পূব দিক থেকে। উচ্চতা দশ হাজার ফুট।'

রানার কাছ থেকে মেসেজ পেয়ে গওহর জুমলাত বলল, 'চাঁদ আজ দক্ষিণ দিক থেকে উঠছে নাকি হে!' তিন মণ ওজনের ভারি শরীরটা ডেক চেয়ার থেকে তুলল সে। 'ঠিক আছে, দেখাই যাক। সীটে গিয়ে বসো হে তোমরা!'

জুনায়েদ জাফরী আর নঈম যাকের ওদের সীটে গিয়ে বসল। এদিক ওদিক ঘুরল কামানটা। মাজলটা নাক বাড়িয়ে দিল শত্রু-বিমানের দিকে। কাছে এগিয়ে আসছে

সার্চলাইটের আলো। ঝটপট জ্বলে উঠছে নতুন আরও অনেকগুলো। অত্যুজ্জ্বল সাদা রশ্মিতে ল্যান্ডিং ফিল্ডের প্রতিটি ইঞ্চি দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার।

কামানের মাজ্‌ল ধীর গতিতে উপড়ে উঠছে। সবগুলো আলো যেখানে মিলিত হয়েছে সেখানে চেয়ে আছে সবাই মাথা তুলে, চোখ কুঁচকে। 'ওই যে!' অকস্মাৎ উত্তেজনায় ফেটে পড়ল জাফরী। আলোক রশ্মির জটিলতার মধ্যে সাদা একটা কণা দেখা গেল নিমেষের জন্যে। সচল কিনা তা বুঝে ওঠার আগেই আলো সরে গেল ওটার উপর থেকে। 'দুঃখিত,' লজ্জা পেয়ে বলল কাফা, 'স্রেফ একটা তারা!'

ঠিক তখনই লাউডস্পীকারে নিস্তব্ধতা ভাঙল, 'অ্যাটেনশান, প্লীজ অ্যাটেনশান, প্লীজ! ব্ল্যাক আউট! টোটাল ব্ল্যাকআউট! সবরকম আলো এই মুহূর্তে নিভিয়ে ফেলতে হবে। শত্রু-বিমান এখন ঠিক মাথার ওপর। অফ।'

'এখন যদি কেউ ফ্লেয়ার পাথ-এর সুইচ অন করে দেয়?'

'একটুও আশ্চর্য হব না আমি,' কুতুব দীনের প্রশ্নের জবাবে বলল জাফরী। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল সে রানার দিকে। 'ঘটনাটা ঘটার সময় তুমি এখানে ছিলে না, তাই না, রানা? এ মাসের দ্বিতীয় হপ্তার শুরুর দিকে? না, তখনও তুমি এসে পৌঁছাওনি এখানে। আসলে, আমাদের একটা মিগ সেভেনটিনকে পথ দেখাবার জন্যে জ্বালে ওরা আলোটা, অমনি ঠিক মাথার ওপর দেখতে পাই একটা এফ-হান্ড্রেড-ফাইভ-ডি থান্ডারচীফকে। আরে ব্বাপ! ভয় কাকে বলে! চোখের সামনে অ্যারোড্রামটাকে না দেখে কোন উপায় ছিল না পাইলটের।'

'কোথাকার বানচোত্ ওটা! শালার কাণ্ডজ্ঞান দেখো শুধু!' এক পশলা খিস্তি ছড়িয়ে দিল কাফা। অ্যারোড্রামের দূর প্রান্তে ওদের দ্বিতীয় থ্রী-ইঞ্চ গান, সেটার কাছাকাছি অফিসারস্ মেস থেকে বেরিয়ে এল একটা গাড়ি। কালো হ্যাঙ্গারের বিশাল ছায়ার গায়ে হেডলাইটের আলোর সাদা একটা পোঁচ লাগাল। 'অফিসারের বাবা হলেও ওখানে আমি থাকলে গুলি করে নিভিয়ে দিতাম আলো দুটো।'

সাপের চেয়েও বেশি ভয় কাফার আলোকে। অস্বাভাবিক লম্বা হাত-পা নেড়ে, সারাক্ষণ চোখের মণি ঘুরিয়ে কথা বলে সে। বীরত্ব আর কাপুরুষতার অদ্ভুত সহ-অবস্থান ওর মত আর কারও মধ্যে দেখেনি রানা। উদারতায় সে দরাজ, আবার স্বার্থপরতায় অবোধ শিশুকেও হার মানায়। ছোট্ট মাথা, বড় বড় কান। কোন না কোন ব্যাপারে হয় নিরাশ না হয় উত্তেজিত হয়ে আছে চব্বিশ ঘণ্টা। কিন্তু ওকে দেখামাত্র না হেসে পারে না কেউ। গত হপ্তায় ও যখন ওর শ্বশুরের মৃত্যু সংবাদ দিল, সবাই যখন হেসে অস্থির। ওর শ্বশুর আছে, সে মারাও যেতে পারে, আবার সে-খবর পেয়ে দু'চোখে পানি আসতে পারে ওর—এসব কেউ বিশ্বাস করতেই পারে না যেন। ঘরের আলো না নেভানো পর্যন্ত নির্ভেজাল একটা অভিশাপ ও। প্রতি রাতেই ওর কাছে ব্ল্যাকআউটের রাত। আলোর একটা কণা দেখতে পেলেই হয়, কথার তুবড়ি দিয়ে গোটা ফাইটার স্টেশনটাকে উড়িয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করবে।

কাফা থামতেই অ্যারোড্রামের দূরপ্রান্ত থেকে অস্পষ্ট আওয়াজ ভেসে এল, পুট

দোজ লাইটস আউট, পরমুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল সাদা পোঁচ। অ্যারোড্রামের কোথাও এক চিলতে আলো নেই এখন আর। তবু, চারদিকের দূরবর্তী সার্চলাইটের আলোয় গোটা এলাকা যেন ভেসে যাচ্ছে জ্যোৎস্নায়। দশ হাজার ফুট উপর থেকেও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে আমাদের, অনুভব করল রানা। টান টান হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ও, বোমা পতনের সময় বাতাসে শিসের মত শব্দ হবে, তারই অপেক্ষায়।

কিন্তু ঘটল না কিছু। ওদের সামান্য একটু পশ্চিম ঘেঁষে চলে গেল প্লেনটা। সোজা যাচ্ছে বৈরুতের দিকে। সার্চলাইটের আলো নিমেষের জন্যেও তাকে স্পর্শ করতে পারল না।

রোবটের মত, বিশেষ নড়াচড়া না করে, সীট থেকে নেমে পড়ল নঈম যাকের। 'সিগারেট চাও কেউ?'

অস্বাভাবিক শান্ত গলায় কাফা বলল, 'সিগারেট ধরাতে যেয়ো না, দোস্ত। খুন হতে চাও নাকি?'

'জ্বালাতন আর কি! তুমি চুপ থাকো তো, কাফা।'

'মাথার ওপর ওটা বোমারু, দোস্ত। পাইলট নিচের দিকে চেয়ে আমাদেরকেই খুঁজছে। আর শোনো, অমন ধমকের সুরে কখনও কথা বলবে না তুমি আমার সাথে। বুকে একডজন ব্যাজ থাকলেও কেউ আমাকে তার চাকর ভাবতে পারে না, তুমি তো কোন্ ছার! তাছাড়া, মনে রেখো, আমি তোমার চেয়ে সিনিয়র। যুদ্ধের শুরু থেকেই আর্মিতে আছি আমি।'

'সিগারেট, সার্জেন্ট?' যাকের পাত্তাই দিল না কাফাকে। জবাব দিল না গওহর জুমলাত। তার এই মৌনতার অর্থ, নিরপেক্ষ থাকতে চায় সে।

জাফরী সিগারেট খায় না, নিল শুধু কুতুব দীন আর রানা।

'সাবধান হওয়া উচিত, তাই না?' বিড়বিড় করে বলল কাফা। 'এ পর্যন্ত ভাগ্য তোমাদের ভালই গেছে। কিন্তু তার মানে এই না যে...একদিন সে ঠিকই তোমাদের দেখতে পাবে, আর দেখতে পেলেই সরাসরি ফেলবে এই পিটে!'

'পাঁচশো বোমা, না?' নঈম যাকের সকৌতুকে বলল, 'বোকার মত কথা বলো না। মাথার ওপর থেকে ওটা অনেক দূরে সরে গেছে। আর পরেরটা এখনও সীমান্ত পেরোয়নি। এত মাইল দূর থেকে একটা থান্ডার চীফ ছোট্ট সিগারেটের আলো যদি দেখতে পায় তাহলে আমিও পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি আমাদের ভাগ্যে কি আছে!'

'কি আছে?'

'বিজয়!'

এদিক ওদিক মাথা দোলাল কাফা। 'তা ঠিক, মানি। কিন্তু বিজয়ের আনন্দটা পুরোপুরি উপভোগ করতে পারব না আমরা এই যা।'

'কেন?'

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে কাফা বলল, 'তুমি থাকবে না বলে। তোমার বউ তোমাকে হারাবার শোকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদবে বলে।'

সকলের সাথে গওহর জুমলাতও সাড়া দিল হাসিতে। নঈম যাকের একটা ভাঙা প্লাস্টিকের ব্যাগের ভিতর দেশলাই জ্বেলে সিগারেট ধরাল; তার সিগারেটের মাথা থেকে নিজেদের সিগারেট ধরিয়ে নিল কুতুব দীন আর রানা। মুখের কাছে দু'হাত দিয়ে ঢেকে রেখে যার যার সিগারেটে টান দিল ওরা। আলোর ব্যাপারে এরা সবাই অত্যন্ত সাবধানী। হালকা তিন ইঞ্চি কামানগুলোকে স্টেশনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট বেছে বসানো হয়েছে। লাইট কামানের লোকেরা হেভী কামানের লোকেদের ঈর্ষা করে, তার কারণ কোন রকম বাধ্যবাধকতা, ভীতি বা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আওতায় থেকে শত্রু বিমানের দিকে গুলি করতে হয় না ওদের। বিশেষ করে একটা অ্যারোড্রামের ভাইটাল পয়েন্টে থাকার সময় ধরেই নিতে হয়, শত্রু-বিমানের যে-কোন আক্রমণ একমাত্র তাদেরকেই লক্ষ্য করে। আগুন জ্বেলে সিগারেট খাওয়াটা তাই অদ্ভুত এক ঝুঁকি নেওয়ার মত, রোমাঞ্চিত হওয়ার জন্যে এই ঝুঁকি না নিয়েও পারে না ওরা।

প্লেনটা চলে যাওয়ার পর ডেক চেয়ারে বসে ঝিমানর কথা তুলল না কেউ। সবাই অনুভব করছে, প্রতিটি লোমকূপও যেন সজাগ হয়ে জেগে থাকতে চাইছে। কামানকে ঘিরে স্থির দাঁড়িয়ে আছে ওরা। সতর্ক চোখে সার্চলাইটের গতিবিধি অনুসরণ করছে। অ্যারোড্রামের বাইরে দিয়ে দূরে সরে যাচ্ছে শত্রু বিমান একের পর এক। সার্চলাইটগুলো অনুসরণ করছে আকাশপথটা নির্দিষ্ট গণ্ডি পর্যন্ত। তারপর আবার ফিরে আসছে আকাশের অন্য প্রান্তে, আরেক আগন্তুককে খুঁজে বের করার জন্যে। রানার মনে হল, ওগুলো দক্ষিণ পুব দিক থেকে ফাইটার স্টেশন আল মোবাদা হয়ে বৈরুতের দিকে যাচ্ছে। সার্চলাইটের আলোয় কয়েকবারই একটা করে শত্রু বিমান দেখল ওরা। কিন্তু প্রত্যেকটিই অনেক দূরে, নাইট গ্লাসেও সাদা আলোর ক্ষুদ্র একটা কণার চেয়ে বড় দেখাল না।

দ্বিতীয়বার যেটার উপর সার্চলাইটের আলো পড়ল সেটাকে খালি চোখে দেখাই গেল না। সার্চলাইটের একটা জটলার দিকে চেয়ে আছে রানা। চোখে গ্লাস লাগিয়ে হঠাৎ বলল, 'ওই আরেকটা!' দীর্ঘক্ষণ হা-পিত্যেশ নিয়ে বসে থাকার পর ফাত্না নড়ে উঠলে মাছ-শিকারি যেমন উত্তেজনা বোধ করে তেমনি উত্তেজনা অনুভব করল রানা। টায়ার বন্দর, নাকি আরও উত্তর দিক থেকে আসছে ঠিক বোঝা গেল না। নাক নিচু করে ঘাঁটির দিকে ফিরে যাচ্ছে, তীব্র গতি দেখে রানার মনে হল ফাইটার না হয়েই যায় না।

দেখেছে বলতে শুনেই রানার পাশে চলে এসেছে কাফা। 'আমাকেও দেখার সুযোগ দাও, দোস্ত।'

কিছু বলল কাফা, কিন্তু কি বলল শুনতে পেল না রানা। ওদের দিকেই আসছে কিনা দেখার জন্যে প্লেনটার দিকে অখণ্ড মনোযোগ ওর।

'কি হল! তুমি ছাড়াও তো মানুষ আছে ওটাকে দেখার!'

'এক মিনিট, কাফা,' বলল রানা, 'ওটাকে আমি হারাতে চাই না। দেখা যাক কি যায় না, এত অস্পষ্ট।' কিন্তু দিক পরিবর্তন না করে নিজের পথে টিকে রইল প্লেনটা। গ্লাস জোড়া কাফার হাতে তুলে দিল ও।

'আমি বলি, ওটা জেনালের ডায়নামিকস F-111—বাজি রাখবে কেউ?' চোখে গ্লাস লাগিয়েই বুলি ছাড়তে শুরু করল কাফা।

হেসে ফেলল রানা। 'হেরে গেছ তুমি, কাফা। প্লেনটার বডি তো দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে না ঠিকমত।'

'বাজিতে রাজি কিনা তাই বলো! আমি বলছি ওটা জেনারেল ডায়নামিকস…।'

'কতবার তোমাকে এই এক কথা বলব, কাফা! সব ডায়নামিকসের নাক ছুঁচালো হয় না বা নাক ছুঁচালো হলেই সেটা ডায়নামিকস হয়ে যায় না!' বলল গওহর জুমলাত, 'দেখি, গ্লাস জোড়া এদিকে দাও।'

'আমার প্রশ্নের উত্তর চাই আগে,' তড়পে উঠল কাফা। 'জেনারেল ডায়নামিকস F-111—এর উইং স্প্যান তেষট্টি ফুট?'

'হ্যাঁ।'

'দৈর্ঘ্য বাহাত্তর ফুট দেড় ইঞ্চি?'

'হ্যাঁ।'

'উচ্চতা সতেরো ফুট দেড় ইঞ্চি?'

মাথা নাড়ল গওহর জুমলাত।

'স্পীড ঘণ্টায় এক হাজার ছয়শো পঞ্চাশ মাইল?'

'হ্যাঁ, কিন্তু এসবে কি এসে যায়?'

'রেঞ্জ তিন হাজার তিনশো মাইল?'

'নতুন করে উত্তর দেব তোমার কয়েকটা প্রশ্নের,' রেগেমেগে বলল গওহর জুমলাত। 'তোমার প্রথম প্রশ্নের উত্তরে এখন বলতে চাই, জেনালের ডায়নামিক্স F-111—এর উইং স্প্যান তেষট্টি ফুট নয়।'

'কি!' চোখ কপালে উঠে গেল কাফার। 'তেষট্টি ফুট নয়? একশোবার তেষট্টি ফুট। এইমাত্র তুমি নিজেই স্বীকার করেছ।'

'করেছি,' গওহর জুমলাত বলল, 'কিন্তু ওটা ম্যাক্সিমাম উইংস্প্যান। কমিয়ে ওটাকে সাড়ে একত্রিশ ফুটের মধ্যেও আনা যায়।'

অদম্য হাসি চেপে রাখার জন্যে মুখে হাত চাপা দিয়ে ছটফট করছে নঈম যাকের।

'আর স্পীডও সবসময় ঘণ্টায় এক হাজার ছয়শো পঞ্চাশ মাইল নয়।'

তাকে শুধু ব্যঙ্গ করার জন্যেই এই বিতর্কের সূত্রপাত করা হয়েছে বুঝতে পেরে রাগে জ্বলছে কাফা।

'এমন কি রেঞ্জও ভুল করেছ তুমি,' গওহর জুমলাতের গলার স্বরে কৃত্রিম তিরস্কার, 'তবে ফেরী ট্যাঙ্কসহ রেঞ্জ তিন হাজার তিনশো মাইল বটে।' বাড়িয়ে দিল না কাফা, তার হাত থেকে তুলে নিল সে গ্লাস জোড়া।

বিড় বিড় করে কাফা কি বলল আর কেউ তা শুনতে না পেলেও রানা শুনতে পেল, 'সার্জেন্ট হয়েছে বলে মাথা কিনে নিয়েছে! সব মজা একাই ভোগ করতে চায়!'

'কিছু বলছ নাকি, ডায়নামিকস্ বিশেষজ্ঞ?' হাসি হাসি কণ্ঠে বলল গওহর

জুমলাত। মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়স, এরই মধ্যে সার্জেন্ট হয়েছে সে। দেখে মনে হয় দাম্ভিক আর দায়িত্ববোধহীন, আসলে ঠিক তার উল্টো। তবে সেনাবাহিনীর কঠিন নিয়মকানুনগুলো অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতে দারুণ আপত্তি আছে তার। নিজের লোকদের সে সবচেয়ে বেশি স্বাধীনতা দেবার পক্ষপাতি। কিন্তু এমন কি কাফাও তার দেওয়া সেই স্বাধীনতার অপব্যয় করে না কখনও। বিপদের সময় অচঞ্চল আর কাজের সময় নির্মম, এই হল গওহর জুমলাত। নিখুঁতভাবে শেল ছুঁড়ে লক্ষ্যভেদ করার জন্যে একজন সার্জেন্টের জন্যে চাই ঠিক এই দুটো গুণ। সবাই পছন্দ করে তাকে, নির্দেশ মানে বিনা ওজরে। বম্বারডিয়ার সাইয়িদ হাকাম পর্যন্ত তার সাথে কথা বলার সময় সমীহ প্রকাশ করে, এবং রানা জানে, ওকে সবচাইতে বেশি ভক্তিশ্রদ্ধা করে কাফা।

'জানি, গ্লাস জোড়া তোমারই সম্পত্তি,' বলল কাফা। 'তোমার বলেই ছিনিয়ে কেড়ে নেবে, এর কি মানে আছে? সামান্য একটু ভদ্রতাও কি দেখাতে নেই?'

কেউ জবাব না দেয়ায় সকলের সাথে দাঁড়িয়ে দক্ষিণ পুব দিকের আকাশে সার্চলাইটের অস্থির বিচরণ দেখতে মনোযোগ দিল কাফা। কিন্তু পর পর দু'বার তাকাল সে আড়চোখে রানার দিকে।

'কি?' কিছু বলতে চায় সে, বুঝতে পেরে জিজ্ঞেস করল রানা।

'বলছিলাম কি, এটা একটা বেজন্মা টাইপের যুদ্ধ, দোস্ত। ঠাণ্ডা ইস্পাত, ওই জিনিসই আমার প্রিয়। তোমরা যখন ওগুলোর দিকে শেল ছুঁড়ছ, আমার কোন অনুভূতিই হয় না। এই যে মাথার ওপর আসছে, কিছুই করছে না, নাগালের বাইরে থেকে লেজ গুটিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে—একে তোমরা যুদ্ধ বলো?' এদিক ওদিক মাথা দোলাল সে। 'আমি বলি না। আর্মিই আসলে ছিল আমার জন্যে একমাত্র উপযুক্ত, চেয়েছিলাম ওতে ঢুকতে। মক্তবে থাকতে এয়ার ডিফেন্স-এর একটা নাম-কা-ওয়াস্তে কোর্স শেষ করেছিলাম, সেটাই যত গণ্ডগোল বাধিয়ে দিল।' সরাসরি এতক্ষণে তাকাল কাফা রানার দিকে। তীক্ষ্ণ চোখে দেখার চেষ্টা করল, রানা হাসি চেপে রাখার চেষ্টা করছে কিনা। তারপর ফিসফিস করে শুরু করল আবার।

'আলো ইত্যাদি সম্পর্কে আমাকে রাগতে দেখে তোমরা কি না কি ভাবো। জানি, সবসময় গ্যাস মাস্ক আর স্টীল হেলমেট পরে থাকি বলে তোমরা আমাকে ভীতুর ডিম বলে মনে করো। কিন্তু, জেনে রাখো, কাপুরুষ আমি নই। একটা বেয়োনেট ধরিয়ে দাও হাতে, তারপর দেখো শত্রু এলাকায় ঢুকে একের পর এক কেমন এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করি ওদের পেটগুলো। এই তোমরাই তখন আমাকে দেখে বলবে, আরে, কাফার কি ভয়ও নেই! যাই বলো, দোস্ত, এইরকম চুপচাপ বসে থেকে হাত-পায়ে মরচে ধরাতে একটুও ভাল লাগে না আমার।'

রানাকে টুঁ শব্দ করতে না দেখে লম্বা গলাটা আরও বাড়িয়ে দিল কাফা আবছা অন্ধকারে। নাকে নাক লেগে যাবে ভেবে মুখটা সরিয়ে নিল রানা।

'কি ভাবছ?' কাফার গলার স্বরে সন্দেহ। 'মঙ্গলবার যে ঝাঁকটা এসেছিল সেটার কথা? হ্যাঁ, স্বীকার করছি, সত্যি পা কাঁপছিল আমার, ভয়ে শুয়ে পড়তে ইচ্ছে

করছিল।' গলা একেবারে খাদে নামিয়ে, রানার প্রায় কানের কাছে ঠোঁট নিয়ে গিয়ে বলল সে, 'কিন্তু খুব কি দোষ দিতে পারো? মনে হচ্ছিল গোটা আকাশে এমন আধ হাত জায়গা নেই যেখানে ইসরায়েল উড়ছে না। বৃষ্টির মত বোমা ফেলছিল, তাই না? বলো, দোস্ত, ভাগ্যগুণে বাঁচিনি আমরা? কি?' কনুই দিয়ে ঠেলা দিল কাফা রানার গায়ে, 'ঠিক বলিনি?'

রানা হ্যাঁ-না কিছু বলল না দেখে চাপা কণ্ঠে বলল কাফা। 'বাহ! আমি কি কথা বলারও উপযুক্ত নই?'

'তোমার সম্পর্কে আমার কোন ভুল ধারণা নেই,' বলল রানা। 'তুমি কাপুরুষ নও। তুমি ফ্রাসট্রেশনে ভুগছ, আমিও। দু'জনের প্রকাশ ভঙ্গি দু'রকম, এই যা।'

কণ্ঠস্বর এক লাফে চিৎকারের পর্যায়ে উঠে গেল কাফার। 'ঠিক চিনেছ আমাকে তুমি, দোস্ত! রেগুলার আর্মিতে পাঠিয়ে দিয়ে দেখো, বেয়োনেট···।'

'রাত প্রায় একটা,' বলল গওহর জুমলাত, 'ওদের সবাইকে ঘুম থেকে ওঠাবে, কুতুব?'

কুতুব গানপিট ত্যাগ করতেই নঈম যাকের বলল, 'ওই উত্তরে দেখো তো, জুমলাত। মনে হচ্ছে একটা প্লেন।'

দ্রুত আধপাক ঘুরে চোখে গ্লাস তুলল গওহর জুমলাত। 'ঠিক ধরেছ, যাকের। আসছে ও এদিকেই।'

নিচু পাহাড়ের পিছনটা ওধারের সার্চলাইটের আলোয় পরিষ্কার হয়ে আছে। অনেকগুলো রশ্মি প্যাঁচ খেয়ে গিঁটের মত হয়ে আছে এক জায়গায়। রানা শুধু মুহূর্তের জন্যে দেখল, বা দেখল বলে মনে হল ওর, আলোর একটা উজ্জ্বল ছোট্ট কণা। পরমুহূর্তে সেটাকে হারিয়ে ফেললেও সার্চলাইটগুলোকে এগিয়ে আসতে দেখল এদিকেই ও। গোটা প্যাঁচটাই দ্রুত এগিয়ে আসছে। প্যাঁচের কেন্দ্রটার চারদিকে সূচের মাথার মত উজ্জ্বল আলোগুলোকে ছত্রখান হয়ে যেতে দেখে বুঝতে পারল ও, শেল বিস্ফোরিত হচ্ছে।

সারি সারি পাহাড়ের এদিকের সার্চলাইটগুলো জ্বলে উঠল এই সময়! পরিষ্কার ধরা পড়ল এবার, রশ্মিগুলোর মাথায় একটা শত্রু-বিমান। খালি চোখে দেখা যাচ্ছে তাকে, প্রতি সেকেন্ডে বড় হচ্ছে আকারে।

'মাত্র আট হাজার ফুট ওপরে। আরও নামছে বলেই মনে হচ্ছে,' বলল ডিটাচমেন্ট কমান্ডার। 'গুলি খেয়েছে, বলব নাকি, কাফা? তোমার তো ধারণা, মুখ ফুটে বলি না বলেই খায় না।'

উত্তরে রানার কাঁধ খামচে ধরল কাফা। দম বন্ধ করে চেয়ে আছে সবাই। আশা করছে যে-কোন মুহূর্তে শেলের ধাক্কা খেয়ে গুঁড়ো হয়ে যাবে। কিন্তু কিছুই ঘটল না। নাবাতিয়া ফাইটার স্টেশনের দিকে সোজা উড়ে চলে আসছে প্লেনটা। 'চাঁদ আজ দক্ষিণ দিক থেকেই উঠছে হে! মনে হচ্ছে কিছু অ্যাকশন দেখতে পাব আজ আমরা।' সকলের উত্তেজনার সাথে তার ঠাণ্ডা কথাবার্তার কোন মিল নেই। কামানের দূরাগত

শব্দ এখন আর শোনা যাচ্ছে না, কিন্তু সার্চলাইট প্লেনটাকে আলোর জালে আটকে এগিয়ে নিয়ে আসছে। নিশ্চল রাতের বাতাসে ভর করে ওটার ইঞ্জিনের গুঞ্জন ভেসে আসছে অস্পষ্টভাবে। প্লেনটার গঠন দেখতে পাচ্ছে রানা এখন। দু'পাশে যথাসম্ভব মেলে দেয়া চকচকে ডানা দুটো সাদা আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে।

'ঠিক আছে, সীটে গিয়ে বসো,' গওহর জুমলাত বলল। 'ফিউজ লাইন—লোড!' কাফার হাতে শেলটা তুলে দিল রানা। দস্তানা পরা হাত দিয়ে ব্রীচটা নামিয়ে শেলটাকে ঠেলে ভিতরে ঢুকিয়ে দিল কাফা। ঢং করে একটা শব্দের সাথে উঠে গেল ব্রীচটা। 'সেট টু সেমি-অটোমেটিক।'

নিক্ষিপ্ত তীরের মত কুতুব ছুটে এল পিটে। প্লেনটা এখন পাঁচ হাজার ফুটের মত উপরে, নাবাতিয়ার দিকে এখনও সোজা এগিয়ে আসছে সে। দু'নম্বর রিপোর্ট দিল, 'বসেছি, বসেছি! সীটে বসেছি আমরা।'

এখন গওহর জুমলাতের মর্জি। এখনও সময় হয়নি বলে মনে করলে করার কিছু নেই কারও। ইঞ্জিনের শব্দ বাড়ি মারছে বাতাসে, পরিষ্কার অনুভব করল রানা। হঠাৎ হুকুম হল, 'ফায়ার!'

আগুনের তীব্র চোখ ধাঁধানো ঝলক দেখা গেল, সেই সাথে কেঁপে উঠল গোটা পিট বিস্ফোরণের শব্দে। নিজের হাতে আরেক রাউন্ড শেল আবিষ্কার করল রানা। কামান গর্জে উঠল। আরেক রাউন্ড নিয়ে এগিয়ে এল কুতুব। সার্চলাইটের মাঝখানে উজ্জ্বল একটা ফোঁটার মত প্লেনটাকে দেখা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না। একবার চিনতে পারছে, পরমুহূর্তে হারিয়ে ফেলছে। ফোঁটাটার আশপাশে,নিচে-উপরে ওদের এবং দ্বিতীয় সাইটের তিন ইঞ্চি কামানের শেলগুলো প্রতি মুহূর্তে বিস্ফোরিত হচ্ছে। হঠাৎ মনে হল, মধ্য আকাশে দু'টুকরো হয়ে গেল উজ্জ্বল ফোঁটাটা। হকচকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কাফা, বিস্ময়ে পাথর। স্থির হয়ে গেছে রানাও, পরবর্তী শেলটা এখনও কাফার দিকে বাড়িয়ে ধরে রেখেছে ও। প্লেনটার পোর্ট উইং দুমড়ে-মুচড়ে চ্যাপ্টা, মাঝখানে নাকটা পরিষ্কার ফুটো হয়ে গেছে। তারপর পড়তে শুরু করল প্লেনটা। পিছন দিকে বাঁকা হয়ে গিয়ে গা থেকে তার বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে ডানাটা।

ভিজে ঠোঁট দিয়ে চপ্ করে চুমু খেয়ে ফেলল রানার গালে হুসাইন কাফা। 'খোদার কসম, দোস্ত। নামছে ওটা।' আবার ঘাড় ফিরিয়ে নিয়ে প্লেনটার দিকে তাকাল সে। দু'হাত মুঠো করে নাকের কাছে তুলল ঘুসি মারার ভঙ্গিতে, যেন প্লেনটা ওর দিকেই সরাসরি নেমে আসার মতলবে আছে, আর নেমে এলেই বক্সিং মেরে নাক ফাটিয়ে দেবে সেটার।

আশ্চর্য দ্রুতবেগে পড়ে যাচ্ছে প্লেনটা। প্রতি সেকেন্ডে দ্বিগুণ হয়ে উঠছে আকারটা। সরাসরি নেমে আসছে ওটা অ্যারোড্রামের কিনারার দিকে। মুহূর্তের জন্যে কালো বড় ক্রস চিহ্নটা অবশিষ্ট ডানার ফলায় দেখতে পেল রানা। তারপরই মাটির সাথে সংঘর্ষ হল। একটা সার্চলাইট নিপুণভাবে প্লেনটাকে অনুসরণ করে মাটি পর্যন্ত পৌঁছুল। অ্যারোড্রামের উত্তর দিকটা আলোয় পরিষ্কার। কাঁটা ঝোপের মাঝখানে

মাটিতে গেঁথে গেছে নাকটা। সংঘর্ষের সাথে সাথেই লেজটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। শরীরটা দোমড়ানো মোচড়নো একটা কুণ্ডলী ছাড়া কিছু নয় এখন আর। মাটিতে পড়ার একমুহূর্ত পর আওয়াজটা ভেসে এল কানে। পতনের ভারি শব্দের সাথে মেশানো ধাতব পদার্থের ভয়ঙ্কর আর্তনাদ।

শব্দটা থামার আগেই সার্চলাইট উঠে গেল আকাশে। কয়েক সেকেন্ড প্লেনটাকে আর দেখতেই পেল না রানা। অথচ সার্চলাইটের আলোয় অ্যারোড্রামের কিনারাগুলো দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার। হঠাৎ ওর চোখে ধরা পড়ল আলপিনের মাথার মত ছোট্ট একটুকরো আলো। ক্রমেই বড় হচ্ছে সেটা। হঠাৎ সেটা লাফ দিয়ে ছড়িয়ে গিয়ে কয়েকশো গুণ বড় হয়ে গেল। কমলালেবুর মত রঙ। দেখতে দেখতে প্রকাণ্ড ছাতার আকৃতি নিয়ে কয়েকশো ফুট উপর পর্যন্ত উঠল আগুনের শিখা। তারপর নাচতে নাচতে ছোট হতে থাকল শিখাগুলো। প্লেনের ভিতর থেকে কেউ যেন টেনে নিচ্ছে আগুনের শাড়ি। শিখাগুলো অদৃশ্য হওয়ার পর জ্বলন্ত ধ্বংসস্তূপের আলোয় নিখুঁত একটা প্রকাণ্ড বৃত্ত দেখা গেল ধোঁয়ার, ধীরে ধীরে উঠে যাচ্ছে আকাশের দিকে।

'কি ভয়ঙ্কর!' জাফরীর ফোলা মাংসল মুখটা প্রতিমুহূর্তে চেহারা বদলাচ্ছে, জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে যেন সে নিজেই রয়েছে দাঁড়িয়ে।

'ভয়ঙ্কর? কি বলতে চাইছ, তুমি?' কাফার ভঙ্গিটা জবাবদিহি চাওয়ার মত।

'আমাদের মত ওরাও তো মানুষ।' জাফরীর দুটো হাত বুকের কাছে পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে আছে, চোখের মণি দুটো জ্বলন্ত ধ্বংসস্তূপের দিকে স্থির।

'ঘেয়ো কুকুর, বেজন্মা খুনী—এই হল ওদের একমাত্র পরিচয়, দোস্ত। ওদের প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে আমাদের সকলের দুশমন হতে চাইছ কেন বুঝতে পারছি না।'

'দ্যাখো দ্যাখো!' চেঁচিয়ে উঠল কুতুব সার্চলাইটের আলোর দিকে তর্জনী তুলে, 'প্যারাসুট। দুটো প্যারাসুট!'

বিধ্বস্ত প্লেন থেকে সকলের চোখ সার্চলাইটের রশ্মি বেয়ে উঠে গেল আকাশের গায়ে। সিল্কের দুটো ছাতা অলস ভঙ্গিতে মাটির দিকে নামছে। দুই ছাতার অনেকটা নিচে ঝুলছে দু'জন লোক।

'কৃতিত্বটা কাদের—আমাদের না দ্বিতীয় সাইটের?'

বম্বারডিয়ার সাইয়িদ হাকামের গলা শুনে ফিরল রানা। এখনও প্রায় উলঙ্গ সে, আন্ডারওয়্যার পরে খালি গায়েই উঠে এসেছে বিছানা ছেড়ে। লোমশ একটা ভালুক, তেমনি কালো গায়ের রঙটাও। পিছনে তার বাকি ডিটাচমেন্ট, যে যা হাতের কাছে পেয়েছে তাই কোমরে আর গায়ে জড়িয়ে বেরিয়ে এসেছে ছাউনি থেকে।

'সকল কৃতিত্ব তাঁর,' নিঃসীম শূন্যের দিকে আঙুল তুলে সাথে সাথে উত্তর দিল কাফা। 'আমরা তো অছিলা মাত্র। তবে, ওরা যদি দাবি করে যে গুলি করে নামিয়েছে, বেয়োনেট দিয়ে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে দেব ওদের প্রত্যেককে।'

'বলা মুশকিল,' বলল গওহর জুমলাত, 'জায়েদীর গানও সচল ছিল। দুটো সেলের বিস্ফোরণ আমি নিজের চোখেই দেখেছি। একটা ডান দিকে, একটু দূরে;' আরেকটা

যেন পোর্ট উইং-টিপের কাছাকাছি। কোনটা যে আমাদের তা বলা অসম্ভব। আশ্চর্য রকম লাকি শট, তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

গানপিটের মাথার কাছে ট্রুপ ভ্যানটা থামল এসে। প্রকাণ্ড মুখে প্রকাণ্ড এক হাসি সায়েদ সাবরীর, লাফ দিয়ে ভ্যান থেকে নামল। 'কংগ্রাচুলেশনস্, জুমলাত,' বলল সে, 'ড্যাম গুড শ্যুটিং।'

'কি, বলিনি!' কাফা বলল।

'শেলটা কি আমাদের, নাকি...?'

'এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ আছে বলে মনে করি না। যদিও, ওদের ধারণা ওরাই পেড়েছে বিষাক্ত ফলটা আকাশ থেকে। কিন্তু, জায়েদীর প্রথম শটটা ডান দিক ঘেঁষা ছিল, স্পষ্ট দেখা গেছে তা। সে ফায়ার করছিল ফিউজ টুয়েলভ, এবং তা অলটার করার সময়ই পায়নি। তোমার প্রথম শটটা নিঃসন্দেহে খাটো ছিল। তোমার ফিউজ বদলাওনি নিশ্চয়ই?'

'না। ফিউজ নাইনে তিনটে ফায়ার করি আমরা।'

'তাহলে সন্দেহের আর কিছু নেই। থান্ডারচীফটা সরাসরি শেলটার পথে ঢুকে পড়েছিল।' পিটের চারদিকে তাকাল সায়েদ সাবরী। 'সেকেন্ড ডিটাচমেন্টের টেক-ওভারের সময় হয়ে গেছে, তাই না? ঠিক আছে, স্ট্যান্ড-টু-এর সবাই ভ্যানে গিয়ে উঠে পড়ো, সাফল্যটা কাছ থেকে এক নজর দেখে আসি চলো।'

বলতে যা দেরি, বালির বস্তা বেয়ে টপাটপ উপরে উঠতে শুরু করে দিল সবাই। ভ্যানে চড়ে সবাই একসাথে কথা বলে উঠল, কে কি কাকে বলছে তা বোঝার কোন ধার ধারছে না কেউ। অ্যারোড্রোমের উত্তর প্রান্তে ভ্যান থামতে ওরা দেখল, ধ্বংস-স্তূপটা তখনও জ্বলছে। চারপাশের বেশ ক'টা ঝোপেও আগুন ধরে গেছে। এরই মধ্যে এসে গেছে গ্রাউন্ড ডিফেন্সের গার্ডরা। কিন্তু প্রচণ্ড উত্তাপের জন্যে পঞ্চাশ গজের বেশি এগোনো সম্ভব নয়। শরীরের খোলা অংশে আগুনের আঁচ লাগল ওদের। খানিকটা যেন অসহায় দেখাচ্ছে সবাইকে। আগুনের আভা লেগে লালচে দেখাচ্ছে মুখগুলো। শিখাগুলোর দিকে চেয়ে আছে মন্ত্রমুগ্ধের মত। দুমড়েমুচড়ে এমন হয়েছে চেহারা, চেনাই যাচ্ছে না ওটাকে একটা প্লেন বলে। কালো হয়ে আসা ইস্পাতের কাঠামোটা ঘিরে নাচানাচি করছে আগুন। কালোর কোথাও কোথাও অদ্ভুত সাদা, নীলচে রঙের পোঁচ চোখে পড়ছে। ইস্পাত গলছে।

আচমকা একটা চিৎকার, সাথে সাথে আকাশের দিকে মুখ তুলল সবাই। প্রায় ওদের মাথার উপরই নিষ্প্রভ কমলা রঙের একটা প্যারাসুট দেখা গেল। লোকটা নামছে, ধীরে ধীরে নিঃশব্দে সরে যাচ্ছে বাতাসের ধাক্কায়। মুখ তুলে নির্বাক দেখছে ওরা। অগ্নিশিখার পত্‌পত্ শব্দ ছাড়া কোথাও আর কোন শব্দ নেই, তাতেই কানে তালা লাগার মত অবস্থা। প্রকাণ্ড ছাতাটা আরও নেমে আসতে কর্ডের সাথে বাঁধা ঝুলন্ত লোকটার মুখ দেখতে পাওয়া গেল। মৃদু দুলছে সে এদিক ওদিক মোটা কর্ডের সাথে। ভাবলেশহীন একটা মুখ, যেন মুখোশ পরে আছে।

মাটির কাছাকাছি আসতে বোঝা গেল, মোটেই ধীর গতিতে নামছিল না প্যারাসুটটা। বাতাস কেটে সাঁ সাঁ করে নেমে আসতে দেখল ওরা লোকটাকে। অ্যারোড্রোমের কিনারায়, টারমাকের উপর পা ফেলতে সমর্থ হল সে, তারপর শরীরটাকে গড়িয়ে দিয়ে ধাক্কাটা থেকে বাঁচতে চাইল। প্রায় একশো গজ দূর থেকে তার পতনের ভারি শব্দ শুনে অবাক হল রানা।

সেদিকে দৌড়ুল সবাই। হামাগুড়ি দিয়ে উঠে বসার চেষ্টা করছে লোকটা, সবার আগে রানা তার কাছে গিয়ে পৌঁছুল। ব্যথা পেয়েছে, কোঁচকানো অবস্থায় স্থির হয়ে আছে রক্তশূন্য সাদা মুখটা। কোমরের বেল্ট থেকে রিভলভার বের করার জন্যে বা আত্মসমর্পণের জন্যে হাত তোলার চেষ্টা করছে না সে। বাঁ হাঁটুতে ভর দিয়ে দাঁড়াল। কিছুই করল না আর। করার মত কিছু নেই তার, উপলব্ধি করল রানা। একটা হাত মরা সাপের মত তার পাশে ঝুলছে, টলছে সে, যেন যে-কোন মুহূর্তে সটান পড়ে যেতে পারে।

কিন্তু দু'পায়ের উপর দাঁড়িয়েই রইল সে। ধীরে ধীরে ফ্যাকাসে মুখটা বদলে যাচ্ছে। ক্রমে ফুটে উঠছে ইহুদী ক্রোধ আর বিদ্বেষ।

একজন গার্ড লোকটার বেল্ট থেকে খুলে নিল রিভলভারটা। ওদের সকলকে একবার করে দেখে আগুনের আওয়াজকে ছাপিয়ে চিৎকার করে প্রশ্ন করল সে, 'তোমাদের অফিসার কে?'

কেউ বুঝল না প্রশ্নটা। দ্রুত নিজের চারদিকে তাকাল রানা। কোন অফিসারকে দেখল না ও। গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সোলজাররা লোকটাকে ঘিরে। ইংরেজি জানে না কেউ এরা।

শকুনের মত গলা বাড়িয়ে আবার প্রত্যেকের দিকে তাকাচ্ছে ইসরায়েলি পাইলট: লম্বা, ছুঁচালো মুখ। মজবুত, ছোটখাট গঠন। ত্রিশের বেশি হবে না বয়স, আন্দাজ করল রানা। মাথাভর্তি কালো চুল, চোখের মণিদুটো সাদাটে ছাই রঙের।

'কি ভাবছ তোমরা আমাকে? চিড়িয়াখানার জন্তু?' কি কারণে কে জানে, সকলের উপর রাগে কাঁপতে লাগল লোকটা। 'যাও, তোমাদের অফিসারকে ডেকে নিয়ে এসো।'

কেউ নড়ল না জায়গা ছেড়ে। প্রত্যেকের দিকে হিংস্র দৃষ্টিতে তাকাল ইসরায়েলি পাইলট। যেন নীরবতা অসহ্য লাগছে বলেই চিৎকার করে উঠল সে, 'একটা প্লেন নামিয়েছ বলে ভেবো না যে যুদ্ধে তোমরাই জিতছ! খুব বেশি দেরি নেই। সময় ঘনিয়ে এসেছে! গোটা লেবানন দখল করে নিচ্ছি আমরা!'

'চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছ, কিন্তু এখনও তো পারোনি,' লোকটার হুমকি সহ্য করতে না পেরে সকলের হয়ে ইংরেজিতে জবাব দিল রানা।

সাড়া পেয়ে ঝট করে ফিরল লোকটা রানার দিকে। আপাদমস্তক দেখল ওর। প্রতিহিংসায় জ্বলজ্বল করছে চোখ দুটো। ঘামে ভেজা মুখটা মুছল সে সচল হাতটার উল্টো পিঠ দিয়ে। থোঃ শব্দ করে রানওয়েতে রক্তের ফেনা মেশানো থুথু ফেলল এক দলা। রাগ সামলাতে পারছে না লোকটা, পরিষ্কার বুঝল রানা।

'বেজন্মা আরব। তোমরা অন্ধ, অন্ধ!' রানওয়েতে পা ঠুকে চিৎকার করে বলল সে। 'তাই দেখতে পাচ্ছ না, দিন ফুরিয়ে এসেছে তোমাদের।'

'তাই নাকি?'

'ঠাট্টা করছ?' ইসরায়েলি পাইলট এক পা এগোল রানার দিকে।

হেসে ফেলল রানা। এত চোটপাট দেখাবার দরকার নেই,' বলল ও, 'তুমি যে অসহায়, সে আমরা জানি।'

'বেয়াকুব আরব! কিছুই জানো না তুমি!' হঠাৎ গলা খাদে নামিয়ে ঠোঁট বাঁকা করে হাসল লোকটা। 'ফাইটার অ্যারোড্রোমগুলো কেড়ে নেব আমরা, তার জন্যে আক্রমণের ছকও তৈরি করা হয়ে গেছে। আরও জেনে রাখো, তারিখও বেছে রেখেছি আমরা। মাত্র আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যেই গোটা লেবানন কব্জা করব আমরা।'

মানুষের বৃত্তের একটা ফাঁক দিয়ে রানা দেখল L. A. F.-এর একটা প্রকাণ্ড কার ব্রেক কষে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। C. O. নাবাতিয়া এবং আরও কয়েকজন নামল গড়িটা থেকে। গ্রাউন্ড-ডিফেন্স অফিসারকেও তাদের মধ্যে দেখল ও। 'তোমাকে বিশ্বাস করি না,' দ্রুত বলল ও, 'প্রলাপ বকছ তুমি।'

'বিশ্বাস করো আর নাই করো, সময় এলেই দেখতে পাবে,' কণ্ঠে শ্লেষ মিশিয়ে বলল লোকটা। 'আমাদের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ওয়াইজম্যানের প্ল্যান এটা...।'

'তুমি জানবে প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর প্ল্যান! আসলে ভয় পেয়েছ, তাই...।'

ঘৃণায় বিকৃত হয়ে উঠল লোকটার মুখ। 'ঠিক আছে, শুক্রবার আসুক, নমুনা দেখতে পাবে।'

'কি হবে শুক্রবারে?'

'নাবাতিয়া ধ্বংস হবে!' চেঁচিয়ে উঠল লোকটা। 'তোমরা ধ্বংস হবে। আমাদের ডাইভ-বোম্বারগুলো আসবে ঝাঁকে ঝাঁকে! দেখো, কথাটা ফলে কিনা!'

শত্রুর হাতে ধরা পড়ে কাউকে এমন খেপে উঠতে এর আগে দেখেনি রানা। লোকটা মূল্যবান তথ্য প্রকাশ করে ফেলেছে—রাগের মাথায়? নাকি ইচ্ছে করেই ভুল ধারণা দিচ্ছে? কিন্তু অভিনয় করছে বলে মনে হল না রানার। লোকটাকে আরও খেপিয়ে তোলার জন্যে তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটিয়ে তুলল মুখে ও।

জাদুমন্ত্রের মত কাজ হল। মাটিতে পা ঠুকে, দাঁতে দাঁত ঘষে, হাতের মুঠো পাকিয়ে অসহ্য ক্রোধ আর ঘৃণা প্রকাশ করল সে। 'মাত্র আটচল্লিশ ঘণ্টা সময় লাগবে। সবগুলো ফাইটার স্টেশন হারিয়ে ডিফেন্সলেস হয়ে যাবে তোমরা! এখন বিশ্বাস করছ না, কিন্তু শুক্রবারে ঘটনাটা ফললে...?' আচমকা থামল সে। রানা পরিষ্কার দেখল, বিস্ময় এবং একই সাথে ভয় ফুটে উঠল তার দু'চোখে।

ঘাড় ফেরাতেই উইং কমান্ডার তারেক হামেদীকে ঠিক ওর পিছনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল রানা। কিন্তু C.O.-এর দিকে নয়, ইসরায়েলি পাইলটের মুহূর্ত কয়েকের নিষ্পলক দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে মিস্টার জামাল আরসালান, স্টেশন লাইব্রেরিয়ানের দিকে। পাইলট লোকটা যেন সাক্ষাৎ ভূত দেখে বোবা হয়ে গেছে, মুখ

আর খুলতেই সাহস পেল না। শেষবার ওকে দেখল রানা, দু'জন গার্ডের মাঝখানে রেখে তাকে মার্চ করিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে C.O.-এর গাড়ির দিকে। এক মুহূর্তের মধ্যে অদ্ভুত বদলে গেছে লোকটা। মাথাটা হেঁট হয়ে আছে, চলার ভঙ্গিতে অসম্ভব ক্লান্তি। গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছুবার আগে পড়ে গেল না দেখে অবাকই হল রানা।

কিন্তু এমন ভয় পেল কেন লোকটা?

তিন

লেক ভ্যান। তুরস্ক।

পশ্চিমের মাউন্ট আরারাটের চূড়ায় গা ঠেকিয়ে একটু জিরিয়ে নিচ্ছে ক্লান্ত সূর্য। তীরচিহ্নহীন লেক ভ্যানের স্বচ্ছ নীল জলরাশির উপর বেলাশেষের মলিন রোদ। হালকা কুয়াশা ভাসছে পানির উপর। আবছা মত দেখতে পাচ্ছে রানা চারশো গজ দূরের ছোট্ট দ্বীপটাকে।

নোঙর ফেলা বোটটা লেকের মাঝখানে স্থির হয়ে আছে। ফাইবার গ্লাসের বোটটার সামনের দিকে স্টীল কাঠামোর উপর গদিমোড়া সীট, শিরদাড়া খাড়া করে তাতে বসে আছে রানা। অথৈ জলরাশি, বড় বড় ঢেউ, চারদিকে জনমনুষ্যির চিহ্ন নেই। সবচেয়ে কাছের শহর এরজুরাম। বন্ধুর, পার্বত্য এলাকা—তারই মাঝখানে এই লেক ভ্যান। মাছ ধরছে রানা বাজি ধরে।

বোটহাউসটা পুব পাড়ে। একজোড়া বুড়োবুড়ি সেটা পরিচালনার দায়িত্বে আছে। তাদের কাছ থেকে আউট বোর্ড ইঞ্জিন বসানো এই বোট নিয়ে দুপুর সাড়ে বারোটায় এখানে পৌঁছেচে রানা। সাথে ডেপথ্ ফাইভার থাকায় সুবিধেই হয়েছে ওর। সঙ্কেত চিহ্ন দেখে পানি যেখানে বিশ ফুট গভীর সেখানে নোঙর ফেলেছে ও। এরজুরাম থেকেই উপকরণ সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছিল, বোটে বসে একটা বাংলাদেশী স্পেশাল চার তৈরি করে পানিতে ফেলেছে।

আর্টিফিশিয়াল বেইট থ্রো করছে রানা। চার ফেলা হয়েছে প্রচুর মাছ টেনে এক জায়গায় জড়ো করার জন্যে। স্পিনিং রড ব্যবহার করছে সে। রডের মাথাটা উপর থেকে ডানদিকে নামিয়ে এনে আবার এক ঝাঁকিতে উপরে তুলতেই স্পিনিং রীল থেকে সড় সড় করে সুতো খসিয়ে নিয়ে $\frac{৩}{৮}$ আউন্সের ফ্লোটিং ডাইভিং প্লাগ চলে যাচ্ছে বহু দূরে। রিট্রিভ করছে রানা। পানিতে পড়ে প্লাগটা ভাসে, কিন্তু বাঁ হাত দিয়ে রীলের হ্যান্ডেল ঘোরাতে শুরু করলেই সেটা নিচের দিকে ডাইভ দেয়। ফিরে আসার সময় বরশি ফিট করা নকল মাছটা কাঁপতে থাকে মৃদু, ঠিক যেন অকুতোভয়, অর্বাচীন ছোট্ট একটা মাছ সাঁতার কেটে চলেছে তরতর করে। বড় মাছের পক্ষে ওটাকে টপ করে গিলে ফেলার লোভ সামলানো মুশকিল।

রিস্টওয়াচ দেখল রানা। সাড়ে পাঁচটা। সাতাশটা মাছ ধরা হয়ে গেছে ওর। কিন্তু

দ্রুত কমে আসছে চারের কার্যকারিতা। এরজুরামে ফিরতে হলে আরও তিনটে মাছ না ধরলেই নয়। তা না হলে হেরে যাবে ও বাজিতে।

ইদিশা, জন স্টিফেন আর ইশরাত, তুরস্কের তিন নতুন বন্ধু ওরা। কিভাবে যেন অনুমান করে নিয়েছে তারা, তাদের এই নতুন বন্ধুটির জীবনে বড় রকমের একটা দুঃখ আছে। প্রশ্ন করে জেনে নেবার চেষ্টা করেনি, সেজন্যে ওদের প্রতি কৃতজ্ঞ রানা। ব্যাপারটা অনুমান করতে পেরে নিতান্ত শুভাকাঙ্ক্ষীর মত রানাকে তারা হাসিতে আনন্দে মাতিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে, কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে সহানুভূতি প্রকাশের মত স্থূলতা দেখায়নি। এদের নিঃস্বার্থ ভালবাসায় আটকা পড়ে গেছে রানা, সাময়িকভাবে হলেও। রেবেকাকে হারিয়ে সিঙ্গাপুর ত্যাগ করেছে সে প্রায় মাস দেড়েক হল। গেছে হংকং, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, জার্ম্যানী, ইরান—রেবেকাকে ভোলার জন্যে ছটফট করে বেরিয়েছে সর্বত্র, কিন্তু টিকতে পারেনি কোথাও। স্মৃতিগুলো তাড়া করে ফিরেছে ওকে। কোথাও দু'রাতের বেশি থাকেনি ও। ব্যতিক্রম শুধু তুরস্ক। ইদিশা, ইশরাত আর জন স্টিফেন ওকে আজ পনেরো দিন আটকে রেখেছে।

তর্কটা ওঠে সকাল দশটায়। লেক ভ্যানে এমনিতেই মাছ ধরা কঠিন, দশটা মাছ ধরে সেদিনই দশটার মধ্যে ফিরে আসা তো অসম্ভব। সম্ভব যে নয় তার জলজ্যান্ত প্রমাণ জন স্টিফেন নিজেই। ইশরাতের সাথে গত বছর বাজি ধরে হেরেছে সে। কাঁটায় কাঁটায় রাত দশটায় লেক ভ্যান থেকে এরজুরামে ফিরতে পেরেছিল বটে, কিন্তু মাছ ধরে নিয়ে এসেছিল মাত্র তিনটে। হেরে যাওয়ায় তিন হাজার ডলার দণ্ড দিতে হয় তাকে।

অসম্ভব বলে কোন জিনিস নেই, কথাটা খেয়ালের বশেই বলে ফেলে রানা। আর যায় কোথায়, সবাই অমনি চেপে ধরল ওকে—অসম্ভব যদি নাই হয়, প্রমাণ করে দেখাও সম্ভব!

শুধু কথাটা ফেরত নিতে খারাপ লেগেছিল বলেই ওদের প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেল রানা, ঝোঁকের মাথাতেই বলে ফেলল দশটা নয়, ত্রিশটা মাছ ধরে আনবে সে। তবে এর মধ্যে কিছু কথা আছে—জাপানের অলিম্পিক কোম্পানীর স্পিনিং আউটফিট জোগাড় করে দিতে হবে আমাকে। থ্রী পীস রডটা হতে হবে ফাইবার গ্লাসের, আটফুট লম্বা, স্পিনিং রীলে থাকতে হবে বারো পাউণ্ড টেস্টের তিনশো গজ নাইলন মনোফিলামেন্ট লাইন।

রানা জানত না ওরা তিনজনই মাছের পোকা। দশ মিনিটের মধ্যেই যা যা দরকার হাজির হয়ে যেতে পিছিয়ে আসার সব পথ বন্ধ হয়ে গেল। রওনা হবার আগে রানাকে অবশ্য ওরা দ্বিতীয়বার সিদ্ধান্ত নেবার একটা সুযোগ দিয়েছিল। কিন্তু জবাবে রানা বলে এসেছে, ভেবেছ কি! বাংলাদেশের ছেলে আমি, যে দেশে প্রায় প্রতিটি গ্রাম থেকে নদী বা খাল গড়পড়তায় মাত্র একশো গজ দূরে। মাছ কিভাবে ধরতে হয় তা আমি জানব না তো জানবে কে! এমন বাংলাদেশী চার তৈরি করে পানিতে ফেলব যে তোমাদের লেক ভ্যানের সমস্ত মাছ পাগল হয়ে ছুটে আসবে।

প্রায় একশো মাইল দুর্গম পথ। সাড়ে দশটায় রওনা হয়ে সাড়ে বারোটায় পৌঁছেচে রানা। এখন সাড়ে পাঁচটার উপর বাজে। আরও তিনটে মাছ চাই। কতক্ষণ সময় আছে আর? এরজুরামে ফেরার রাস্তা বিপদসঙ্কুল। সন্ধ্যায় রওনা হলে এরজুরামে ফিরতে পুরো তিন ঘণ্টা লেগে যাবে। পাহাড়ি পথ, অন্ধকারে দেখে শুনে গাড়ি না চালালে খাদে পড়ে ইহলীলা সাঙ্গ হবার সমূহ সম্ভাবনা। যেমন করে হোক সাতটার আগেই রওনা দিতে হবে ওকে। তা না হলে দশটার মধ্যে পৌঁছুতে পারবে না এরজুরামে। কিন্তু রওনা হবার কথা আরও পরে ভাবলেও ক্ষতি নেই, এখন আরও মাছ চাই তিনটে। বাজিতে হেরে যাওয়ার কোন ইচ্ছে নেই রানার। কিন্তু চার যা ছিল চেটেপুটে খেয়ে নিয়ে সরে পড়তে শুরু করেছে মাছগুলো, ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠছে মাছ ধরা, দেরি হচ্ছে টোপ গিলতে।

অবশ্য বড় আকারের একটা ব্লু-ফীন যদি টোপ গিলে লম্বা একটা খেলা দেয়, প্যারিসে পনেরো দিন বিনা খরচে বেড়িয়ে আসার লোভ ত্যাগ করে সামনের গোটা রাতটা লেক ভ্যানে কাটাতেও আপত্তি নেই রানার। না হয় বাজিতে হারই স্বীকার করতে হবে ওকে, কিন্তু মাছ খেলানর মধ্যে যে আশ্চর্য আদিম পুলক রয়েছে তার সাথে আর তেমন কিসেরই বা তুলনা চলে!

বেইট থ্রো করে রিট্রিভ শুরু করার আগে, রিস্টওয়াচ দেখল রানা। পাঁচটা চল্লিশ। আড়াই থেকে তিন মিনিটের মধ্যে মাউন্ট আরারাটের আড়ালে লুকিয়ে পড়বে সূর্য, আর পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে অন্ধকার হয়ে আসবে চারদিক। স্পীডবোটের মালিক, বুড়ো অ্যাঙলার বারবার সাবধান করে দিয়েছে ওকে, কাছেপিঠে লোক বসতি না থাকলেও, জলদস্যুদের দুর্ধর্ষ একটা দল আছে লেকের এদিকে। দূর থেকে নাইট গ্লাস দিয়ে লক্ষ্য করে তারা মাছ শিকারী কেউ রাতের জন্যে লেকে রয়ে গেল কিনা। থাকলে লুট করার সুযোগটা হাতছাড়া করে না কখনও।

মনে ভয়টাকে বসতেই দিল না রানা। সঙ্গে রয়েছে ওর বিশ্বস্ত ওয়ালথার পি. পি. কে—ভয় কি!

বিকেল চারটের দিকে শেষ অ্যাঙলারটাকে মুখ চুন করে ফিরে যেতে দেখেছে রানা। ক'টা মাছ ধরেছ, রানার এই প্রশ্নের জবাবে আঙুল দিয়ে শূন্যে বিরাট একটা গোল বৃত্ত এঁকে লাইন গুটিয়ে নেয় সে। 'আয় আয়,' খাঁ খাঁ করে ভোর পাঁচটা থেকে অবিরাম ডাকাড়াকি সাধাসাধি করেছে বেচারা, টোপে একটা মাছ ঠোকর পর্যন্ত দিতে আসেনি।

জেদের মাথায় বড়াই করে বললেও, তৈরি করার সময় রানার সন্দেহ ছিল বাংলাদেশী মশলা তুরস্কের মাছেরা ঠিক পছন্দ করবে কিনা। সব সন্দেহের নিরসন ঘটল টোপ ফেলে রিট্রিভ শুরু করার ত্রিশ সেকেন্ড পরই। তেরো সের ওজনের বাচ্চা একটা স্যামন তুলল ও। কাণ্ড দেখে ফাটা কপালে অ্যাঙলারটা ওর দিকে পিছন ফিরে বসেছিল। লাইন গুটিয়ে টোপটা পানি থেকে তুলে নিল রানা। রডটা পায়ের কাছে নামিয়ে রেখে সিগারেট ধরাল একটা। লেকের চারদিকটা দেখে নিল একবার। ঘন হয়ে

নামছে কুয়াশা। দুশো গজের ওদিকে দৃষ্টি চলে না। ভুরু কুঁচকে চিন্তা করল কয়েক সেকেন্ড। তারপর মাথা নাড়ল আপন মনে। গুণে গুণে আর তিনবার টোপ ছুঁড়বে ও, মাছ পেলে ভাল, তা না হলে ফিরে যাবে। মাছ ধরার আগ্রহটা কেন যেন হঠাৎ করেই উবে গেছে মন থেকে। উৎসাহ বোধ করছে না এখন আর। একগাল ধোঁয়া ধীরে ধীরে ছেড়ে রেবেকার মুখটা চোখের আড়াল করতে চাইল যেন ও।

দু'ঠোঁটের ফাঁকে সিগারেট রেখে ডান হাতে তুলে নিল রানা স্পিনিং রডটা। সীটে বসেই পানিতে লক্ষ্যস্থির করল, তারপর লাইনটা তর্জনীতে আটকে নিয়ে পিক-আপ আঙটা খুলে দিল। বাম দিক থেকে সাইড কাস্ট করল সে এবার। নিক্ষিপ্ত তীরের মত ছুটল আর্টিফিশিয়াল বেইট। প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে, ঠিক যেখানে চেয়েছিল রানা, টুপ করে পড়ল সেটা পানিতে। বাঁ হাতে লম্বা রীল হ্যান্ডেল ঘোরাতে শুরু করল রানা। ডুব দিল টোপটা, গোত্তা খেয়ে কাঁপতে কাঁপতে নেমে যাচ্ছে সেটা নিচের দিকে।

ধীরে ধীরে লাইন গুটিয়ে নিচ্ছে রানা। পনেরো সেকেন্ড কাটল, তখন হুইল ঘোরাচ্ছে রানা, হঠাৎ টান পড়ল লাইনে। রক্ত ছলকে উঠল রানার বুকের ভিতর। হার্টবিট বেড়ে গেল। টোপ গিলেছে মাছ। টের পাওয়ামাত্র হ্যান্ডেল ঘোরানো বন্ধ করে ছোট্ট একটা টান মারল রানা। ধনুকের মত বাঁকা হয়ে গেল রড। বনবন করে ঘুরতে শুরু করল স্পূলটা উল্টো দিকে। সুতো টেনে বের করা যাতে মাছের জন্যে সহজ না হয় সেজন্যে ব্রেক দেয়া আছে রীলে, কিন্তু খুব শক্ত করে আঁটেনি রানা ব্রেকটা, কেননা সুতো ছিঁড়ে যাওয়ার কিংবা মাছের মুখ ছিঁড়ে হুক খসে আসার ভয় আছে তাতে। চট করে রীলের পেছনে অ্যান্টি-রিভার্স লকটা অন করে দিল সে।

প্রথম চোটেই প্রায় দেড়শো গজ লাইন বেরিয়ে গেল স্পূল থেকে। রোমাঞ্চিত না হয়ে পারল না রানা। বড়শিতে বেশ বড় আকারের মাছই গেঁথেছে। প্রথম দৌড় শেষ হয়ে আসতেই ডান হাতের তর্জনী ঠেকাল রানা স্পূলের গায়ে। বাড়তি ব্রেক চাই এবার।

হঠাৎ পিছন ফিরে দ্রুতবেগে রানার দিকে ফিরে আসতে শুরু করল মাছটা। দ্রুতবেগে হ্যান্ডেল ঘোরাতে শুরু করল রানা। স্পিনিং রীলের মালটিপ্লাইং অ্যাকশন সাহায্য করল রানাকে—একটুও ঢিল পড়ল না সুতোয়। একপাক হ্যান্ডেল ঘুরলে স্পূলটা ঘুরছে পুরো চার পাক।

পঞ্চাশ গজ সোজা এসে ডাইনে মোড় নিল মাছটা। কড় কড় শব্দ তুলে বেশ কিছুটা সুতো বেরিয়ে গেল স্পূল থেকে। তর্জনী দিয়ে স্পূলের কিনারাটা চেপে রাখায় কিছু দূর ডাইনে গিয়ে আবার কাছে আসতে শুরু করল মাছটা। বোটের দশ গজের মধ্যে এসেই পাগলের মত এদিক ওদিক দৌড়াতে শুরু করল মাছটা—আরও কাছে আসতে ওর প্রবল আপত্তি। লাফ দিয়ে পানি থেকে শূন্যে উঠল বার কয়েক। চকচকে রূপোলী দু'পাশ, মাঝখানে খয়েরী রঙ—চোখ জুড়িয়ে যায় দেখে। লেজ ঝাপটা দিয়ে পানি ছিটাল চারপাশে।

এবারে খুব সাবধানে সুতো ও ছিপের ওপর যেন অতিরিক্ত চাপ না পড়ে সেদিকে

খেয়াল রেখে পাম্প করতে শুরু করল রানা। স্পূলটা তর্জনী দিয়ে চেপে রেখে বাম হাতে রডটাকে টেনে নিয়ে আসে পিছনে, তারপর সুতো গুটাতে গুটাতে নামিয়ে আনে সেটা সামনের দিকে। ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে বাধ্য হচ্ছে মাছটা। ঝাপটা মেরে এদিক-ওদিক যাওয়ার যে চেষ্টা করছে না তা নয়, কিন্তু বাগে এনে ফেলেছে ওটাকে রানা। ঝাপটা দূরে সরে যাওয়ার চেষ্টা করলে হ্যান্ডেলটা ঘুরানো বন্ধ রাখে, ফ্রী-স্পূল থেকে কিছুটা সুতো বের করে নেয় মাছটা, কিন্তু আবার কাছে আসতে হয় তার পাম্পিং-এর ফলে।

বিশ মিনিট পেরিয়ে গেছে টোপ খেয়েছে মাছটা। পশ্চিম আকাশের থরে থরে সাজানো মেঘের গায়ে উজ্জ্বল লালিমার প্রলেপ। দ্রুত নেমে আসছে গাঢ় কুয়াশা আর সন্ধ্যা। কাছে এসে পড়েছে মাছটা। ডান হাতে ধরা রডটার ডগা পানি ছুঁই ছুঁই করছে। সীট ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রানা। এক পা এগিয়ে বোটের কিনারায় চলে গেছে। ডান হাতে ছিপ, বাম হাতে হাতলওয়ালা ল্যান্ডিং হুক। ক্লান্ত হয়ে পেট ভাসিয়ে দিয়েছে মাছটা। ইচ্ছে করলেই কানসার ভেতর আঙুল চালিয়ে দিয়ে তুলে আনা যায়। কিন্তু এসব ব্যাপারে অতিরিক্ত সাবধান সে। নিজের চোখে দেখেছে সে দিনাজপুরের রামসাগরের একটা ঘটনা। ত্রিশ সের ওজনের প্রকাণ্ড রুইটাকে হ্যান্ড নেটে ঢোকাতে যাচ্ছে শিকারীর হেলপার। হাঁটু-পানিতে নেমে গেছে। এই সময় ঝটকা মারল মাছটা। সুইভেলে বাঁধা সুতোটা গেল ছিঁড়ে। দুটো হুকের একটা মাছটার চোয়ালে গাঁথা, অন্যটা গেঁথে গেল হেলপারের হাতে। একটা বাঁক নিয়ে তীরবেগে ছুটল মাছ, সাথে নিয়ে চলল হেলপারকে। তিনদিন পর তার লাশ ভেসে উঠেছিল পানির উপর।

আরও একটু কাছে টেনে এনে মাছের হাঁ করা মুখের ভিতর হুকটা আটকে ফেলল রানা। ব্যস! ছিপটা একপাশে নামিয়ে রেখে দু'হাতে হাতল টেনে মাছটাকে তুলতে যাবে, এমনি সময়ে ভুরু কুঁচকে উঠল ওর। ইঞ্জিনের শব্দ!

ইঞ্জিনের শব্দটা এগিয়ে আসছে এদিকেই। দূরে আবছা দেখা গেল স্পীডবোটটাকে। কোনও মাছ-শিকারী? না কি লেক ভ্যানের বিভীষিকা সেই দস্যুদল? সোজা এগিয়ে আসছে এইদিকে।

মুহূর্তে ক্ষিপ্র হয়ে গেল রানার হাত, হুক-বিদ্ধ মাছটা ঝপাৎ করে পড়ল এসে বোটের ভেতর, ঝাপটা-ঝাপটি করল কিছুক্ষণ—তারপর এক ধাক্কা খেয়ে চলে গেল পাটাতনের নিচে। চট করে ছিপটা নামিয়ে রেখেই সোজা হয়ে দাঁড়াল রানা। হাতটা চলে গেছে পকেটে।

অনেক কাছে চলে এসেছে বোটটা, গতি কমানো হচ্ছে তার। বোটের ওপর দাঁড়ানো লাল শার্ট আর সাদা ট্রাউজার পরা মূর্তিটাকে লক্ষ্য করছে রানা। মেয়েটাও তাকিয়ে আছে ওর দিকে। গম্ভীর একটা মুখ।

রানার বোটের গায়ে যখন ঠেকল বোটটা তখনও দু'জন তাকিয়ে আছে দু'জনের দিকে, পলক পড়ছে না কারও চোখে। তারপর সচল হল স্থির মূর্তিটা, বোটম্যানকে চলে যাওয়ার ইঙ্গিত করে পা বাড়িয়ে দিল রানার বোটে, মুখ খুলল, 'তুমি দেখছি সবসময়েই

রেডি?'

পকেট থেকে হাতটা সরিয়ে নিল রানা, বিব্রত বিস্ময়ে উচ্চারণ করল, 'তুমি!'

'হ্যাঁ আমি—কোন সন্দেহ আছে?'

'আছে, অবশ্যই আছে। এখানে এই লেক ভ্যানে আমার খবর সংগ্রহ করে ভর সন্ধ্যেয় এইরকম আবির্ভাব...'

'আসতে নেই তোমার কাছে?'

'আতাসীর মত স্বামী থাকতে আমার মত বদমায়েশের কাছে কেন আসবে মার্শিয়া? নিশ্চয়ই তুমি ভূত-টূত...মানে মাছের লোভে...'

'আতাসী বিপদে পড়েছে, রানা।'

'আতাসী দেশদ্রোহী, আতাসী ইসরায়েলের গুপ্তচর—ইমপসিবৃল্। আমি বিশ্বাস করি না।'

ভাবলেশহীন মুখ মার্শিয়ার। 'তুমি বিশ্বাস না করতে পারো, কিন্তু নাবাতিয়া ফাইটার স্টেশনের সবাই এ-কথা বিশ্বাস করে—তাদের কাছে তথ্য প্রমাণ আছে।'

'প্রমাণ?'

'হ্যাঁ, সামরিক আদালতে বিচার হবে আতাসীর। যে অপরাধ সে করেছে তাতে শাস্তি তার একটাই—প্রাণদণ্ড।'

'প্রাণদণ্ড? অসম্ভব!'

'সাতদিন আগে অ্যারেস্ট হয়েছে আতাসী, বিচার শুরু হতে আর পনেরো দিন বাকি...তাই ছুটে এসেছি আমি তোমার কাছে।'

একটা কাঁপুনি অনুভব করল রানা। মনে পড়ে গেল মাউন্ট কানানের টাগার্ট ফোর্ট থেকে মেজর জেনারেল রাহাত খানকে উদ্ধার করার অ্যাসাইনমেন্টে ওর সাথে লেফটেন্যান্ট আতাসীও ছিল। সেবারই সাফেদের একটা নাইট-ক্লাবে মার্শিয়াকে প্রথম দেখে আতাসী। রানার চোখের সামনে ভেসে উঠল একটা দৃশ্যঃ টাগার্ট ফোর্টের উপর দিয়ে চলেছে কেবল-কার। লাফ দিয়ে পড়ল ওরা দু'জন, পড়ল ছাদের কিনারায়। হাত, পা এবং সর্বাঙ্গ দিয়ে খামচে ধরতে চাইল রানা ছাতটা। ধরার কিছুই নেই। বুক চেপে রাখল ছাদে। কিন্তু পিছনে নেমে যেতে চাইছে শরীর। একটু সরে এসে ছাদের কিনারা ধরল ও। তাকাল আতাসীর দিকে। প্রাণপণে বুক চেপে রেখেছে আতাসী ছাদের সাথে। কিন্তু চোখে মুখে ভয়। নেমে যাচ্ছে আতাসী, পড়ে যাচ্ছে ছাদ থেকে। শক্ত করে আঁকড়ে ধরল রানা ছাদের প্রান্ত। পা এগিয়ে দিল আতাসীর দিকে। ডান হাতে পা-টা ধরে ফেলল আতাসী। বেঁচে গেল সে।

তারপর অপারেশন ইউরেকা সেভেন, তাতেও ছিল আতাসী এবং মার্শিয়া। ওদের বিয়ের অনুষ্ঠান তখনও শেষ হয়নি, এমন সময় এল কর্তব্যের ডাক। হাসিমুখে বর-বেশী আতাসী নব-বধূ মার্শিয়ার হাত ধরে রওনা হয়ে গেল। সেই মার্শিয়ার আজ সাহায্য দরকার।

একের পর এক চোখের সামনে ভেসে উঠল আরও অনেক দৃশ্য। প্রতিটি ঘটনাই সাক্ষ্য দিচ্ছে, আতাসীর মত হৃদয়বান দেশপ্রেমিক হয় না। তার পক্ষে দেশদ্রোহী হওয়া অসম্ভব।

মনে মনে প্রস্তুত হয়ে গেল রানা। বুঝতে পেরেছে, কোন ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছে আতাসী, কোন চক্রান্তে পড়ে একদম অসহায় অবস্থায় ফেঁসে গেছে সে। কোন দাবি নয়—খবরটা জানাতে এসেছে মার্শিয়া রানাকে।

'কিন্তু মার্শিয়া, নিজের চেষ্টায় আমার খোঁজ যখন পেয়েছ তখন নিশ্চয়ই জানো আমি এখন আর বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সে নেই—'

'মিথ্যে কথা,' মার্শিয়া বলল, 'তুমি এখন ছুটিতে...'

তিক্ত হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে, 'অর্থাৎ সব কিছুই তুমি জানো না। কিন্তু সে-কথা থাক...আমি ভাবছি...'

পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে রানা। হাতে সময় মাত্র পনেরো দিন...

'কি ভাবছ?'

'ভাবছি...বড় বেশি অন্ধকার। একটু আলো দরকার...'

মার্শিয়ার দিকে তাকাল রানা, ওর দিকেই চেয়ে আছে ও—বাষ্পাচ্ছন্ন চোখ দু'টি এখন তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে আগ্রহে, সায়াহ্নের আবছা আলোয় চকচক করছে, যেন বিকীরণ করছে অন্যরকম এক জ্যোতি। অস্ফুটে উচ্চারণ করল সে, 'তুমি—'

'আতাসী কোন চক্রান্তের শিকার হয়েছে, মার্শিয়া—'

'তাই। কিন্তু একেবারে অসহায় অবস্থায়। অকাট্য সব প্রমাণ রয়েছে ওর বিরুদ্ধে—'

'কি সেই প্রমাণ?'

'সেসব জানতে হলে যেতে হবে লেবাননের এয়ার ফাইটার স্টেশন নাবাতিয়ায়, ওখানে না গেলে পরিষ্কার কিছুই বোঝা যাবে না। আমার কাছে কোন তথ্য নেই, পুরো ব্যাপারটাই অস্পষ্ট।'

'নাবাতিয়া পৌঁছতে পৌঁছতে চলে যাবে আরও একটা দিন!' বিষণ্ন হয়ে যায় রানা. ধৈর্য ধরে রাখতে পারছে না ও।

'কিন্তু নাবাতিয়া একটা সামরিক ঘাঁটি, ওখানে কিভাবে কি পরিচয়ে যাবে তু'

কি যেন ভাবছে রানা।

আবার জিজ্ঞেস করে মার্শিয়া, 'কারও কথা মনে পড়ছে? খুব সম্ভব তিনি এখন বৈরুতে।'

মার্শিয়ার চোখে চোখ রাখে রানা, বুঝতে পারেঃ যাঁর কথা ভাবছে ও তাঁর সম্পর্কেই প্রশ্ন রেখেছে মার্শিয়া। তিনি আলফাতাহ সিক্রেট অপারেশনের চীফ, জেনারেল সালেহ দীন আরাবী। কিছু বলতে হল না, মার্শিয়া জানিয়ে দিল—জেনারেল আরাবী এখন বৈরুতে।

বোটের ইঞ্জিন স্টার্ট দিতে এগোল রানা। লক্ষ্য করে মার্শিয়া বলল, 'তিরিশটা

মাছ নিশ্চয়ই তুমি এখনও ধরতে পারোনি?'

'না। বাকি আছে দুটো।'

'তাহলে এখনই যে রওনা হচ্ছ?'

'জীবনে সব বাজিতেই জিততে নেই মার্শিয়া, কোন কোন বাজিতে আমি জিততে চাই...'

উত্তরে মার্শিয়া কি বলল ইঞ্জিনের শব্দে তা আর শোনা হল না রানার। পানি কেটে তীরবেগে তখন ছুটতে শুরু করেছে বোটটা।

চার

গ্রাউন্ড ডিফেন্স অফিসার মেজর হাসান তার পুরো ডিটাচমেন্টই নিয়ে এল। গার্ডরা ধ্বংসস্তূপের কাছ থেকে একশো গজ দূরে সরিয়ে দিল দর্শকদের ভিড়টাকে। আগুন নিভিয়ে ফেলার অবশ্য কোন উদ্যোগ নেয়া হল না। কর্তৃপক্ষের সন্দেহ, ওখানে অবিস্ফোরিত বোমা থাকতেও পারে দু'একটা। যে রাস্তাটা বৃত্ত রচনা করে ঘিরে রেখেছে ল্যান্ডিং ফিল্ডটাকে সেটার কিনারায় সরে গেল রানা আর সব গানারদের সাথে।

সায়েদ সাবরীর মুখে হাসি আর ধরে না। উইং কমান্ডার তারেক হামেদী ডিটাচমেন্টের সাফল্যে খুশি হয়ে পিঠ চাপড়ে দিয়েছে তার। উইং কমান্ডারের হাতে রঙ থাকলে, রানা ভাবল, সায়েদ সাবরী তার শার্টটা খুলে রেখে দিত স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে। তারেক হামেদীর মত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন অফিসারের আদর কেউ কল্পনাও করতে পারে না।

গওহর জুমলাত বলল, 'কিন্তু মাত্র একটা বোমারু-ফাইটার নামিয়ে আমি সন্তুষ্ট নই। তাছাড়া, গোটা ঝাঁকটা যদি নেমে আসত, কি পরিমাণ ক্ষতি করতে পারত ভেবে দেখো একবার।'

'সেক্ষেত্রে অন্তত গোটা দশেক নামাতেও পারতাম আমরা!' সায়েদ সাবরী বলল।

ওদের কথাবার্তা আর কানে ঢুকছে না রানার। ইসরায়েলি পাইলটটার কথা ভাবছে ও। সত্যি লোকটা কিছু জানে? নাকি ভয় দেখাবার চেষ্টা করছিল? তার জায়গায় নিজেকে কল্পনা করার চেষ্টা করল রানা। তার মত ট্রেনিং এবং ব্যাকগ্রাউন্ড থাকলে ও কি ওরকম আচরণ করত?

প্লেনটা হারিয়ে মেজাজ বিগড়ে গিয়েছিল পাইলটের, সন্দেহ নেই। শিকারী পাখির মত ডানাওয়ালা উড়ন্ত একটা সুন্দর এবং প্রিয় জিনিসকে একদল লোক পলকের মধ্যে পরিণত করেছে ধ্বংসস্তূপে, লোকগুলোর উপর সীমাহীন ক্রোধ তো হওয়ারই কথা! পাল্টা আঘাত করতে হলে ভয় দেখানো ছাড়া আর কিই বা ছিল পাইলটের? কিন্তু, ঘৃণা বা রাগ যতই হোক, তাই বলে এমন গোপনীয় অথচ নির্দিষ্ট তথ্য কিভাবে সে প্রকাশ করল? লেবাননের সব ফাইটার স্টেশন দখল করে নেয়া হবে। শুধুই কি বড়াই দেখাবার জন্যে কথাটা বলে ফেলেছে সে? তাও কি সম্ভব?

সাধারণ একজন পাইলটের পক্ষে এ ধরনের তথ্য জানা সম্ভব বলেও মনে হয় না। ওরকম কোন প্ল্যান যদি ইসরায়েলের থেকেও থাকে, তা শুধু জানবে ওদের এয়ারফোর্সের উচ্চপদস্থ মুষ্টিমেয় কয়েকজন অফিসার। তবে, প্ল্যানটার কথা গুজবের আকারে ছড়াতেও পারে। অথবা, এর কোন ভিত্তিই হয়ত নেই, গোটা ব্যাপারটাই লোকটার কল্পনা মাত্র। এমনিতেই সবাই জানে ওই দেশটাকে যুদ্ধে হারাতে হলে এদের বিমানবিধ্বংসী ঘাঁটিগুলো সম্পূর্ণ অচল করে দিতে হবে, এই ধারণা থেকে সাধারণ একজন পাইলট যদি ভেবে থাকে ওদের হাই কমান্ড এ ব্যাপারে একটা প্ল্যান তৈরি করেছে তাহলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

কল্পনা? তাই কি? আপন মনেই মাথা নাড়ল রানা। না, তা মনে হয় না ওর। লোকটার চোখেমুখে যে দৃঢ়তার, যে নিশ্চয়তার ছাপ ও দেখেছে তা ভোলবার নয়। নিছক কল্পনা থেকে বললে অত জোর দিয়ে অমন চ্যালেঞ্জের ভঙ্গিতে বলতে পারত না।

গোটা ব্যাপারটা খুব জটিল, অনুভব করল রানা।

শুক্রবারে আক্রমণ করা হবে নাবাতিয়াকে, লোকটার এ-কথা অবশ্য ফেলে দেয়ার মত নয়। নির্দিষ্ট টার্গেটে কবে আক্রমণ করতে যাওয়া হবে এ তথ্য যে কোন পাইলট সহজেই জেনে নিতে পারে। শুক্রবার এলে হয়ত দেখা যাবে, কথাটা তার মিথ্যে নয়। সেক্ষেত্রে তার দ্বিতীয় কথাটারও গুরুত্ব বেড়ে যাবে। প্রথম কথাটা যখন ফলছে, তখন দ্বিতীয় কথাটাও ফলবে, এইরকম ভাবা স্বাভাবিক। এই ভাবনায় ওদেরকে জর্জরিত করার জন্যই কি ভিত্তিহীন কথাটা বলেছে সে?

মাথা থেকে ভাবনাটা সরাতে পারছে না রানা, জামাল আরসালানকে দেখামাত্র পাইলটটা কেন অমন হঠাৎ করে বোবা হয়ে গেল? সি.ও-কে দেখে যদি চুপ করে যেত, ব্যাপারটাকে এত গুরুত্ব দিয়ে ভাবত না ও। কিন্তু জামাল আরসালানকে দেখে! একজন সিভিলিয়ানকে দেখে! লাইব্রেরিয়ানকে যেন চেনে পাইলট, প্রতিক্রিয়াটা লক্ষ্য করে তখন তাই মনে হয়েছিল ওর। চেনে? কিন্তু তা কিভাবে সম্ভব?

হার মানল রানা। সমস্যাটার কোন সমাধানই বের করতে পারছে না ও। একবার মনে হচ্ছে রাগের মাথায় যা মুখে এসেছে বলে ফেলেছে লোকটা। কিন্তু বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মনে হচ্ছে, না, রাগের মাথায় কোন মানুষ অমন দৃঢ়তার সাথে নির্দিষ্ট তথ্য প্রকাশ করতে পারে না।

ধীর পায়ে সায়েদ সাবরী আর ইয়াসির ফারুকীর দিকে এগোতে শুরু করল রানা। ইউনিট কমান্ডার এইমাত্র এসে পৌঁছেচে। কাছে গিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল ও। মিনিট খানেক পর ইয়াসির ফারুকী একজন অফিসারের সাথে কথা বলার জন্যে পা বাড়াতেই সায়েদ সাবরী রানার দিকে ঘাড় ফেরাল। 'এই যে, রানা! প্রথম প্লেনের জন্যে খুব বেশি অপেক্ষায় থাকতে হয়নি তোমাকে, কি বলো? শোনো, কথা আছে তোমার সাথে। দাঁড়াও, মনে করি। ওহো, পেয়েছি! পাইলটের সাথে ইংরেজিতে কথা বলছ তুমি, তাই না, কি বলছিল ব্যাটা?'

'সে কথাটাই তো বলতে এলাম,' বলল রানা। পাইলটের বক্তব্য সংক্ষেপে ব্যাখ্যা

করল ও।

'মি. ফারুকীকে সব কথা জানানো উচিত তোমার,' হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছল সায়েদ সাবরী। 'ব্যাপারটা হয়ত ঘোড়ার ডিম কিছুই না—তোমার কথা ঠিক, হয়ত ব্যাটা ভয় দেখাবার জন্যেই এসব বলেছে।' ইয়াসির ফারুকীকে ঘিরে অফিসারদের ভিড়টার দিকে তাকাল সে। 'কাছাকাছি থাকো, কেমন, বাঁটকুল একটু অবসর পেলেই তোমাকে ডাকব আমি···।' ইয়াসির ফারুকী সাড়ে পাঁচ ফুটের মত লম্বা। সায়েদ তাকে এক এক সময় এক এক নামে ডাকে। খুদে হিটলার বলে দৈর্ঘ্য আর গোঁপের জন্যে। আধুনিক সেক্সপীয়ার বলে, কবিতা লেখার বাতিক আছে, তাই। টাইম বোমা বলে, কারণ স্ত্রীর চিঠি এলেই মেজাজ সপ্তমে উঠে যায় ফারুকীর।

'দুত্তোরী ছাই, মি. মরুদ্যান চলেই যাচ্ছে যে! এসো, এসো···।' রাস্তার কিনারা ধরে সায়েদ সাবরীর পিছু নিল রানা। ইয়াসির ফারুকী সার্চ অফিসারের গাড়িতে উঠতে যাবে, ওরা তার পিছনে গিয়ে দাঁড়াল।

'এক মিনিট, স্যার,' সায়েদ সাবরী ঢোক গিলে গলাটা ভিজিয়ে নিল, 'ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার আপনাকে জানাতে চায় রানা।'

গাড়ির ভিতর থেকে ডান পা-টা বের করে নিল ইয়াসীর ফারুকী। 'হুঁ। কি?' তারপর ঘুড়ে দাঁড়াল সে। ঘন ভুরুর ভিতর জ্বলজ্বলে দুটো চোখ। তিন সেকেন্ড ধরে সায়েদ সাবরীকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে বিদ্ধ করল সে, তারপর তাকাল রানার দিকে। অদ্ভুত একটা শিহরণ অনুভব করল রানা, যেন দৃষ্টি দিয়ে ওর শরীর স্পর্শ করছে লোকটা। লোকটার বদমেজাজের অন্যতম কারণ, রানা অনুমান করল, তার কুৎসিত কালো মুখটা। তার ধারণা, এই কদর্য চেহারার জন্যেই সবাই তাকে নিয়ে হাসাহাসি করে। তাই প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে যাকে সামনে পায় তার উপরই ঝাল ঝাড়তে শুরু করে। নিজের চারপাশে দুর্লঙ্ঘ্য একটা উত্তপ্ত মেজাজের প্রাচীর খাড়া করে রেখেছে সে।

চোখে চোখ রেখে কথা বলছে রানা। পাইলটের সাথে ওর কি কি কথাবার্তা হয়েছে জানাবার পর ওর নিজের ধারণা সম্পর্কে বলতে শুরু করতেই ইয়াসির ফারুকী বাধা দিল। 'চুপ। আমাকে বোঝাতে হবে না। যথাস্থানে তুলব আমি কথাটা।' সায়েদ সাবরীর দিকে তাকাবার আর প্রয়োজন বোধ করল না। 'গুড-নাইট, সার্জেন্ট-মেজর,' বলে গাড়িতে চড়ল। স্টার্ট দেয়া ছিল, হুস করে বেরিয়ে গেল সামনে থেকে গাড়িটা।

দ্রুত ছোট হয়ে যাচ্ছে গাড়ির পিছনের লাল আলো দুটো। সেদিকে তাকিয়ে রানা ভাবল, শোনার পর যারা কথাটার গুরুত্ব পরিমাপ করতে পারবে তাদের কানে কথাটা তোলার দায়িত্ব ওর কাঁধেই রয়ে গেল। যথাস্থানে বলতে ইউনিট কমান্ডার ইয়াসির ফারুকী সি.ও. নাবাতিয়া অথবা স্টেশনের সংশ্লিষ্ট ইন্টেলিজেন্স অফিসারকে বোঝাতে চাইল। যথাসময়ে পৌঁছুবে একটা রিপোর্ট এয়ার মিনিস্ট্রিতে, কিন্তু আর পাঁচটা সাধারণ রিপোর্টের সাথে এটাও যাবে, উচ্চপস্থ অফিসারদের কাছে এটা বিশেষ গুরুত্ববহ একটা রিপোর্ট হিসেবে দাখিল করা হবে না। অথচ, এই উচ্চপদস্থ অফিসারদেরই তথ্যটার গুরুত্ব পরিমাপ করার কথা। এয়ার মিনিস্ট্রির প্রেস সেকশনের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টরকে

চেনে ও, একটা চিঠি লিখে সব কথা তাকে জানালে কেমন হয়?

রানার কথা শুনে আঁতকে উঠল সায়েদ সাবরী। 'পাগল হয়েছ তুমি, রানা? খবরদার, অমন কাজও করো না! কি আশ্চর্য, এমন যেচে পড়ে কেউ ঝামেলায় পড়তে চায় নাকি! তুমি এখন আর্মিতে রয়েছ, রানা, এবং আর্মিতে থাকতে হলে নিয়মকানুনের বাইরে একচুলও নড়াচড়া চলবে না। যে-কোন রিপোর্ট তোমার অফিসারের মাধ্যমে ব্রিগেডে গিয়ে পৌঁছুবে। ব্যাটারি এবং রেজিমেন্ট হয়ে।'

'আপনার কথাই ঠিক, স্যার। কিন্তু লোকটার কথা যদি সত্যি হয়ে থাকে তাহলে এর গুরুত্ব কতখানি…।'

'গুরুত্ব যদি থাকে, সন্দেহ নেই ইন্টেলিজেন্স তা জানতে পারবে। তা সে যাই হোক, কিছু যদি ঘটেও, তার জন্যে তোমাকে কেউ গাফলতির দায়ে দায়ী করতে আসবে না।'

মেনে নিতে পারল না রানা কথাটা। কেউ দায়ী করুক চাই না করুক, দায়িত্বটা অনুভব করছে ও। এবং দায়িত্ব পালন করতে বিস্তর বাধা দেখতে পেলেও হাল ছেড়ে দিতে রাজি হল না। অবশ্য সায়েদ সাবরীকে ওর এই সিদ্ধান্তের কথা জানাল না ও।

পাইলট জেনে বলেছে না বানিয়ে বলেছে! ঘুমুতে গিয়েও সেই একই চিন্তা ঘুরপাক খেতে লাগল ওর মাথায়। মার্শিয়ার কথাও মনে পড়ল ওর। এখানে আসার পর কোন যোগাযোগ করা যায়নি তার সাথে। এদিকে আতাসীর ব্যাপারে কিছুই অগ্রসর হতে পারেনি রানা। ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে, নিজেও জানে না ও। চারটের সময় যেতে হবে আবার গানপিটে। ঘুম ভাঙতে রানা আবিষ্কার করল, সেই প্রশ্নটাই মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে আবার।

অত্যন্ত পরিশ্রান্ত ডিটাচমেন্ট। গতরাতের ঘটনাগুলো স্বপ্নের মত লাগছে ওর। অ্যারোড্রামের উত্তর প্রান্তে নিস্তেজ অগ্নিকুণ্ডটাকে ওদের সাফল্যের স্মৃতিস্তম্ভ বলে মনে হল। সাতটার সময় নিষ্কৃতি মিলল ওদের, ব্রেকফাস্টের জন্যে মেসের দিকে না গিয়ে প্রায় সবাই সোজা ফিরে গেল বিছানায়। বিছানায় লম্বা হওয়ার পর আর কিছু মনে নেই রানার। ঘুম ভাঙল ওদের ডিসপারসাল পয়েন্টে ইঞ্জিনের গর্জনে। চোখ মেলার আগেই অনুভব করল রানা প্রচণ্ড শব্দে থর থর করে কাঁপছে পিঠের নিচে বিছানাটা।

কে যেন বলল, 'আরও এক ঝাঁক আসছে বোধহয়!'

চোখ মেলতে ইচ্ছে করছে না রানার। পাশ ফিরে শুতে যাবে, এই সময় লাউডস্পীকার ঘরঘর করে উঠল। 'অ্যাটেনশন, প্লীজ! অ্যাটেনশন, প্লীজ! টাইগার স্কোয়াড্রন স্ক্র্যাম্বল! টাইগার স্কোয়াড্রন স্ক্র্যাম্বল! স্ক্র্যাম্বল! স্ক্র্যাম্বল! অফ!'

'এসো হে, হামাগুড়ি দিই!' কাফাকে বলতে শুনল রানা। উঠে বসার সময় মচমচ করে উঠল তার বিছানা।

স্নায়ুগুলো পুরো জেগে উঠেছে। কিন্তু বিছানা ছাড়তে ইচ্ছে করছে না রানার। ঘুম চারদিক থেকে চেপে বসছে শরীরে। ডিসপারসাল পয়েন্ট থেকে সগর্জনে রানওয়ের দিকে যাচ্ছে প্লেনগুলো। দেখতে দেখতে এগিয়ে এল ছুটন্ত চাকার শব্দ। দু'ফাঁক হয়ে

গেল মাঝখান থেকে দরজার কপাট দুটো, দু'ধারে বাড়ি খেল সজোরে। সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল চিৎকার, 'টেক পোস্ট!'

আপনা থেকেই নড়ে উঠল রানার হাত-পা। হাতড়ে পোশাক খুঁজছে ও, চোখ দুটো তখনও বোঁজা। 'প্লটটা কি হে?' জানতে চাইল কেউ।

'দক্ষিণ-পুবে বিশটা শত্রু, পঁচিশ হাজার ফুট ওপর দিয়ে উত্তর-পশ্চিম দিকে যাচ্ছে,' উত্তরে বলল কেউ।

বিছানার নিচ থেকে ক্যানভাস শু জোড়া তোলার জন্যে হাত বাড়িয়ে দিয়ে চোখ মেলল রানা। দেয়ালে সাঁটা কালো রঙের কাগজের ফাঁক-ফোকর দিয়ে হলুদ সোনার মত রোদ ঢুকছে। বাইরে বেরিয়ে নির্মেঘ নীল আকাশ দেখল ও। থমকে থেমে আছে বাতাস, গরম হতে শুরু করেছে পরিবেশটা। পিটে পৌঁছুল রানা। শেষ ফাইটারের চাকাগুলো রানওয়ে থেকে তখন শূন্যে উঠছে। লিডিং ফাইটার তিনটে তখন দূর-আকাশে আবছা মত দেখা যাচ্ছে, নাক উঁচু করে উঠে যাচ্ছে দক্ষিণ-পুব দিকে খাড়াভাবে।

'অ্যাটেনশন, প্লীজ! অ্যাটেনশন, প্লীজ! প্রিলিমিনারি এয়ার রেইড ওয়ার্নিং! প্রিলিমিনারি এয়ার রেইড ওয়ার্নিং!'

'তোমার কি মনে হয়, একটু যেন বাড়াবাড়ি, না?' বলল জাফরী, 'মানে, আমি বলতে চাইছি, এমন সকাল সকাল এ ধরনের হাঙ্গামা...।'

এতবার শোনার পরও মেয়েমানুষের গলা মনে করে চমকে উঠল রানা। 'দুপুরের খাবার সময় হলেই সাধারণত আসে ওরা,' বলল সায়ানী, 'গতকাল একটুর জন্যে সকালের নাস্তাটা কপালে জোটেনি। কিন্তু বিকেলের চায়ের সময় ঠিকই পৌঁছে গিয়েছিল।'

'চালাকিটা ধরতে পারছ?' বলল গওহর জুমলাত। 'স্নায়ু ধ্বংস করতে চায় ওরা আমাদের।'

'ওদিকে ওটা কি বলো তো?' কাফার বাড়ানো হাতের আঙ্গুল পুব-আকাশের দিকে কিছু একটা দেখাতে চাইছে। রোদ লেগে চিকচিক করে উঠল একটা প্লেনের ডানা। চোখে গ্লাস তুলল গওহর জুমলাত।

শত্রু নয়, ওদেরই মিগ সেভেনটিন স্কোয়াড্রন চক্কর মারছে। শত্রুর কোন চিহ্ন দেখছে না কোথাও ওরা। অপারেশন কন্ট্রোলরুম থেকে জানিয়ে দেয়া হল রেইড ছড়িয়ে পড়েছে নানান দিকে। লাউডস্পীকার থেকে ঘোষণা হল অল ক্লিয়ার। কিন্তু স্ট্যান্ড ডাউনের অনুমতি মিলল আরও খানিক পরে। যখন অনুমতি এল তখন ন'টার উপর বাজে, ওদের ডিটাচমেন্টের ডিউটি শুরু হয়ে গেছে।

দু'ঘন্টা শিফটে ডিউটি দিচ্ছে ওরা, ব্যতিক্রম শুধু ফার্স্ট পিরিয়ডটা। সেটা তিন ঘন্টার শিফট। এই নিয়মের কারণ, আকস্মিক হামলার সময় যেন কেউ অসতর্ক না থাকে। সাইটে মোট বারোজন লোক, সকলেরই ছুটি বাতিল করে দেয়া হয়েছে। মাত্র ছয়জন থাকে প্রতি ডিটাচমেন্টে। সংখ্যা হিসেবে নিতান্তই অপ্রতুল। দিনের বেলা 'টেক

পোস্ট' ঘোষণার সাথে সাথে অফ-ডিউটির লোকেদের ছুটে আসতে হয় গানপিটে। কিন্তু রাতে শুধু অ্যালার্ম বাজলেই হয়, আসতেই হবে সবাইকে। রানা যখন থেকে সাইটে আছে, প্রায় প্রতি রাতেই একাধিকবার অ্যালার্ম বাজছে। তবে নতুন নিয়মে প্রিলিমিনারি এয়ার রেইড ওয়ার্নিং না দেয়া হলে বা ডিটাচমেন্ট কমান্ডার জরুরী বলে মনে না করলে অফ-ডিউটির লোকদের গানপিটে আসতে হবে না।

নাস্তা খেতে চলে গেল দ্বিতীয় ডিটাচমেন্ট। কারও ভাগ্যে আজ সকালে কিছু নেই, তাই এদের কেউ কেউ পকেট থেকে চকলেট বের করে চুষতে শুরু করল। রানা খিদেই অনুভব করছে না। সাইটে আসার পর থেকে গতরাতেই প্রথম একটানা অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছে ও, সাড়ে তিন ঘণ্টা। ঘুমটা যেন ওকে আরও ক্লান্ত করে তুলেছে। ক্লান্তির আরও একটা কারণ ঘুম থেকে জাগার পর থেকে পাইলটের সাথে কথাবার্তাগুলো খুঁটিয়ে স্মরণ করছে বারবার, বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করছে অন্তর্নিহিত অর্থটা।

চারদিকে ঝাঁঝালো কড়া রোদ। বাস্তবের ছোঁয়ায় যেন গতরাতের ঘটনাগুলো অনেকটা তাৎপর্য হারিয়ে ফেলেছে। তবু, সকলের উদ্দেশ্যে সায়েদ সাবরী যে কথাগুলো বলেছিল, হঠাৎ সব মনে পড়ে গেল ওর। স্টেশনের গ্রাউন্ড ডিফেন্সের প্ল্যান হস্তগত করার সঙ্গে কি লেবাননের সবক'টা ফাইটার অ্যারোড্রোমকে অচল করে দেয়ার ইসরায়েলি ইচ্ছার কোন সম্পর্ক আছে? গোটা ব্যাপারটাই কেমন যেন অতিনাটকীয় বলে মনে হতে লাগল ওর। তবে যুদ্ধ মাত্রই কি অতি-নাটকীয়তা নয়?'

কিন্তু এখানে আমি যুদ্ধ করতে আসিনি, ভাবল রানা, এসেছি আতাসীকে উদ্ধার করতে। আতাসীর কথা মনে পড়তে হঠাৎ অসহায় বোধ করল রানা। অনেক ভেবেও আন্ডার গ্রাউন্ড সেলে বন্দী আতাসীর সাথে দেখা করার কোন উপায় বের করতে পারেনি ও।

ঝনঝন শব্দে বেজে উঠল ফোন। উত্তর দিল গওহর জুমলাত। রিসিভার নামিয়ে রাখতে রাখতে রানার দিকে ফিরল সে। 'অফিসরুমে রিপোর্ট করতে হবে তোমাকে, ইমিডিয়েটলি। মি. ফারুকীর জরুরী তলব।'

ল্যান্ডিং ফিল্ডের দক্ষিণ প্রান্তের বিরাট জায়গা জুড়ে স্টেশন হেডকোয়ার্টার, ট্রুপ হেডকোয়ার্টার তারই একটা অংশ। অফিস ক্লার্ক আলী কায়সারকে জিজ্ঞেস করল রানা, কিন্তু ইয়াসির ফারুকী কেন ডেকেছেন তা সে বলতে পারল না। তবে ওকে ডাকার জন্যে ফোন করার আগে L.A.F-এর একজন অফিসারকে তাঁর অফিস থেকে বেরিয়ে যেতে দেখেছে সে।

একটা দরজা খুলে আলী কায়সার রানার উপস্থিতি ঘোষণা করল। ভিতরে ঢুকে ফারুকীর ডেস্ক পর্যন্ত হেঁটে গেল রানা, স্যালুট করল, তারপর দাঁড়িয়ে রইল অ্যাটেনশন হয়ে। অফিসরুমটা একদিকে যেমন বিশৃঙ্খলতার এক শ্রেষ্ঠ নমুনা, অন্যদিকে শৃঙ্খলতারও আদর্শ তা। প্রতিটি জানালার কার্নিসে গ্যাস ইকুইপমেন্টের বাক্স, ব্যাটল ড্রেস, স্টীল হেলমেট, গামবুট ইত্যাদি হরেক রকম জিনিস। দরজার মুখোমুখি সার্জেন্ট-মেজরের ডেস্ক, তাতে গাদা হয়ে পড়ে আছে বিচিত্র সব সাইজের ফাইল, নোটবুক,

পাস বুক। ডেস্কটার পাশেই একটা মান্ধাতা আমলের কেস। সবুজ ডিসটেম্পার করা দেয়ালের চটা উঠে যাওয়ায় লাল সুরকি বেরিয়ে পড়েছে।

ইয়াসির ফারুকীর ডেস্কটা পুব কোণে। গোটা রুমটার দেয়াল একমাত্র এই ডেস্কের পিছনেই অক্ষত। ফাইল, ফাইল বক্স, ক্যালকুলেটর, ইন্টারকম, এই ধরনের অসংখ্য জিনিস অত্যন্ত নিপুণভাবে সাজানো। পাশেই একটা বুক কেস, সেটার মাথায় একটা ঘড়ি আর পালিশ করা তিন ইঞ্চি শেলের একটা কেস।

স্যালুট করতেই মুখ তুলে তাকাল ইয়াসির ফারুকী। কোঁচকানো ভুরুটা রানাকে দেখেই নিভাঁজ হয়ে গেল। 'এই যে, রানা;' বলে চেয়ারের পিঠে হেলান দিল, মুখ থেকে নামাল পাইপটা, 'পাইলটকে জেরা করা হয়েছে, কোন কথাই অস্বীকার করেনি সে। কিন্তু প্ল্যানটার ধরন সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তরে কিছুই বলতে পারেনি। প্ল্যান একটা আছেই—এতটা জোর দিয়েও কথাটা বলছে না। এ রকম একটা প্ল্যান না থেকেই পারে না, অনেকটা এই ভঙ্গিতে কথাটা বলছে সে বারবার।'

লাইটার জ্বেলে পাইপটা ধরাল ইয়াসির ফারুকী। 'প্ল্যানটা সত্যি কিনা সে সম্পর্কে আমাদের ইন্টেলিজেন্সের অফিসার, যিনি তাকে জেরা করছেন, সঠিক কিছু বুঝতে পারছেন না বলে আমাকে জানিয়ে গেলেন। কিন্তু, নাবাতিয়া রেইড সম্পর্কে, যতদূর মনে হচ্ছে, স্পষ্ট ভাবে কিছু না কিছু জানা আছে পাইলটের। বিষয়টাকে সে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছে বারবার। প্রশ্নের উত্তরে বলেছে, এ রকম একটা গুজব শুনেছে, বিশদ কিছুই জানা নেই তার।

আমাদের অফিসারের ধারণা, ব্যাপারটা গোপন করার চেষ্টা করছে সে। যাই হোক, শুক্রবারে সম্ভাব্য যে-কোন আক্রমণের জন্যে সবরকম সাবধানতা বিশেষভাবে গ্রহণ করা হবে বলে জানানো হয়েছে আমাকে। কর্তৃপক্ষের গোচরে তুমি ব্যাপারটা এনেছ, তাই কি হল না হল জানাবার প্রয়োজন মনে করলাম তোমাকে। ব্যাপারটা সম্পর্কে তোমার কিছু বক্তব্য আছে নাকি?'

চিন্তিত দেখাচ্ছে রানাকে। বলল, 'আমার ধারণা, স্যার, রাগের মাথায় কথাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে পাইলটের।'

'অর্থাৎ?'

'অর্থাৎ স্যার, আমাদের ফাইটার অ্যারোড্রোমগুলো ধ্বংস করার প্ল্যানটা মিথ্যে নয়। এটা যদি তার কল্পনা থেকে আসত তাহলে জেরার সময় আর এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করত না। বোঝা যায়, একটা প্ল্যানের অস্তিত্ব সত্যিই আছে। মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে, এখন সেটাকে চাপা দিতে চাইছে সে।'

'কিন্তু তোমাকে যে বলেছে সে-কথা পরে সে অস্বীকার করেনি কেন?'

'অস্বীকার করলে তার প্রতি সন্দেহ বাড়বে, তাই,' বলল রানা।

'হুঁ,' গম্ভীর হয়ে পাইপ নামাল মুখ থেকে ইয়াসির ফারুকী।

রানা বলল, 'অথচ, নাবাতিয়া রেইড সম্পর্কে এমন একটা ভাব দেখাচ্ছে সে যাতে মনে হয় সত্যি কিছু একটা ঘটবে শুক্রবারে। তার এইরকম ভাব দেখাবার পিছনে কারণ

হল...'

শিরদাঁড়া খাড়া করে ধমকের সুরে ফারুকী বলল, 'কি কারণ?'

'লোকটা ইন্টেলিজেন্স অফিসারের মনোযোগ শুক্রবারের আক্রমণের দিকে সরিয়ে আনতে চেয়েছে, স্যার। তাতে সে সফলও হয়েছে।'

'তুমি বলতে চাইছ আমাদের অফিসারকে বোকা বানিয়েছে লোকটা?'

আমার তাই বিশ্বাস, এই কথাটা ঘুরিয়ে এই ভাবে বলল রানা, 'প্ল্যানটার কথা এখন সে চাপা দিতে চাইছে এ ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ নেই, স্যার।'

পাইপটা রানার কপাল লক্ষ্য করে পিস্তলের মত ধরল ইয়াসির ফারুকী। 'একজন অফিসার সম্পর্কে আরও শ্রদ্ধার সাথে কথা বলা উচিত তোমার, রানা। সে বুঝতে ভুল করেছে আর তুমি ঠিক বুঝেছ, এরকম হতে পারে না।'

কিন্তু, রানা ভাবল, লাইব্রেরিয়ান জামাল আরসালানকে দেখে ইসরায়েলি পাইলট কি রকম চমকে উঠে ঠোঁটে কুলুপ লাগিয়েছিল তা তো আর ইন্টেলিজেন্স অফিসার দেখেনি। ছোট্ট এই ঘটনাটার তাৎপর্য কতটুকু তা পরিমাপ করতে না পারলেও গোটা সমস্যাটার সাথে এটার যে গভীর একটা সম্পর্ক আছে সে ব্যাপারে রানার মনে কোন সন্দেহ নেই। 'স্যার, আমাদের অফিসার কি এয়ার ইন্টেলিজেন্সে রিপোর্ট করবেন এ ব্যাপারে?'

'কই, কিছু তো বলল না। তবে, নাবাতিয়ার কমান্ডিং অফিসারের কাছে দৈনিক রিপোর্ট যায়, তাতে এটা থাকবে বলে মনে করি।'

'আমি মনে করি, স্যার, জরুরী খবর হিসেবে এয়ার ইন্টেলিজেন্সে ব্যাপারটা রিপোর্ট করা দরকার... ।'

গলা চড়ে গেল ফারুকীর, 'একটা জিনিস বোঝো না কেন যে তোমরা সাধারণ গানার কে কি মনে করো না করো তার বিশেষ কোন মূল্য নেই।' ঠক ঠক করে পাইপ ঠুকে অ্যাশট্রেতে ছাই ঝাড়ল সে, তারপর একটু নরম গলায় বলল, 'তুমি যদি তৈরি করে দাও, তাহলে রিপোর্টটা আমি পাঠাবার ব্যবস্থা করতে পারি ব্যাটারিতে।'

নিজের সামনে ইটের একটা পাঁচিল দেখতে পেল রানা, চাইলেও সেটা টপকে যাওয়া অসম্ভব ব্যাপার। ব্যাটারিতে রিপোর্ট পাঠানো না পাঠানো সমান কথা। তবু, ফারুকীর কাছ থেকে কাগজ চেয়ে নিয়ে সার্জেন্ট-মেজরের ডেস্কে বসে একটা রিপোর্ট তৈরি করল ও, এই আশায়, ভাগ্যক্রমে যদি অত্যন্ত বিচক্ষণ কোন অফিসারের চোখে পড়ে যায় তাহলে হয়ত বা সে এর গুরুত্বটা বুঝতে পেরে এয়ার ইন্টেলিজেন্সের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ভুল করবে না।

গানপিটে ফিরতে প্রায় সাড়ে দশটা বেজে গেল ওর।

নানারকম যন্ত্রপাতি নিয়ে ব্যস্ত এখন গওহর জুমলাত। বেঞ্চের উপর টেলিফোনের পাশে পা ঝুলিয়ে বসল রানা। মাথার ভিতর ঘুরপাক খাচ্ছে তখনও ইসরায়েলি পাইলটের ব্যাপারটা। ইন্টেলিজেন্স অফিসার উদ্বিগ্ন হওয়ার মত কিছু না দেখে থাকলে সে কেন স্বস্তি পাচ্ছে না? হয়ত উদ্বিগ্ন হওয়ার মত সত্যিই কিছু নেই এর মধ্যে। কিন্তু

জামাল আরসালানকে দেখে পাইলটের চুপ করে যাওয়ার ব্যাপারটা? কথার মাঝখানে একজন হঠাৎ থতমত খেয়ে চুপ করে গেল, চোখের সামনে পরিষ্কার ভেসে উঠল আবার দৃশ্যটা, যেন বলা উচিত নয় এমন একটা কথা বলতে গিয়ে ধরা পড়ে গেছে সে। এবং এ থেকে প্রমাণ হয়, জামাল আরসালানকে সে চেনে। সন্দেহ হয় জামাল আরসালান একজন ইসরায়েলি গুপ্তচর।

মনে পড়ে গেল রানার, আর মাত্র ছয় দিন পর কোর্ট মার্শাল হবে আতাসীর। ফাইটার স্টেশনের সকলের পরিষ্কার ধারণা, কোর্ট মার্শাল তাকে ফায়ারিঙ স্কোয়াডে পাঠাবে। তাকে ফাঁসানো হয়েছে এরকম সন্দেহ কারও মনে ভুলেও উদয় হয়নি, অনেকের সাথে কথা বলে এটুকুই জানতে পেরেছে ও। রানার নিশ্চিত বিশ্বাস, ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছে আতাসী। কার ষড়যন্ত্র? ফাইটার স্টেশন নাবাতিয়ায় কে আতাসীর শত্রু হতে পারে? ফালাঞ্জিস্টরা এখানে নেই বললেই চলে। তাহলে জামাল আরসালানই কি সেই শত্রু? সে কি সত্যি ইসরায়েলের হয়ে কাজ করছে এখানে?

এমন হতে পারে, রানা ভাবল, আতাসী হয়ত জামাল আরসালানকে ইসরায়েলি গুপ্তচর হিসেবে সন্দেহ করেছিল বা চিনতে পেরেছিল। আতাসী কোথাও কোন ভুল করায় জামাল আরসালান তা জেনে ফেলে। সাহায্যকারী লোক তার সাথে আরও থাকতে পারে এখানে। তাদের সাহায্যে ষড়যন্ত্র করে আতাসীকে ফাঁসানো কঠিন কোন ব্যাপার নয়।

কিন্তু এসবই অনুমান মাত্র। প্রকৃত ঘটনা কি তা জানতে হবে, না জেনে করার কিছুই নেই ওর। এদিকে দিন একটা একটা করে কমছে, দ্রুত এগিয়ে আসছে আতাসীর জীবনের শেষ মুহূর্তটি। অথচ তার জন্যে কিছুই করতে পারছে না রানা।

বম্বারডিয়ার সাইয়িদ হাকামের ডিটাচমেন্ট আসতে এগারোটার সময় গানপিট থেকে বেরুল ওরা। জাফরীর জন্যে অপেক্ষা করছিল রানা, সে বেরিয়ে আসতেই তাকে ধরল ও। 'অনেকদিন থেকে এখানে আছ তুমি, জাফরী,' বলল রানা, 'লাইব্রেরিয়ান জামাল আরসালানকে খুব ভাল করে চেনে আমাদের মধ্যে তেমন লোক কে বলতে পারো?'

দ্রুত দৃষ্টি বুলিয়ে রানার মুখে কি যেন খুঁজল জুনায়েদ জাফরী। কিন্তু লাইব্রেরিয়ান সম্পর্কে রানার কৌতূহল কি কারণে তা সে জানতে চাইল না। 'অ্যাসিস্ট্যান্ট লাইব্রেরিয়ান বারেক বাওয়ানীর সাথে পরিচয় হয়েছিল একবার, বই বেছে নেয়ার ব্যাপারে খুব সাহায্য করত আমাকে। সম্ভবত ওর কাছ থেকে জামাল আরসালান সম্পর্কে সব কথা জানতে পারবে তুমি।'

'ওর সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে পারো আমার?'

'কেন পারব না? যে-কোনদিন যেয়ো না আমার সাথে।'

'এখন?'

'এখন!' আবার তীক্ষ্ণ চোখে রানার মুখে কিছু খুঁজল জাফরী। তার ঠোঁট ফাঁক হচ্ছে দেখে রানা অনুভব করল, ব্যাপার কি জানার জন্যে প্রশ্ন করতে যাচ্ছে জাফরী।

কিন্তু ঠোঁট মুড়ে ফেলল সে। এক সেকেন্ড ইতস্তত করার পর বলল; 'ঠিক আছে, চলো।'

পা বাড়াল ওরা।

'আমার একটা কথা রাখতে হবে তোমাকে, জাফরী,' বলল রানা, 'এ ব্যাপারটা নিয়ে আর কারও সাথে তুমি আলাপ করো না। পরে আমি তোমাকে ব্যাখ্যা করে সব বলব এক সময়।'

'বুঝলাম,' জাফরী বলল, 'কিন্তু, রানা, স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করার কোন শখ গজিয়ে উঠে থাকলে গলা টিপে খুন করো সেটাকে। কি করতে গিয়ে কি করে বসবে, শেষ পর্যন্ত এমন বিপদে জড়িয়ে পড়বে যে ছাড়াতে গেলে আরও কঠিন প্যাঁচে আটকা পড়বে। খুব সাবধান, রানা।'

'ঠিক কি বলতে চাইছ বুঝতে পারছি না,' বলল রানা। 'ওরকম বিপদে জড়িয়ে পড়েছিল এমন কারও কথা জানো নাকি?' প্রশ্নটা করে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে রইল রানা, আতাসীর কথা যদি তোলে জাফরী। কিন্তু না, আতাসী-প্রসঙ্গে কিছু বলল না সে।

'এত ব্যাখ্যা দিতে পারব না,' জাফরী বলল, 'বিপদ ঘটতে পারে; তুমি নিজে বোঝো না? যেখানে নাক গলাবার কথা নয় সেখানে নাক গলালে বিপদে না পড়াটাই তো আশ্চর্য! কিন্তু, ঐ বেচারা জামাল আরসালানের রহস্যময় ব্যাপার আছে এ আমার একেবারে ধারণার বাইরে।'

'বেচারা কেন?'

'লোকটার কথা মনে পড়লেই অবাক হই, এইরকম একটা জায়গায় কেন যে লাইব্রেরিয়ান হয়ে সে পড়ে আছে! চার বছর ধরে দেখছি, এখান থেকে আর কোথাও যাবে বলে মনেও হয় না। অথচ, যে রকম জ্ঞান-বুদ্ধি তার, লাইব্রেরিয়ান হয়ে পড়ে থাকার কথা নয়। আলাপ করে বুঝেছি, পৃথিবীর সব ব্যাপারে ভীষণ জ্ঞান রাখে সে।'

ছাউনিতে ঢুকে সাবান তোয়ালে ইত্যাদি নিল জাফরী। ডিসপারসাল পয়েন্ট পেরিয়ে যাওয়ার সময় রানা জানতে চাইল, 'এখানে আসার আগে কি করত, কোথায় ছিল এসব কিছু জানো তুমি?'

'না। তবে অন্য কোন স্টেশন থেকে যে আসেনি এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। স্কুল মাস্টারের সাথে কোথায় যে মিল আছে লোকটার। একসময় নিয়মিত ক্লাস নিত আমাদের, রুটিনের পড়া শেষ হয়ে গেলে প্রায়ই সে এরিয়্যাল ট্যাকটিকসের ওপর লেকচার দিত। সম্ভবত এই বিষয়ে একটা বই লিখেছে সে। আমার কি ধারণা জানো, সে যদি তোমার মত সাংবাদিক হত, তাহলে বড় কোন পত্রিকার সম্পাদক হতে পারত এতদিনে।'

'আর কিছুই জানো না তুমি?'

'খোঁজ-খবর তো নিইনি, এর বেশি জানব কিভাবে? কথাবার্তা শুনে মনে হয় অনেক দেশ ঘুরে বেড়িয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস, ইহুদি জাতির হাজার বছরের

ইতিহাস গড় গড় করে বলতে পারে, কোথাও ভুল করে না। দারুণ স্মরণশক্তি লোকটার।'

জামাল আরসালানের কোঁকড়ানো পাকা চুল আর নিষ্প্রভ মুখটা ভেসে উঠল রানার চোখের সামনে। জাফরী কথা বলছে, সেই সাথে জামাল আরসালানকে যেন চিনতে পারছে রানা। ওর মনে হল, এখানে আসার আগে কোথায় সে ছিল এবং কি করত তার উপর নির্ভর করছে সব কিছু। এটা ঠিক যে জামাল আরসালান সাধারণ কোন স্টেশন লাইব্রেরিয়ান নয়। অনেক বেশি যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও চার বছর ধরে এখানে সে পড়ে আছে—কেন?

শিক্ষা-কেন্দ্রের একটা অংশে জামাল আরসালানের লাইব্রেরি। স্টীল ফ্রেমের চশমা বারেক বাওয়ানীর চোখে, ঘাড় ঢাকা পড়ে গেছে লম্বা চুলে। লম্বাটে, সরু মুখ। মৃদু হাসিটা সেখানে লেপ্টেই আছে। জাফরী পরিচয় করিয়ে দেয়ার পর রানা বলল, ত্রিকোণমিতির নতুন কোন কোর্স শুরু হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা জানতে চায় ও। কিন্তু জাফরী চলে যাওয়ার পর আলোচনার খাত বদলে জামাল আরসালানের প্রসঙ্গ তুললো ও। লোকটা সম্পর্কে জাফরীর চেয়ে খুব বেশি কিছু জানে না বারেক বাওয়ানীও। আঠারো মাস ধরে আরসালানের অধীনে কাজ করলেও নাবাতিয়ায় আসার আগে কোথায় সে ছিল তা তার জানা নেই।

দু'চার কথাতেই রানা ধরতে পারল, লোকটা আরসালানের দারুণ একজন ভক্ত। আরসালানকে একটা প্রতিভা বলে মনে করে সে। 'তিনি তার প্রতিভার বাজে খরচ করছেন এখানে,' আরসালান সম্পর্কে এই হল তার শেষ কথা। সেই প্রশ্নটাই আবার জাগল রানার মনে, নাবাতিয়ায় কি আছে যা ধরে রেখেছে জামাল আরসালানকে?

হঠাৎ চিন্তাজাল ছিঁড়ে গেল রানার। বারেকের কথায় সজাগ হয়ে উঠল ও। বারেক বলে চলেছে···'দুজন বন্দীর সাথেই মি. আরসালান কথা বলেছেন। কো-পাইলটটা তো একেবারে ছেলেমানুষ, সতেরো বছর বয়স মাত্র।'

বাধা দিয়ে রানা বলল, 'তুমি ঠিক জানো মি. আরসালান বন্দীদের সাথে কথা বলেছেন? উনি তো সিভিলিয়ান, তাই না?'

'সিভিলিয়ান হলে কি হবে, কমান্ডিং অফিসার গুরুর মত শ্রদ্ধা করেন মি. আরসালানকে। স্টেশনের সব ব্যাপারে কমান্ডিং অফিসার তাঁর সাথে পরামর্শ করেন। এখানে যুদ্ধের যে স্ট্র্যাটেজি গ্রহণ করা হয়েছে, আমার ধারণা, মি. আরসালানেরই তা সৃষ্টি। আসল কথা কি জানো, এরিয়্যাল ট্যাকটিকসে, রীতিমতো বিশেষজ্ঞ তিনি। তাছাড়া, পাঁচটা ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারেন। আমার তো ধারণা ইন্টেলিজেন্স অফিসার জেরা করে যতোটা না জানতে পেরেছে, পাঁচ মিনিট কথা বলে তার চেয়ে অনেক বেশি জানতে পেরেছেন আমাদের মি. আরসালান।'

'গুরুত্বপূর্ণ কিছু বলেছে নাকি বন্দীরা?'

'তা বললেও আমার মত লোককে মি. আরসালান কি আর সে-কথা জানাবেন? তবে, পাইলট সম্পর্কে বললেন, লোকটা পাক্কা বদমাশ, কাক-শকুনকে দিয়ে খাওয়ানো

উচিত লোকটাকে। আর কো-পাইলট সম্পর্কে বললেন অবোধ শিশু।'

'ওদের সাথে কখন কথা বলেছেন মি. আরসালান?'

'অ্যারেস্ট করার পরপরই, সম্ভবত। বললেন, মেডিকেল অফিসার ওদের ক্ষত পরীক্ষা করার সময় কমান্ডিং অফিসারের সাথে সেখানে উনিও উপস্থিত ছিলেন।'

একজন সিভিলিয়ানের সাথে নাবাতিয়ার কমান্ডিং অফিসারের এতটা হৃদ্যতা অত্যন্ত দৃষ্টিকটু ব্যাপার। শত্রু-পক্ষের দু'জন পাইলট ধরা পড়েছে, তাদের দেখতে গেছেন কমান্ডিং অফিসার, সাথে নিয়ে গেছেন একজন সিভিলিয়ানকে—ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য এবং মিলিটারি আইনের স্পষ্ট লঙ্ঘন। কিন্তু অবিশ্বাস্য বলেই রানা অনুভব করল ঘটনাটা সত্য। হঠাৎ একটা সন্দেহ জাগল ওর মনে। যতদূর মনে হচ্ছে, ইন্টেলিজেন্স অফিসার জেরা করার আগেই আরসালান কথা বলেছে বন্দীদের সাথে। পাঁচটা ভাষা জানে সে. পাইলটের সাথে হিব্রু ভাষায় কথা বলে থাকলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কমান্ডিং অফিসার এবং মেডিকেল অফিসার হিব্রু নাও জানতে পারেন, না জানার সম্ভাবনাই বেশি। সেক্ষেত্রে, তাদের সামনে দাঁড়িয়ে অথচ তাঁদের বুঝতে না দিয়ে জেরার সময় ইন্টেলিজেন্স অফিসারের দৃষ্টি প্ল্যানটার দিক থেকে শুক্রবারে নাবাতিয়া আক্রমণের দিকে কিভাবে সরিয়ে আনতে হবে সে-ব্যাপারে আরসালান নিশ্চয়ই বুদ্ধি পরামর্শ দিতে পেরেছে পাইলটকে।

এই ব্যাপারটাই বেশি যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হতে লাগল রানার। একজন পাইলট, যে রাগের মাথায় সংযম রাখতে না পেরে অতি গোপনীয় প্ল্যানের কথা মুখ ফসকে বলে ফেলে, তার মাথায় এত বেশি বুদ্ধি থাকার কথা নয়, যে-বুদ্ধি খাটিয়ে সে বোকা বানাতে পারে একজন ইন্টেলিজেন্স অফিসারকে। তাই যদি হয়, বুদ্ধিটা তাকে যোগান দিয়েছে অন্য কেউ। এই অন্য কেউ আরসালান ছাড়া আর কেউই হতে পারে না।

অত্যন্ত চিন্তিতভাবে বারেক রাওয়ানীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলো রানা। ভয়ঙ্কর একটা দায়িত্বের বোঝা ক্রমশ ভারি হয়ে উঠছে কাঁধে, অনুভব করছে ও। অথচ দায়িত্বটা যে পালন করবে তার কোন পথও চোখের সামনে খোলা দেখতে পাচ্ছে না। স্টেশন কর্তৃপক্ষের সাথে এ ব্যাপারে সরাসরি আলোচনা করতে গেলে সেটা হবে নিয়ম এবং আইন বিরুদ্ধ। তাছাড়া, কে যে কি, তা যখন জানবার উপায় নেই তখন বিশ্বাস করে কাউকে কিছু বলতে যাওয়া মানে সরাসরি জীবনের উপর ঝুঁকি নেয়া। না, সেরকম কোন ভুল করতে যাবে না ও। আতাসীর কথা মনে পড়ে গেল ওর। সে হয়ত এই ধরনের কোন ভুল করেই শত্রুকে সুযোগ করে দিয়েছিল সতর্ক হওয়ার।

কিন্তু জামাল আরসালানের প্রথম জীবনের ইতিহাস জানতেই হবে ওকে। লোকটার সম্পর্কে ওর সন্দেহ যদি সত্যি প্রমাণিত হয় তাহলে আতাসীকে ফাঁসাবার জন্যে কে দায়ী চিনতে পারবে ও।

গা পোড়ানো রোদে চৌরাস্তাটা ঝাঁ ঝাঁ করছে। বারোটার মত বাজে, কিন্তু এরই মধ্যে রেস্তোরাঁ খোলা হয়েছে দেখে চায়ের তৃষ্ণা অনুভব করল রানা। ভিতরে ঢুকতেই

তন্দুরের উত্তপ্ত আঁচ লাগল যেন গায়ে। দু'চারজন লোক জানালার ধারে বাতাসের আশায় বসে সেদ্ধ হচ্ছে। কাউন্টার থেকে চায়ের কাপ নিয়ে একটা টেবিলে বসল রানা। গলাটা ভিজিয়ে নিয়ে সিগারেট ধরাল একটা।

আচ্ছা, দায়রা দাউদকে টেলিফোন করলে কেমন হয়? ভাবল রানা। বৈরুতের ডেইলী সান পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক সে, ওর বন্ধু। যে ধরনের তথ্য ওর দরকার দাউদকে বললেই যোগাড় করে দিতে পারে। কিন্তু ক্যাম্প থেকে ফোন করাটা বোকামি হবে। এল এ এফের সুইচবোর্ডের মাধ্যমে যাবে কলটা। অপারেটর ওদের কথাবার্তা শুনবে কি শুনবে না তা জানতে পারবে না ও। কড়াকড়ি কতটা এখানে তাও ওর জানা নেই। ক্যাম্পের বাইরে সবচেয়ে কাছের ফোন নাবাতিয়া শহরে, কিন্তু শহরে যাওয়া মানে ক্যাম্প থেকে পালানোর অপরাধে অভিযুক্ত হওয়া। এত বড় ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে না।

হঠাৎ রানার মনে পড়ল আবার একটার সময় গানপিটে যেতে হবে ওদের। তার আগেই সারতে হবে লাঞ্চ। মনে পড়তেই খিদেটা চাঁড়া দিয়ে উঠল পেটে। সকাল থেকে চা বিস্কুট ছাড়া মুখে দেয়নি কিছু। কিন্তু খাদ্যদ্রব্যের চেহারা চোখের সামনে ভেসে উঠতে খিদেটা পালাই পালাই করতে শুরু করল। ক্ষুধার্তদের দীর্ঘ লাইনে গিয়ে দাঁড়াল রানা। মাথার উপর সূর্য নেমে আসছে বলে মনে হতে লাগল ওর। দশ মিনিট পর তাঁবুর ছায়ায় ঢুকতে পারল। সেদ্ধ গাজর আর রুটি। একটু রুটি ছিঁড়ে নিয়ে গাজর সেদ্ধসহ জিভে ঠেকতেই মুখ বিকৃত হয়ে উঠল ওর। নুনে জহর একদম!

তিনমিনিট পর বাইরে বেরিয়ে আসতেই ইফফাতের সামনাসামনি পড়ে গেল ও। এমন নারকীয় গরমের মধ্যেও তাজা ফুলের মত দেখাচ্ছে মুখটা। ওকে দেখেই গালে টোল ফেলে হাসল সে। হাসিটা খুব সুন্দর ইফফাতের, কথাটা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ নিজের সমস্যাটার একটা সমাধান দেখতে পেল যেন রানা। স্টেশনের ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের স্বাধীনতা অনেকখানি বেশি। ছেলেদের মত শহরে যাওয়া নিষেধ নয় ওদের। তাছাড়া, রানা অনুভব করল, ক্যাম্পে একমাত্র ইফফাতকেই বিশ্বাস করতে পারে সে।

'ডান হাতের ঝামেলা সারতে যাচ্ছো বুঝি?'

হেসে ফেলল ইফফাত, এদিক ওদিক মাথা দোলাল। 'না। আমাদের ক্যান্টিনের একটা পাস অনেক কষ্টে যোগাড় করেছি, ওখানেই খাই।'

'এখানে কেন তাহলে?'

ঢোক গিলে ইতস্তত করতে লাগল ইফফাত। দেখতে ভুল করল কিনা বুঝতে পারল না রানা, মুখটা যেন লাল হয়ে উঠল তার আগের চেয়ে। নাকি রোদের তাপ লেগে আগে থেকেই লাল হয়ে আছে?

চোখাচোখি হতে ইফফাত তাড়াতাড়ি বলল, 'না...মানে, এক বান্ধবীর খোঁজে এসেছিলাম।'

'খুব তাড়া নেই তো?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'যদি আপত্তি না থাকে, রেস্তোরাঁয়

গিয়ে বসবে আমার সাথে? তোমার কাছে একটা অনুরোধ আছে আমার! রক্ষা করতেই হবে।'

হ্যাঁ বা না কিছুই বলল না ইফফাত। মাথা নিচু করে ঘুরে দাঁড়াল শান্তভাবে। তারপর হাঁটতে শুরু করল। কিছু বলতে গিয়েও বলতে পারল না রানা। বুজতেই পারেনি ও ব্যাপারটা। রেস্তোরাঁয় নিয়ে যেতে চেয়ে অপরাধ করে ফেলেছে নাকি?

দিব্যি হেঁটে চলে যাচ্ছে ইফফাত। পিছু নেয়ার জন্যে পা বাড়াতে গিয়েও নিজেকে সামলে রাখল রানা। প্রায় পঁচিশ গজ এগিয়ে হঠাৎ ইফফাত থামল। পিছন ফিরে রানাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলল, 'কি হলো, দাঁড়িয়ে আছেন কেন? রেস্তোরাঁয় যাবেন বললেন না?'

আশ্চর্য মেয়ে, ভাবতে ভাবতে প্রায় ছুটল রানা।

রেস্তোরাঁয় ঢুকেছে ওরা, এমন সময় কাফাকে দেখল রানা। প্রবেশ পথের দিকে হন হন করে হেঁটে আসছে সে। ওদের দেখে আকর্ণ বিস্তৃত হলো তার হাসিটা। সোজা ইফফাতের দিকে এগিয়ে আসছে। হঠাৎ চোখ বড় বড় হয়ে উঠল রানার। কাফা কি অন্ধ হয়ে গেছে? যেভাবে সোজা এগিয়ে আসছে লম্বা লম্বা পা ফেলে, ইফফাতের সাথে ধাক্কা না লেগেই যায় না! কিন্তু ঠিক আধ হাত দূরে হঠাৎ ব্রেক কষে ইফফাতের সামনে দাঁড়াল সে। 'কি, বলিনি, মেসে গেলেই চাঁদের দর্শন পেয়ে যাবেন?' কথাটা বলে একপাশে সরে গেল কাফা, তারপর ঝড়ের মত বেরিয়ে গেল বাইরে।

তার গমন পথের দিক থেকে দৃষ্টি ফেরাতেই চোখাচোখি হয়ে গেল ইফফাতের সাথে। চেয়ে রইল ওরা পরস্পরের দিকে ক'সেকেন্ড। তারপর, হঠাৎ একযোগে হেসে উঠল দু'জনেই।

টেবিলে বসে দু'কাপ চায়ের অর্ডার দিল রানা।

'কারও সাথে যে কথা বলব তেমন লোকই নেই এখানে। তাই আপনার খোঁজ করেছিলাম।' চায়ের কাপে ছোট্ট চুমুক দিয়ে ইফফাত বলল, 'কি যেন অনুরোধ আছে বলছিলেন না?'

'সম্পর্কটা আরও গভীর না হলে বলব কিনা ভাবছি।'

হেসে ফেলল ইফফাত। 'নাও, তুমিই বলছি তোমাকে। গভীর হয়েছে এবার সম্পর্ক?'

মৃদু হাসল রানা। পরমুহূর্তে গম্ভীর দেখাল ওকে। হঠাৎ ওর এই পরিবর্তন লক্ষ করে অবাক হয়ে গেল ইফফাত।

'আমার একটা কাজ করে দিতে হবে তোমাকে, ইফফাত,' বলল রানা। 'করবে তুমি?'

'করব না কেন? কি কাজ?'

'তোমাদের পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক দাউদকে একটা মেসেজ পাঠাতে চাই আমি। জরুরী এবং ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে অ্যারোড্রোম থেকে ফোনটা করতে চাই না। শহরে গিয়ে আমার হয়ে তুমি যদি ওকে ফোনটা করে মেসেজটা দাও, খুব উপকার হয়

আমার। কাজটা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ক্যাম্পের ভিতর হাত-পা বাঁধা আমাদের, জানোই তো।'

'কাজটা করতে পারলে খুশিই হতাম, রানা,' বলল ইফফাত। 'কিন্তু ফোন করা সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। আজ সকালে কয়েকজন মেয়ে বৈরুতে ফোন করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছে। অপারেটররা শুধু অত্যন্ত জরুরী কল বুক করছে। আমার ধারণা, গতকাল এদ্ দায়রায় রেইডের ফলে টেলিফোন লাইনগুলো অচল হয়ে গেছে।'

বাধার অপ্রত্যাশিত একটা প্রাচীর দেখল যেন রানা। চিঠি লিখতে পারে বটে ও, কিন্তু চিঠি যেতে-আসতে সময় লেগে যাবে কমপক্ষে পাঁচদিন। উত্তর পাওয়ার পর হাতে থাকবে মাত্র একদিন। নাহ্, চিঠি লেখার কোন মানেই হয় না। 'টেলিগ্রাম করলে কেমন হয়?'

'সেটাই ভাল।'

কিন্তু ইতস্তত করতে লাগল রানা। চিঠি বা ফোনের মত নিরাপদ নয় টেলিগ্রামটা। কয়েকজনের হাতে পড়বে সেটা, ইচ্ছা হলেই তারা পড়তেও পারবে। কিন্তু এ ছাড়া আর কোন উপায়ও দেখল না ও। 'পারবে তো একটা টেলিগ্রাম করতে, ইফফাত?'

'কেন পারব না? আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত কোন ডিউটি নেই আমার।'

একটা এনভেলাপের পিছনে মেসেজটা লিখল রানা। 'নাবাতিয়ার লাইব্রেরিয়ান জামাল আরসালানের চার বছর আগের ইতিহাস বিশদভাবে জানতে চাই। ব্যাপারটা সম্ভবত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যথাসাধ্য চেষ্টা করো তথ্য সংগ্রহের জন্যে। তোমার কাছে এটা আমার বিশেষ অনুরোধ। শুক্রবার ভোরে ফলাফল জানার জন্যে ফোনে যোগাযোগ করব।' মনটা খুঁত খুঁত করছে রানার। দাউদের সাথে কথা বলতে পারলে গুরুত্বটা বুঝিয়ে দিতে পারত ও। এখন শুধু আশা করতে পারে, খুব সম্ভব দাউদ হালকা ভাবে নেবে না মেসেজটাকে। এনভেলাপটা ইফফাতকে দিল রানা। 'পড়তে কোন বাধা নেই তোমার।'

লেখাটার উপর চোখ বুলাল একবার সে। ভুরু জোড়া সামান্য একটু উপরে উঠল শুধু। কোন প্রশ্ন করল না। নিজে থেকে কিছু জানাবারও প্রয়োজন বোধ করল না রানা। ইউনিফর্মের উঁচু হয়ে থাকা বুক পকেটে এনভেলাপটা সযত্নে ঢুকিয়ে রাখল ইফফাত। 'কেবিন হয়ে ক্যাম্পের বাইরে যাব, প্রথম কাজই হবে আমার টেলিগ্রামটা করা,' কথা দিল সে।

'একটার সময় ডিউটি আমার,' বলল রানা, 'আর দেরি করতে পারি না।' উঠে দাঁড়াল ও ইফফাতের সাথে। 'আজ সন্ধ্যায় আসবে তুমি এখানে?'

'আসতে পারি?' ইফফাত বলল, 'কিন্তু আটটায় আবার আমার ডিউটি শুরু হবে।'

'সাতটায় গানপিট থেকে বেরুব আমি,' বলল রানা, 'যত তাড়াতাড়ি পারি চলে আসব এখানে। অবশ্য, ইসরায়েলের প্রধান মন্ত্রী মেনাচিম বেগিন যদি অনুমতি দেন তবেই!'

'আশা করি তা তিনি দেবেন,' হাসল ইফফাত।

বিকেলটা ঢিমে তালে কাটল। সতর্ক সঙ্কেত এল না একবারও। প্রচুর সময় পেল রানা সমস্যাটা নিয়ে মাথা ঘামাবার। টেলিগ্রামটা যদি নির্বিঘ্নে যায়, ভাবল রানা, শুক্রবার সকালেই দাউদের কাছ থেকে খবর পাওয়া যাবে জামাল আরসালান সম্পর্কে। আতাসীকে ফাঁসাবার ব্যাপারে, এই লোক যদি দায়ী হয়, এর পিছনে মরিয়া হয়ে লাগতে হবে ওকে। আতাসীকে রক্ষা করার একমাত্র উপায়, শত্রুর মুখোশ উন্মোচন করে তার সত্যিকার পরিচয়টা প্রকাশ করে দেয়া। তিনটের সময় গানপিট থেকে বেরুবার অনুমতি পেয়ে ডিটাচমেন্টের সবাই ঘুমুতে চলে গেল। বাইরে আধ ঘণ্টা অকারণ ঘোরাফেরা করার পর ছাউনির কাছে ফিরে এল রানা। গাছের ছায়ার নিচে মরে পড়ে আছে যেন সবাই। কাপড় বদলায়নি কেউ। বিকেলের এই ঘুমটাই আসলে বাঁচিয়ে রেখেছে ওদের। ছাউনির ভিতর ঢুকে কাফা আর কুতুব দীনকে দেখল রানা। দু'জন দু'জনকে কোল বালিশের মত পা দিয়ে পেঁচিয়ে নিয়ে ঘুমিয়ে আছে। বাইরে এসে মাটির উপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল রানা। মাথা থেকে বুক পর্যন্ত ছায়ায় ঢাকা পড়ল, নিচের দিকটা পুড়তে লাগল রোদে। কিন্তু ঘুম তাতে আটকাল না। শুতে না শুতেই অচেতন হয়ে পড়ল ও।

পৌনে পাঁচটায় ঘুম থেকে জাগানো হল ওদের। পাতা খুলতেই রোদ লেগে ধাঁধিয়ে গেল রানার চোখ। ট্রাউজার, শার্ট ভিজে জবজবে হয়ে গেছে ঘামে। প্রচণ্ড ব্যথায় মাথাটা খসে পড়ে যেতে চাইছে যেন। ছাউনিতে ঢুকে ধড়াচূড়া সব পরতে হবে ভাবতেই বিদ্রোহ করে উঠতে চাইল মনটা। প্রচণ্ড রোদ শুধু যে পুড়িয়েছে, তাই নয়, অসম্ভব দুর্বলও করে তুলেছে ওকে। বিকেলের চা-নাস্তা দিনের শেষ ভাল খাবার, কিন্তু হাঁটতে হবে বলে মেসে গেল না রানা। গানপিটে চা তৈরি করার একটা ব্যবস্থা করছে কাফা, দেখে খুশি হল ও।

সাতটায় গানপিট থেকে বেরিয়ে সোজা রেস্তোরাঁয় গিয়ে ঢুকল রানা। এরই মধ্যে তিল ধারণের স্থান নেই কোথাও। দু'নম্বর কামানের গানারও এসেছে ক'জন। কিন্তু চারদিকে তাকিয়ে ইফফাতকে কোথাও দেখতে পেল না রানা। পনেরো মিনিট একা ঘোরাফেরা করার পর চায়ের অর্ডার দিয়ে গানারদের সাথে একটা টেবিলে বসল ও।

তাঁবুর প্রবেশ পথের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে রানা। হয়ত কোন কাজে আটকা পড়ে গেছে বলে পৌঁছুতে দেরি করছে ইফফাত, প্রথমে ভাবল রানা। কিন্তু অপেক্ষা করতে করতে সাড়ে সাতটা বাজল। দেখা নেই ইফফাতের। তবে কি গোটা ব্যাপারটাই ভুলে গেছে সে? দুশ্চিন্তা শুরু হল রানার।

সায়েদ সাবরী এসে যোগ দিল ওদের সাথে। ওদের গোটা ডিটাচমেন্ট উপস্থিত। হৈ-হট্টগোল তুঙ্গে উঠে যাচ্ছে। হাসি আর আনন্দের ফোয়ারা চারদিকে। শুধু রানার মনেই নিরানন্দ ভাব, হাসি নেই মুখে।

আটটার কিছু পরে তাঁবুতে ঢুকল শাফা। ওদেরই টেবিলে জায়গা করে দিয়ে বসতে বলা হল তাকে। ইফফাতের সঙ্গে শাফার বন্ধুত্ব কতখানি জানা নেই রানার,

তবু ওর মনে হল, ইফফাতের কোন খবর জানে কিনা জিজ্ঞেস করা যেতে পারে তাকে।

খাওয়ার জন্যে সুপার ক্যানটিনে যাওয়ার প্রস্তাব দিল কয়েকজন। তাদের সাথে উঠে দাঁড়াল রানাও। শাফার সামনে দিয়ে এগোবার সময় সহজভাবে জানতে চাইল, 'ইফফাতকে দেখছি না কেন?'

মুখটা না নেড়ে শুধু চোখের মণি ঘুরিয়ে তাকাল ওর দিকে শাফা। দু'ঠোঁটের মাঝখানে সিগারেট পুড়ছে, এঁকেবেঁকে উঠছে নীলচে ধোঁয়া। 'ইফফাত? চাপা স্বভাবের মেয়ে, কি হয়েছে বলল না তো আমাকে। কোন গণ্ডগোলে জড়িয়ে পড়েছে বলে মনে হল।' অন্য দিকে তাকিয়ে সিগারেটে জোরে দু'বার টান দিল সে, তারপর আবার তাকাল। বাঁকা একটু হাসির রেখা ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল, পরিষ্কার দেখল রানা। 'দেখা হলে কি তোমার ভালবাসা জানাব তাকে?'

শাফার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে জানতে চাইল রানা, 'গণ্ডগোল? কিসের গণ্ডগোল?'

'হয়ত কিছু হয়েছে, কিন্তু ব্যাপারটা সম্পর্কে অত্যন্ত গোপনীয়তা রক্ষা করছে সে, 'শাফার চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠল মুহূর্তের জন্যে। 'ওর গোলমালে জড়িয়ে পড়ার সাথে তোমার কোন সম্পর্ক নেই তো?'

কি বলতে হবে ভেবে পেল না রানা। শাফার সন্দেহ সত্য হতেও পারে, কথাটা মনে হতেই ভয়ের একটা শিহরণ অনুভব করল ও বুকের ভিতর। হঠাৎ রানা সচেতন হয়ে উঠল টেবিলের সবাই চুপ করে আছে, চেয়ে আছে ওদের দু'জনের দিকে।

রানার হাতটা ধরে মৃদু একটু চাপ দিল শাফা। 'মন খারাপ করো না, রানা। আশা করি, তেমন সিরিয়াস কিছু ঘটেনি। কথা দিলাম, তোমার ভালবাসা পৌঁছে দেব ইফফাতের কাছে। আর ও যদি গ্রহণ না করে, আমি তো আছিই।'

অতি কষ্টে মৃদু একটু হাসি মুখে ফুটিয়ে তুলতে পারল রানা। সঙ্গীদের সাথে তাড়াতাড়ি পা বাড়াল ও দরজার দিকে। বাইরে বেরিয়ে আসতেই জাফরী বলল, 'বহু ঘাটের পানি খাওয়া মেয়ে বলে মনে হয় ওকে, না?'

চুপ করে থাকল রানা। বলার কিছুই নেই ওর। শাফা সম্পর্কে নয়, মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে ইফফাতের সমস্যা। কি বিপদে পড়ল সে? টেলিগ্রামটা কি পাঠাতে পারেনি?

'এত কি চিন্তা করছ, অ্যাঁ?' গুঁতো মারল পাশ থেকে জাফরী। 'প্রেমে কি বাপু আমরা পড়িনি কখনও?'

'আড়ালে গিয়ে এক পশলা কেঁদে এলেই সব ঠিক হয়ে যাবে,' বুদ্ধি দিল কাফা।

'আরে না, খুব ক্লান্তি লাগছে আমার।'

ক্যানটিনেও প্রচণ্ড ভিড়। টেবিল খালি পেতে পনেরো মিনিট অপেক্ষা করতে হল। কিচেনের দেয়াল ঘেঁষে বসতে হল ওদেরকে। অসহ্য গরমে পিঠের চামড়া পুড়ে যাওয়ার মত অবস্থা।

ওয়েটার এল খাবার নিয়ে। তারই সাথে এল আলী কায়সার। চোখেমুখে তার চঞ্চল একটা ভাব দেখে বুকটা কেঁপে গেল রানার। কিছু শোনার আগেই বিপদ আঁচ

করতে পারল ও।

'এই মুহূর্তে অফিসে যেতে হবে তোমাকে, রানা। মি. ফারুকী তোমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে আমাকে পাঠিয়েছেন।'

কণ্ঠস্বর প্রমাণ, ব্যাপার গুরুতর। গলার ভিতর কি যেন একটা আটকে আছে, অনুভব করল রানা। ঢোক গিলে সেটাকে নামাবার চেষ্টা করে বলল, 'হঠাৎ কি এমন ঘটল যে একেবারে এখনই যেতে হবে?' কি ঘটেছে তা আর জানতে বাকি নেই ওর। ধীরে ধীরে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে জোর করে হাসল ও।

'কি ঘটেছে তা জানি না,' কায়সার বলল, 'কিন্তু মি. ফারুকীর সাথে উইং কমান্ডার তারেক হামেদী রয়েছেন দেখে এসেছি আমি। মনে হল তিনিও অপেক্ষা করছেন তোমার জন্যে।'

চোখ বড় বড় হয়ে উঠল জাফরীর। কিন্তু কাফা গুরুত্ব দিল না ব্যাপারটাকে। 'আরে, এত ব্যস্ততার কি আছে। খাবার ফেলে এভাবে কেউ যায় নাকি? খেয়ে নাও আগে, দোস্ত! পরে আজ আর সময় পাবে না।'

'উচিত হবে না,' বলল কায়সার। 'মনে হচ্ছে, খুব সিরিয়াস কিছু ঘটে গেছে। অনেকক্ষণ ধরে এদিক ওদিক খুঁজছি তোমাকে, আর দেরি করা মোটেই উচিত নয়।'

'ঠিক আছে,' টেবিল থেকে ক্যাপটা তুলে মাথায় পরল রানা। কায়সারকে অনুসরণ করে বেরিয়ে এল ক্যানটিন থেকে। টেলিগ্রামের ব্যাপারটা কেঁচে গেছে, এতে আর সন্দেহ নেই কোন। ইয়াসির ফারুকী ওর ব্যাখ্যা কানে তুলবে বলে মনে হল না ওর। তবে রক্ষা এই যে জামাল আরসালান সামরিক বাহিনীর অফিসার নয়। তা যদি হত, তাহলে এমন কি কোর্ট মার্শাল হওয়ার সম্ভবনা ছিল।

কায়সার সোজা ওকে ইয়াসির ফারুকীর অফিসে নিয়ে গেল। ইয়াসির ফারুকীর ডেস্কের পাশে একটা চেয়ারে পায়ের উপর পা তুলে থমথমে মুখে বসে আছে উইং কমান্ডার তারেক হামেদী। রানা ঢুকতেই মুখ তুলে তাকাল দু'জন। স্যালুট করল রানা। 'আপনি আমাকে ডেকেছেন, স্যার?' প্রস্তর মূর্তির মত অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়িয়ে শুধু ঠোঁট জোড়া নাড়ল রানা।

'ইফফাত কাজানী নামে এক মেয়েকে একটা টেলিগ্রাম পাঠাবার জন্যে দিয়েছিলে তুমি?'

এতটুকু নড়ল না রানা। 'ইয়েস, স্যার।'

'এটাই কি সেই টেলিগ্রাম?'

টেলিগ্রামের একটা ফর্ম বাড়িয়ে দিল ইয়াসির ফারুকী রানার দিকে। ফর্মের গায়ে মেয়েলী হাতের লেখা, মেসেজটা পড়ে দেখল রানা। 'ইয়েস, স্যার।'

'এ অবিশ্বাস্য, গানার রানা—একেবারেই অচিন্তনীয়। প্রকারান্তরে মি. জামাল আরসালানকে কোন ব্যাপারে অভিযুক্ত করতে চাইছ তুমি, কিন্তু মুখ ফুটে তা বলতে সাহস পাচ্ছ না। তার বিরুদ্ধে কি তোমার অভিযোগ, রানা?'

'আমি অস্বীকার করছি, স্যার। কোন ব্যাপারে মি. জামাল আরসালানকে আমি

অভিযুক্ত করতে চাইনি।'

'তার সম্পর্কে বিশদ জানার চেষ্টা করছ কেন তাহলে? নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে।'

'ব্যাপারটা নির্ভেজাল ব্যক্তিগত, স্যার।'

'সামরিক বাহিনীতে ঢোকার পর কারও কোন আচরণই ব্যক্তিগত থাকতে পারে না,' রানাকে থামিয়ে দিয়ে ধমকের সুরে বলল ইয়াসির ফারুকী। 'তোমার ভাগ্য ভাল যে তেমন কড়া সেন্সারশিপ নেই স্টেশনে। তা থাকলে, ক্যাম্পের বাইরে তোমার লেখা মেসেজটা বেরুতেই পারত না। তোমার টেলিগ্রামের মেসেজ এমনই গুরুতর ধরনের যে নাবাতিয়ার পোস্ট মাস্টার হতভম্ব হয়ে স্টেশন হেডকোয়ার্টারে ফোন করে ব্যাপারটা না জানিয়ে পারেনি। বিরতি নিয়ে উইং কমান্ডারের দিকে তাকাল সে। 'লোকটাকে আপনি কোন প্রশ্ন করবেন, স্যার?'

C. O. নাবাতিয়া চওড়া চোয়ালের অধিকারী, লাল মুখটা যেন পাথরে খোদাই করা। চোখ দুটো রানার মুখের দিকে স্থির হয়ে আছে। সতর্ক দৃষ্টিতে দেখছেন। সরাসরি প্রসঙ্গে চলে এলেন তিনি। 'গানার রানা, কেন তুমি অস্বীকার করছ জানি না, কিন্তু তোমার টেলিগ্রামের মেসেজ পড়ে একথাই বিশ্বাস করতে হয় যে মি. জামাল আরসালানের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার মত কিছু তথ্য জানা আছে তোমার। মেসেজে তুমি বলেছ, ব্যাপারটা সম্ভবত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তোমার কাছ থেকে এ ব্যাপারে একটা ব্যাখ্যা চাই আমি।'

ইতস্তত করল রানা ক'সেকেন্ড। উইং কমান্ডার তারেক হামেদী অভিজ্ঞ কমান্ডিং অফিসার, আজেবাজে কারণ দেখিয়ে তাঁকে সন্তুষ্ট করা যাবে বলে মনে হল না। কি বলা যায় তা নিয়ে দ্রুত ভাবল সে আরও খানিকক্ষণ। শেষ পর্যন্ত অকপট হওয়ারই সিদ্ধান্ত নিল ও। 'আমার সন্দেহ জেগেছে বলেই মি. আরসালান সম্পর্কে খবর নেয়ার চেষ্টা করেছি আমি, স্যার,' বলল রানা। তারপর রানা বর্ণনা করল ইসরায়েলি পাইলট জামাল আরসালানকে দেখে কিভাবে চুপ করে গিয়েছিল। এখানেই থামল না, পাইলটের সাথে জামাল আরসালান কথা বলেছে শুনে ওর মনে কি সন্দেহ দানা বাঁধে তাও পরিষ্কার করে জানাল ও। 'আমার বিশ্বাস, স্যার, পাইলটকে বুদ্ধি পরামর্শ দেয়া হয়েছে, তা না হলে নিজের বুদ্ধিতে ইন্টেলিজেন্স অফিসারের দৃষ্টি প্ল্যানের প্রসঙ্গটা থেকে সরিয়ে আনতে পারত না সে।' একটু বিরতি নিল রানা, তারপর আবার বলল, 'জামাল আরসালান চার বছর আগে কি করতেন তা জানার চেষ্টা করে আমি ব্যর্থ হই, স্যার। তাই আমার সহকর্মীকে তার সম্পর্কে খবর সংগ্রহের জন্যে অনুরোধ করার কথা ভাবি।'

'আই সি! তার মানে, মি. জামাল আরসালানকে ইসরায়েলি গুপ্তচর বলে সন্দেহ করছ তুমি?'

ঘন ভুরু নিচের দিকে নেমে উইং কমান্ডারের চোখ দুটোকে প্রায় ঢেকে ফেলেছে। তাঁর কণ্ঠস্বর অদ্ভুত শান্ত লাগল রানার কানে। প্রতিটি শব্দ রানার শরীরে ঠাণ্ডা

অনুভূতির স্রোত বইয়ে দিল। এখন আর অস্বীকার করার উপায় নেই ওর। মৃদু গলায় বলল, 'ইয়েস, স্যার।'

'কিন্তু নিয়ম মেনে তোমায় সন্দেহের কথা তুমি কি তোমার কমান্ডারকে বলতে পারতে না? নিয়ম লঙ্ঘন করার পিছনে কি যুক্তি দেখাতে পারো তুমি? আমার সাথে দেখা করার ব্যবস্থা করার জন্যে তুমি তোমার কমান্ডারকে অনুরোধ করোনি কেন? তা যদি করতে, তোমার সন্দেহ নিরসন করার জন্যে আমি তোমাকে জানাতে পারতাম যে মি. জামাল আরসালান বিখ্যাত একটা পাবলিক স্কুল থেকে এই স্টেশনে এসেছেন এবং তাঁর প্রতি আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস এবং আস্থা রয়েছে। কিন্তু তা না করে তুমি ব্যক্তিগত উদ্যোগে তদন্ত শুরু করেছ, যদিও সে অধিকার তোমার নেই। তুমি প্যালেস্টাইনী?'

'ইয়েস, স্যার।'

'মুক্তি বাহিনীতে যোগ দেওয়ার আগে কি করতে তুমি?'

'সাংবাদিকতা, স্যার।'

টেলিগ্রাম ফর্মে লেখা ঠিকানাটা দেখলেন তিনি। 'ডেলি সানে চাকরি করতে?'

'ইয়েস, স্যার।'

'আর এই দায়রা দাউদ, পত্রিকায় তার পজিশন কি?'

'নির্বাহী সম্পাদক, স্যার।'

একমুহূর্ত কি যেন চিন্তা করলেন উইং কমান্ডার। ডান পায়ের উপর থেকে বাঁ পা সরিয়ে নিয়ে সেটার উপর ডান পা তুলে দিলেন। প্রকাণ্ড লাল মুখটা কঠোর হয়ে উঠল তাঁর। কিন্তু কণ্ঠস্বর সেই আগের মত শান্ত, যেন দূর থেকে ভেসে আসছে। 'গোটা ব্যাপারটায় আমি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়েছি, গানার রানা। যে কারণে তোমার সন্দেহ জেগেছে সেটাকে আমি কোন কারণ বলেই মেনে নিতে পারি না, তা এতই তুচ্ছ। তোমার টেলিগ্রাম নিতান্তই দুর্ভাগ্যজনক। মি. জামাল আরসালান, একজন নিবেদিত প্রাণ লেবানীজ নাগরিক, উনিশশো সত্তর সালে একটা কমান্ডো হামলা প্রতিরোধ করতে গিয়ে ইসরায়েলি সেনাদের হাতে বন্দী হন। তখন তিনি সিরিয়ার একটা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছিলেন। একাত্তর সালে বন্দী বিনিময়ের সময় তেলআবিব থেকে তিনি লেবাননে ফিরে আসেন।' একটু বিরতি নিলেন উইং কমান্ডার তারেক হামেদী, তারপর বললেন, 'আগেই বলেছি, তার প্রতি আমাদের বিশ্বাস এবং আস্থার কোন অভাব নেই। তার সম্পর্কে অযথা মাথা ঘামিয়েছ বলে...' কথা শেষ না করে ঝট্ করে উঠে দাঁড়ালেন উইং কমান্ডার। 'মি. ফারুকী, উপযুক্ত ব্যবস্থা করার জন্যে এই ছোকরাকে আপনার হাতে ছেড়ে দিচ্ছি আমি। আমার স্টেশনে এই ধরনের ঘটনা ভবিষ্যতে ঘটুক তা আমি চাই না।'

উঠে দাঁড়াল ইয়াসির ফারুকী। 'ওদের যে কি ধাতুতে তৈরি করা হয়েছে, স্যার, আমি জানি না। এ ধরনের ঘটনা আর যাতে না ঘটে সেদিকে আমি নজর রাখব।'

কিন্তু রানার খেয়াল নেই ওদের কথায়। দ্রুত ভাবছে ও। পরমুহূর্তে ইতস্তত একটা ভাব ফুটে উঠল ওর চোখেমুখে। দরজার কাছে চলে গেছেন ইতিমধ্যে উইং কমান্ডার।

সব দ্বিধা ঝেড়ে ফেলল রানা। বলল, 'আমার একটা কথা, স্যার।'

নব ধরে দরজা খুলতে যাবেন, রানার কথা শুনে থমকে দাঁড়ালেন উইং কমান্ডার। ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি। ত্যক্ত কণ্ঠে বললেন, 'আবার কি?'

বুক টান করে দাঁড়িয়ে আছে রানা উইং কমান্ডারের চোখে চোখ। মৃদু, দৃঢ় গলায় বলল, 'এক, আমার অনুমতি ছাড়া দাউদ কখনও কোন তথ্য তার নিজের কাজে ব্যবহার করেনি, এক্ষেত্রেও তা সে করত না। সুতরাং, মি. আরসালান সম্পর্কে তথ্য জানতে চাওয়ায় কোন রকম ক্ষতির কারণ সৃষ্টি হতে পারত বলে মনে করি না আমি। দুই, সামরিক বাহিনীতে নাম লিখিয়েছি আমি, কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমার দেশের স্বার্থে নিজের বিবেচনায় যে পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন বলে আমি মনে করব তা গ্রহণ করার নাগরিক অধিকার হারিয়ে ফেলেছি। আমার সন্দেহের ভিত অন্যের কাছে খুব মজবুত বলে মনে না-ও হতে পারে, এ আমি জানতাম। সেই পর্যায়ে কর্তৃপক্ষের কানে কথাটা তোলার প্রশ্নই উঠতে পারে না। সন্দেহ নিরসনের জন্যে আমার সামনে একটিমাত্র পথই খোলা ছিল এবং সেটাই আমি গ্রহণ করেছিলাম।'

'তোমার দেশের স্বার্থ সুন্দর ভাবে রক্ষা পেতে পারত সন্দেহের ব্যাপারটা একজন সাংবাদিককে নয়, আমাকে জানালে।' ভঙ্গিটা এখনও শান্ত উইং কমান্ডারের, কিন্তু স্বরের একটা কম্পন রানার কানে ধরা পড়ল।

'সন্দেহ সন্দেহই, তা প্রতিষ্ঠিত কোন সত্য নয়। সাক্ষ্য-প্রমাণ বা তথ্য, কিছুই ছিল না আমার হাতে, কি নিয়ে যেতাম আমি কর্তৃপক্ষের কাছে? আমাদের ফাইটার অ্যারোপ্লেনগুলোকে অচল করে দেয়ার প্ল্যান তৈরি করেছে ইসরায়েল, এই খবর সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গিটাকে গুরুত্ব দেয়া হয়নি এ কথা মনে রেখে আমি যদি ভেবে থাকি মি. জামাল আরসালান সম্পর্কে সামান্য একজন গানারের সন্দেহকে কোন মূল্যই দেয়া হবে না তাহলে কি ভুল করেছি আমি?'

'কোন তথ্যের গুরুত্ব মূল্যায়ন করার ক্ষমতা তোমার চেয়ে অনেক বেশি রয়েছে আমাদের অফিসারদের। সাংবাদিক ছিলে এ কথা ভুলে গিয়ে তোমার শুধু মনে রাখা উচিত লেবানীজ আর্মির একজন গানার তুমি।' ইয়াসির ফারুকীর দিকে ফিরলেন তিনি। 'যে-কোন সিদ্ধান্তই তুমি নাও, এ ধরনের ঘটনা আবার ঘটে কিনা তা জানার জন্যে তোমার দিকে আমি নজর রাখব।'

'ইয়েস, স্যার! ভেরি গুড, স্যার...।' বলতে বলতে এগিয়ে গিয়ে উইং কমান্ডারের জন্যে দরজা খুলে দিল ইয়াসির ফারুকী।

'যে ভাবভঙ্গি দেখলে তুমি তাতে ক্ষতি যা হওয়ার তা আমারই হল,' ইয়াসির ফারুকী ফিরে এসে চেয়ারে ধপাস করে বসতে বসতে বলল, 'উইং কমান্ডারের ইচ্ছা তোমাকে আমি অন্য ট্রুপে অথবা এমন কি অন্য ব্যাটারীতে বদলি করি। কিন্তু এই মুহূর্তে অতটা করতে প্রস্তুত নই আমি।' পাইপটা ধরাল সে। 'তোমার শাস্তি হচ্ছেঃ খাওয়া আর গোসল করার সময় ছাড়া আটচল্লিশ ঘণ্টা এক মুহূর্তের জন্যেও নিজের সাইট ছেড়ে কোথাও নড়তে পারবে না তুমি। আগামী একমাস তোমার সব চিঠি বা

যোগাযোগের কাগজপত্র আমার এই অফিসে পাঠাতে হবে, আমি নিজে সেন্সর করব। টেলিফোন বন্ধ। পরিস্থিতি সম্পর্কে সার্জেন্ট সাইয়িদ হাকামকে নির্দেশ দেয়া হবে। ঠিক আছে। ডিসমিস!'

পাঁচ

একজন কয়েদীর অনুভূতি নিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে এল রানা। বিল্ডিংয়ের বাইরে একটা বেঞ্চের উপর বসে আছে কুতুব দীন আর আলী কাওসার। রানাকে দেখেই মুখের কথা আটকে গেল ওদের। রানার থমথমে মুখ দেখে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করল ওরা। কথা না বলে পাশ কাটিয়ে চলে এল রানা। অসহায় বোধটা চারদিক থেকে ওর উপর যেন চেপে বসছে। রাস্তা ধরে আপন মনে হাঁটতে শুরু করল ও। চিন্তার ভারে মাথাটা নুয়ে আছে।

হ্যাঙ্গারের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় ইঞ্জিনের কোন শব্দ পেল না ও। সেজেগুজে সন্ধ্যা নামছে চারদিকে। কোথাও কোন শোরগোল নেই। শুধু অফিসার্স মেসের দিক থেকে অস্পষ্ট শব্দ আসছে উদ্দাম সঙ্গীতের।

এছাড়া সর্বত্র অদ্ভুত, অস্বাভাবিক এক নিস্তব্ধতা। থমথম করছে পরিবেশটা, ঠিক যেন ঝড়ের আগের মুহূর্ত, মনে হল ওর। আগামীকাল বৃহস্পতিবার। কে জানে শুক্রবারে কি ঘটতে যাচ্ছে! মন বলছে, আক্রমণ হবে। কিন্তু নাবাতিয়া ফাইটার স্টেশন আক্রমণ করে ইসরায়েল কি ধরনের ফায়দা লুটতে চায়? অ্যারোড্রোমে প্লেন ল্যান্ড করাবে, আক্রমণটা তারই প্রস্তুতি? তা যদি হয়, শুক্রবারের পর যে কোন সময় হতে পারে জিরো আওয়ার।

হাত-পা বেঁধে দেয়া হয়েছে ওর, অনুভব করল রানা। তিক্ত একটা অনুভূতিতে ছেয়ে আছে মনটা। যা করার ছিল সবই করে দেখেছে ও, কাজ হয়নি কোন। করার মত কিছু কি আর আছে? কিন্তু ব্যাপারটা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানেই বা থাকতে দেয়া যায় কিভাবে? জামাল আরসালান তেলআবিবে এক বছর আটক ছিল। উইং কমান্ডার তাকে সন্দেহের ঊর্ধ্বে বলে মনে করতে পারেন, হয়ত রানার নিজেরও সন্দেহের মূলে কোন সত্য নেই। কিন্তু লোকটা তেলআবিবে ছিল শোনার পর থেকেই ওর সন্দেহ সড় সড় করে বেড়ে আকাশে গিয়ে ঠেকেছে। লেবাননের নাগরিক তো কি হয়েছে, অমন অনেক নাগরিকই ইসলায়েলের হয়ে কাজ করছে এদেশে। বিশেষ করে চরম দক্ষিণপন্থী খ্রীস্টানেরা। কোনকালে কোন দেশেই মীরজাফরের অভাব নেই।

ছাউনির কাছাকাছি পৌঁছে সিদ্ধান্তটা পাকা করে ফেলল রানাঃ থেমে থাকবে না সে। যেভাবে হোক জানার চেষ্টা করবে তার সন্দেহটা সঠিক কিনা।

কিন্তু কিভাবে—কিভাবে? সিদ্ধান্ত নেয়া এক কথা, আর সেটাকে কাজে পরিণত করা অন্য কথা। দুনিয়ার সাথে সকল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, থাকতে হবে নিজের সাইটে

নজরবন্দী হয়ে, এই অবস্থায় কি করতে পারে সে?

ছাউনিতে ঢুকে দেখল, ডিটাচমেন্টের প্রায় সবাই ফিরেছে। প্রায় ছ'টার মত বাজে এখন। যার যার বিছানা তৈরি করছে সবাই। মনে হলো, প্রত্যেকে জানে এরা কি ঘটেছে। এবং কিভাবে সে গ্রহণ করেছে ব্যাপারটাকে তা দেখার জন্যে চেয়ে আছে তার দিকে। নার্ভাস বোধ করল ও। সোজা নিজের বিছানার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। চোখ তুলে তাকাতেই চোখাচোখি হয়ে গেল পাশের বিছানার কাছে দাঁড়ানো জাফরীর সাথে। 'ব্যাটা বাঁটকুল কেন ডেকেছিল?'

'এমনি,' বলল রানা।

প্রসঙ্গটাকে টেনে আর লম্বা করার চেষ্টা করল না জাফরী। ছ'টার সময় পিটে গিয়ে অন্যান্যদের ছুটি দিল ওরা। কি এক অজ্ঞাত কারণে তখনও উদয় হয়নি কুতুব দীন। পিটে ওরা মাত্র চারজন, জাফরী, নঈম যাকের, কাফা আর ও নিজে। 'গওহর জুমলাত কোথায়?' জানতে চাইল ও। স্ট্যান্ড-টু-এর জন্যে দেরি করার লোক জুমলাত নয়।

'অফিসে গেছে,' জাফরী বলল।

চুপ করে গেল রানা। অ্যারোড্রোম ছাড়িয়ে দূরে চলে গেল ওর দৃষ্টি। পশ্চিমের আকাশ কি সুন্দর দেখাচ্ছে—সাদা চাদরের মত পরিষ্কার। খানিকপরই শুরু হবে রাত্রির মিছিল।

'বিক্রি করার মত বিড়ি আছে কারও কাছে?' গানপিটের সকলের উদ্দেশ্যে প্রস্তাব দিল কাফা।

হাসির হররা ছুটল ওদের মধ্যে। 'ফের?' বলল নঈম, 'এক সাথে বেশি করে কিনে রাখতে পারো না তুমি।'

'কি ভেবেছ, তোমাদের মত খুচ্ খুচ্ করে কিনি নাকি? একসাথে দশটা করে কিনি আমি।'

'তাহলে বলতেই হয়, খুব বেশি ধোঁয়া গিলছ তুমি।'

'এই একটা কথা ঠিক বলেছ, দোস্ত,' কণ্ঠস্বর শুনে বোঝা গেল নঈমের কথাটা পছন্দ হয়েছে কাফার। 'ক'টা বিড়ি খাই দিনে জানো? বিশটা!'

'সর্বনাশ! তার মানে হপ্তায় সত্তরটা করে সাপ্লাই পাচ্ছ আমাদের কাছ থেকে। তা দশটার জায়গায় একবারে বিশটা কিনলেই তো পারো।'

হঠাৎ খিক খিক করে হাসতে শুরু করল কাফা। তারপর হাসি থামিয়ে বলল, 'দোকানদার কি বাকি দেয়?'

'কিন্তু আমরা দিই এবং বাকির নাম ফাঁকি বলে মনে করে শোধও দাও না তুমি।'

মুচকি মুচকি হাসছে কাফা। 'সত্যি কথা বলতে কি, ওটাই আমার লাভ। তোমাদের মত বোকার দল থাকতে সব বিড়ি আমাকে কোনদিনই কিনে খেতে হবে না।'

'আমরা বোকা, না?'

'ওই দেখো, ঠাট্টাও বোঝো না তোমরা। অমনি রাগ করে ফেললে! দাও দেখি

কেউ একটা বিড়ি বা সিগারেট, ধরাতে না পারলে মরে যাব আমি।'

তার অনুরোধের উত্তরে কয়েক সেকেন্ড মৌনব্রত পালন করল সবাই। শুধু হাসতে থাকল নঈম যাকের।

'ঠিক আছে, দোস্ত,' আধ-খাওয়া একটা বিড়ির টুকরো বের করল কাফা। 'কেউ একটু আগুন দাও।'

'উঁহুঁ, ওটিও পাবে না তুমি!'

'দু'টান আমাকেও দেবে তো?' সেই মুহূর্তে গানপিটে পৌঁছে একটা দিয়েশলাই ছুঁড়ে দিল কুতুব দীন কাফার দিকে। ঠিক তারপরই তীক্ষ্ণ শব্দে বাজতে শুরু করল সাইরেন।

দেশলাইয়ের একটা কাঠি বারুদে ঘষতে গিয়ে থমকে গেল কাফা। মুখ তুলে তাকাল আকাশের দিকে। 'বেজন্মার দল!' বিড় বিড় করে বলল সে।

'সাবধান, কাফা!' মোটরসাইকেলে চড়ে এইমাত্র পৌঁছাল গওহর জুমলাত।

'আহ! আমি কি আর ধরাতে যাচ্ছি নাকি!'

বালির প্রাচীরে ঠেস দিয়ে মোটরসাইকেল দাঁড় করাল গওহর জুমলাত।

'অফিস থেকে এলে, তাই না?'

'গিয়েছিলাম,' বলল গওহর জুমলাত, 'কিন্তু এখন এলাম রেসতোরাঁ থেকে।'

কথা বলার সময় ওর দিকে তাকাল দু'বার গওহর জুমলাত, লক্ষ করল রানা কামানের কাছে গিয়ে সেফটি লিভার দেখতে লাগল সে। বাকি চারজন বেঞ্চে গিয়ে বসল।

প্রথম প্লেনটা অনেক উঁচু দিয়ে গেল, গুঞ্জনটা একেবারেই অস্পষ্ট। অনিশ্চিতভাবে এদিক ওদিক ছুটোছুটি করল সার্চলাইটগুলো। বালির বস্তার উপর হেলান দিয়ে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে রানা সেখানে এসে থামল গওহর জুমলাত। 'কি করেছ সঠিক জানি না, কিন্তু বেশ গোলমালেই জড়িয়ে পড়েছ বলে মনে হচ্ছে, রানা,' নিচু স্বরে বলল সে যাতে আর কেউ শুনতে না পায়। 'আটচল্লিশ ঘণ্টা ছাউনি এবং গানপিট ছেড়ে, খাওয়া এবং গোসলের সময় বাদে, কোথাও যাওয়া তোমার নিষেধ, আর তোমার সবরকম চিঠিপত্র আমার মাধ্যমে মি. ইয়াসির ফারুকীর কাছে পাঠাতে হবে—এসব তো জানোই, তাই না?'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

'তোমার ব্যাপারে আমি নাক গলাতে চাই না,' গওহর জুমলাত বলল, 'কিন্তু ব্যাপারটা আসলে কি তা যদি খুলে বলো আমাকে, বিবেচনার পর আমি তোমার সাজার মেয়াদ কমিয়ে দেয়ার জন্যে সুপারিশ করতে পারি। ফারুকী বোকা লোক নয়, রানা। কতটা স্নায়বিক চাপ সহ্য করে আমরা প্রতিটি সেকেন্ড বেঁচে আছি তা সে বোঝে।'

একটু ইতস্তত করে রানা বলল, 'ধন্যবাদ, জুমলাত। পরে হয়ত ব্যাপারটা নিয়ে তোমার সাথে আমি কথা বলব, কিন্তু এই মুহূর্তে, মানে…,' ঠিক কি বলবে ভেবে না পেয়ে চুপ করে গেল রানা।

'ঠিক আছে,' গওহর জুমলাত রানার পিঠে চাপড় মারল মৃদু। 'যখন তোমার ইচ্ছা হবে, বলো। কি রকম লাগছে তোমার তা আমি বুঝতে পারি।'

কিন্তু রানা বুঝতে পারল না ও কি করেছে বলে ভাবছে জুমলাত।

ঠিক তখনই রানা টের পেল, বেঞ্চের চারজন চোরা দৃষ্টিতে ওকে দেখছে। চারটে মাথা নুয়ে পড়েছে একই দিকে, কুতুব দীন কি যেন বলছে তিনজনকে উদ্দেশ্য করে। রানার মনে পড়ল কুতুব দীনকে আলী কায়সারের সাথে কথা বলতে দেখেছে ও অফিস বিল্ডিংয়ের বাইরে। চোরা চোখে তাকাতে রানার সাথে চোখাচোখি হয়ে গেল কাফার। 'কথাটা সত্যি নাকি, দোস্ত?'

'কোন্ কথাটা সত্যি, কাফা?' জানতে চাইল রানা।

'কুতুব বলছে, ইসরায়েলি পাইলট নাকি তোমাকে বলেছে শুক্রবার দিন আমাদের এই জায়গাটাকে গায়েব করে দেয়া হবে, সত্যি?'

'গায়েব করে দেয়া হবে একথা আমি বলিনি,' প্রতিবাদ জানাল কুতুব দীন।

'বলেছ রেইড করা হবে, কেমন?' রানার দিকে ফিরল কাফা। 'লোকটার সাথে কথা বলেছ তা তো আর অস্বীকার করতে পারবে না তুমি। নিজের চোখে দেখেছি, কানে শুনেছি। বাপ-মার দোষ, ইংরেজি শেখায়নি। তা শেখালে ওদের দুটো গাল দেয়ার সুযোগ কি ছাড়তাম? যাই বলো, লোকটার সাথে তুমি যখন কথা বলছিলে, দেখে আমার মনে হচ্ছিল, কতদিনের পুরানো বন্ধু তোমরা। শুক্রবারের কথা কি বলেছে সে? বলেছে রেইড হবেই?'

মিছে ভান করার প্রয়োজন দেখল না রানা। 'হ্যাঁ,' বলল ও।

'শুক্রবারের কথাই বলেছে? ঠিক শুনেছ?'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

'কি মুশকিল দ্যাখো দিকিনি! শুক্রবার তো আগামী কালই! কিন্তু শনিবারে যে আমার চুল কাটার দিন, তার কি হবে?'

'তোমার মনে হয় লোকটা সত্যি জানে কিছু?' জাফরী প্রশ্ন করল রানাকে।

'বলতে পারব না। সম্ভবত বাহাদুরি দেখাবার জন্যে বলেছে। হয়ত আমাদের ভয় দেখাতে চেয়েছিল।'

'আমি বলব, একটুও ভয় পাইনি আমরা তাতে,' মন্তব্য করল কাফা। 'কিন্তু, তাই বলে, আগামীকাল! সবাইকে এখানে বসে থাকতে হবে, অপেক্ষায় থাকতে হবে সত্যি কিছু ঘটে কিনা দেখার জন্যে—কী সাংঘাতিক ভাবো একবার!' হঠাৎ কপালে উঠে গেল তার ভুরু জোড়া। 'ছাউনি ছেড়ে নড়তে না পারার সাজা—কেন?'

প্রশ্নটা সরাসরি করল কাফা, তার স্বভাবই এই। কোন উত্তর দিল না রানা। অস্বস্তিকর একটা নীরবতা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে থাকল। একসময় সেটা ভাঙল গওহর জুমলাত। পাইলট আর কি বলেছে, জানতে চাইল সে। দু'চারটে কথা বলল রানা। জুমলাত শুনল অন্যদিকে তাকিয়ে, শোনার পর কোন মন্তব্য করল না। আর সবাইও চুপ করে থাকায় নতুন আর একটা নীরবতা লম্বা হয়ে উঠতে লাগল।

'ইংরেজি তুমি শিখলে কিভাবে?' আচমকা জানতে চাইল কাফা, অনেকটা জবাবদিহি চাইবার ভঙ্গিতে।

হেসে উঠতে গিয়েও পারল না রানা। প্রশ্নটা স্রেফ কৌতূহলের কারণে নয়, করা হয়েছে সন্দেহের কারণে।

জবাব না পেয়ে কাফা যেন মরিয়া হয়ে উঠল, 'তুমি কি হিব্রুও জানো?'

তুমি কি ইসরায়েলি গুপ্তচর, এই প্রশ্নটাই ঘুরিয়ে করল কাফা—মনে হল রানার। কিন্তু আর চুপ করে থাকা যায় না, থাকলে সরাসরি প্রশ্ন করতে ইতস্তত করবে না সে। 'হ্যাঁ, জানি,' বলল রানা। 'সাংবাদিকদের যত বেশি সম্ভব ভাষা শিখতে হয়।'

মহা ভাবনায় পড়ে গেল যেন কাফা। ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল সে এদিক ওদিক। তারপর আপন মনেই যেন বলল, 'এদিকে আবার বিপদেও জড়িয়ে পড়েছ···আচ্ছা, পাইলটটার সাথে কথা বলার সাথে বিপদটার কোন সম্পর্ক নেই তো?'

'না,' বলেই রানা ভুলটা বুঝতে পারল। অস্বাভাবিক দ্রুত উত্তরটা দিয়ে ফেলেছে। পরমুহূর্তে অনুভব করল পলকের মধ্যে গোটা পরিবেশটা সন্দেহের বিষ বাষ্পে ভরাট হয়ে গেছে। অ্যারোড্রোমের গ্রাউন্ড ডিফেন্স-এর বিশদ তথ্য শত্রুপক্ষকে জানাবার অপচেষ্টা করেছে কেউ—একথা ও একাই মনে রাখেনি, বুঝতে পারল রানা। সকলের শ্যেন দৃষ্টি টের পেল ও। প্রত্যেকের ঘৃণা যেন স্পর্শ করতে চাইছে ওকে। সারাক্ষণ উত্তেজিত স্নায়ুর চাপের মধ্যে মানুষ পরিষ্কার, ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করতে পারে না; তার উপর, ভাবল রানা, যারা অনেকদিন একসাথে রয়েছে তাদের মধ্যে নতুন অপরিচিত কেউ এলে তাকে সহজে বিশ্বাসী হিসেবে ধরে নেয়া খুব কম লোকের পক্ষেই সম্ভব। নিজের সঙ্গহীন অবস্থাটা হাড়ে হাড়ে টের পেল রানা। সতর্ক না হলে ওর নিজের ডিটাচমেন্টই গোলমাল করবে, সেই সাথে গোঁয়ার্তুমি শুরু করবে কর্তৃপক্ষ।

'আগে কখনও দেখেছ তুমি লোকটাকে?' প্রশ্নটা করল নঈম।

হঠাৎ কুপোকাত্ করার জন্যে প্রশ্নটা করা হয়েছে, বুঝতে অসুবিধে হল না রানার। 'কোন্ লোকটাকে?'

'ইসরায়েলি পাইলট, আবার কাকে?'

'না,' বলল রানা।

'অমন হৃদয় উজাড় করে কথা বলার কারণ কি তার?' নঈম যাকেরের প্রশ্ন।

কুতুব ভেবেচিন্তে জিজ্ঞেস করল, 'সত্যি বলছ তো আর কিছু বলেনি সে তোমাকে!'

'এসব কথা জিজ্ঞেস করা নিরর্থক,' বলল কাফা। 'কি করার আছে আমাদের, বলো, ও যদি অস্বীকার করে?'

প্রত্যেকের প্রশ্নের উত্তরে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাচ্ছে রানা। গায়ে যেন পেরেক ঠুকছে ওরা।

'লোকটাকে আরও কিছু বলোনি তো?'

বিমূঢ় বোধ করল রানা। তারপর হঠাৎ প্রসঙ্গটার মোড় ঘুরিয়ে দিল জাফরী একটা

কথা বলে। 'আশ্চর্যের ব্যাপার হলো এই যে নাফাস কাবির শুক্রবার দিন বিশেষ ছুটি চেয়ে দরখাস্ত করেছে।'

'কেন! কেন?'

'তার চাচা না কে যেন কবরে বদলী হবে।'

'চাচাকে কবর দেয়া হবে, তার জন্যে ছুটি!' কাফা চিৎকার জুড়ে দিল। 'অথচ, আমি জানি, আমার মা মরে গেলেও আমি ছুটি চেয়ে পাব না।'

'আচ্ছা, দরখাস্তটা কি মঞ্জুর করা হয়েছে?' নঈম যাকের জানতে চাইল।

'হয়েছে। বারো ঘন্টা বরাদ্দ করা হয়েছে তাকে।'

'তার মানে শুক্রবার দিন বিপদমুক্ত থাকবে নাফাস।'

'বাজি রেখে বলতে পারি আমি, শত্রুপক্ষকে তথ্যটা পাচার করেছে সেই।'

'আন্দাজি কারও বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ কোরো না, কাফা,' ধমক লাগাল গওহর জুমলাত।

'কিন্তু তুমি কি অস্বীকার করতে পারো যে ছুটিটা চাওয়া হয়েছে···অন্তত, স্বীকার করো তো যে···।'

নঈম যাকেরকে থামিয়ে দিয়ে গওহর জুমলাত বলল, 'এটা একটা দুর্ঘটনা, যা ঘটতেই পারে। কারও বিরুদ্ধে যদি কিছু বলারই থাকে, তার সামনে বলো না কেন তোমরা, তাহলে সে-ও তার বক্তব্য হাজির করার সুযোগ পায়।'

'কিন্তু, কারও বিরুদ্ধে আমি তো কিছু বলিনি,' বিড় বিড় করল কাফা। 'মনে সন্দেহ জাগলে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করব বৈকি! সন্দেহ জাগার অধিকার তো আমার কেউ কেড়ে নিতে পারে না।'

জামাল আরসালান, ভাবল রানা, কোথায় থাকবে শুক্রবার দিন? সকাল হলেই আরও একটা দিন কমে যাবে, আর পাঁচদিন পর কোর্ট মার্শাল হবে আতাসীর। অসহায় বন্দীর মত বুকের ভিতর অস্থির হয়ে উঠল মনটা ওর।

ওদের আলোচনার বিষয় এখন নতুন স্কোয়াড্রন। আজ বিকেলেই এসে পৌঁছেচে তারা 62A স্কোয়াড্রনের জায়গা দখল করতে।

'হ্যাঁ, যুদ্ধ একটা দেখিয়ে গেল বটে সিক্সটি-টু-এ স্কোয়াড্রন।' এমন কি কাফা পর্যন্ত প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

নাবাতিয়ায় আড়াই মাস ছিল স্কোয়াড্রনটা। ফ্রন্টলাইনের একটা ফাইটার স্টেশনে আড়াই মাস থাকা দীর্ঘ সময় বৈকি। এই আড়াই মাসে তারা সত্তরটারও বেশি শত্রু-বিমান ধ্বংস করেছে। মেরুদণ্ড নিজেদেরও অটুট নেই, প্রায় গুঁড়ো হয়ে গেছে গোটা স্কোয়াড্রন—তাই ছুটিতে যাচ্ছে তারা। নতুন স্কোয়াড্রনের নাম 85B। 62A-এর মত এদেরও রয়েছে মিগ বহর। নতুন স্কোয়াড্রন সম্পর্কে ওরা কেউ কিছু জানে না এখনও। সার্জেন্টস মেসে গওহর জুমলাত সন্ধ্যার দিকে গিয়েছিল একবার, শুনে এসেছে বৈরুতের এয়ার ফাইটার স্টেশনে কৃতিত্বের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করে ছুটি কাটাচ্ছিল দলটা, ছুটি শেষ হওয়ার আগেই দলের একটা অংশ জরুরী তলব পেয়ে চলে

এসেছে নাবাতিয়ায়।

'সবাই বলাবলি করছিল স্কোয়াড্রন লিডার নাকি আমাদের দুর্ধর্ষ পাইলটদের অন্যতম। উইং কমান্ডার তারেক হামেদী তার নাম দিয়েছেন ক্রেজি ডেভিল। যুদ্ধে রওনা হওয়ার সময় নাকি গান গাইতে দেখা যায় তাকে। পাইলটরা তাই তাকে নাইটিঙ্গেল বলে ডাকে। নাম, ইউনুস মেহের।'

'ইউনুস? ইউনুস মেহের?' নামটা শোনামাত্র শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল রানার।

'হ্যাঁ। চেনো নাকি তুমি?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না যাকে চিনি এ সেই কিনা। কায়রোয় কিছুদিন ছিলাম আমি, তখন পরিচয় হয়েছিল বিমান বাহিনীর একজন মেহেরের সাথে। প্রায় বছর দশেক আগের কথা। এ লোক সে-ই কিনা কে জানে।'

আসল ব্যাপারটা ওদের জানাবার নয়। একটা অ্যাসাইনমেন্টে কায়রো থেকে ইসরায়েলে যেতে হয়েছিল ওকে, সাথে মিশ্রী খান, আতাসীও ছিল। পাইলট ওদের ইসরায়েলের পার্বত্য এলাকায় প্যারাশ্যুট দিয়ে নামার সুযোগ করে দেয়। তিনটের বেশি কথা বলেনি তার সাথে রানা। মিশরীয় বিমান বাহিনীর সেই পাইলটের নাম ছিল ইউনুস মেহের। সহকর্মীরা তাকে নাইটিঙ্গেল বলত কিনা তা অবশ্য জানা নেই ওর।

সময় থাকতে সাবধান হওয়া উচিত, ভাবল রানা। স্কোয়াড্রন লিডার যদি ওর পরিচিত ইউনুস মেহেরই হয়, ওকে গানার হিসেবে দেখে আকাশ থেকে পড়বে সে। সকলের সামনে যদি বিস্ময় প্রকাশ করে কিছু বলে ফেলে, ভণ্ডুল হয়ে যাবে সব। যদি জানাজানি হয়ে যায় প্যালেস্টাইনী নয় ও, পেশায় আসলে একজন স্পাই, তাহলে গ্রেফতার, কোর্ট মার্শাল এবং ফায়ারিং স্কোয়াডের ঝামেলা চুকতে ছয় ঘণ্টার বেশি লাগবে না। প্রাণে বাঁচার জন্যে সত্যকথনেও কোন ফল ফলবে না, পরিষ্কার জানে রানা। বিশ্বাস করবে না ওর কথা কর্তৃপক্ষ। তাছাড়া, নিজের বক্তব্যের সমর্থনে কাউকে সাক্ষী দাঁড় করাবার উপায় নেই রানার। যারা ওর হয়ে সুপারিশ করলে প্রাণ রক্ষা পাবে তারা রাজনৈতিক এবং সামরিক নানান জটিল বাধা বিঘ্নের কারণে সুপারিশ করা তো দূরের কথা, ওকে চেনে বলে স্বীকারই করবে না। প্রাণের ঝুঁকি আছে একথা জেনেই, শুধু আতাসীকে বাঁচাবার জন্যে, ফাইটার স্টেশন নাবাতিয়ায় এসেছে রানা। পরিচয় যদি প্রকাশ হয়েই পড়ে, আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন উপায় নেই ওর। মুখ বুজে মেনে নিতে হবে ফায়ারিং স্কোয়াডকে।

'বৈরুতে ওরা ক'টা প্লেন ধ্বংস করেছে শুনেছ কিছু?'

'তা শুনিনি,' বলল গওহর জুমলাত। 'তবে, বললাম না, আগের সব রেকর্ড ভঙ্গ করেছে ওরা। নিজেদের সম্পর্কে নাকি ওদের খুবই উঁচু ধারণা।'

'উঁচু ধারণা থাকা ভাল কথা,' বলল জাফরী, 'কিন্তু এদ্ দায়রায় যে স্কোয়াড্রনটা শেষবার এসেছে তারাও নিজেদের সম্পর্কে নিচু ধারণা পোষণ করত না বলে শুনেছি। ওই বৈরুত থেকেই এসেছে ওরাও। কিন্তু বড় ঝাঁকের সাথে ডগ্-ফাইটিংয়ের অভিজ্ঞতা তাদের ছিল না। পৌঁছুবার দিন রাতেই হেন করেঙ্গা তেন করেঙ্গা বুলি ছেড়ে

গরম করে তুলেছিল অফিসার্স মেস। পরদিন সকালেই উড়ল ওরা, এবং সোজা দেড়শো স্টার ফাইটারের মাঝখানে ঢুকে গেল। একটাকেও ঘায়েল করতে পারল না, কিন্তু স্কোয়াড্রনের অর্ধেক খুইয়ে কোনরকমে পালিয়ে এল অ্যারোড্রোমে। এই তো ওদের নিজেদের সম্পর্কে উঁচু ধারণা!'

স্ট্যান্ড-টু-এর বাকি সময়টা মোটামুটি স্বস্তির সাথেই কাটল। কয়েকটা মাত্র প্লেন এল উপরে, কিন্তু নাগালের মধ্যে নয় একটাও। দশটার সময় দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে ছাউনিতে ফিরে গিয়ে সোজা বিছানায় লম্বা হয়ে পড়ল গোটা ডিটাচমেন্ট।

ঘুম থেকে জাগিয়ে দিয়ে রানাকে জানানো হলো পৌনে একঘণ্টা আগে 'অল ক্লিয়ার' প্রত্যাহার করা হয়েছে। ঘুমন্ত গানারদের নাক ডাকার শব্দে ছাউনির ভিতরটা গমগম করছে। একটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি এখনও। ওদের ডিটাচমেন্টের প্রথম গার্ড রানা, পোশাক পাল্টে গানপিটে চলে এল ও। আকাশে মেঘ দেখে কেন যেন ভাল লাগল না ব্যাপারটা ওর। কিন্তু চাঁদ উঠেছে, আর তার আলোয় আবছাভাবে আলোকিত হয়ে আছে রাতটা।

'তেমন কিছু ঘটেছে নাকি?' তাইয়েব সায়ানীকে জিজ্ঞেস করল রানা। দ্বিতীয় ডিটাচমেন্টের তরফ থেকে সে-ও একজন গার্ড, রানা এসে পড়ায় এখন তার ছুটি।

'সতর্ক সঙ্কেত চালু থাকার সময় তেমন কিছু ঘটেনি,' চিকন গলায় বলল সায়ানী। 'মাথার ওপর দিয়ে মিছিলের পর মিছিল গেছে শুধু। উত্তর দিকে কয়েকটা ফ্লেয়ার ফেলেছে, ঘটনা বলতে এইটুকু।'

'ওদের উদ্দেশ্য ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, তাই না?'

'খুব অস্বাভাবিক লাগছে। ওদের এই নিস্পৃহ ভাবটা গত দশ বারো দিন থেকে দেখছি। এই ক'দিনে মাত্র একবারই ছোঁ মারতে এসেছিল। কি জানো, কিছু না ঘটলে ভাল লাগে না। ঘর ছেড়ে যুদ্ধক্ষেত্রে এসেছি কেন, রোমাঞ্চের লোভেই তো!' হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল সায়ানী, তারপরই বলল, 'এগুলো ধরো এবার, যাই আমি।'

'রাইফেল আর টর্চ রেখে বিদায় হলো সায়ানী'।

অন্ধকারে রানা একা। রাজ্যের চিন্তা ঢুকছে মাথায়। শান্ত সময় বয়ে যাচ্ছে আপন গতিতে। কোথাও আলো নেই, শব্দ নেই, নড়াচড়া নেই। আসব আসব করছে যে ভয়ঙ্করী ঝড় তার পূর্বাভাসে থমথমে ভাবটা আরও যেন জমাট বেঁধেছে। ওদের ছাউনির নিচে, ঢালুর উপর তৈরি করা কাঁটা-তারের বেড়া পাহারা দিচ্ছে সেন্ট্রি, মাঝে মাঝে তার নড়াচড়ার শব্দ ভেসে আসছে কানে। আর কোন শব্দ নেই কোথাও।

দুটো বাজতে বিশ মিনিট—রিস্টওয়াচ দেখে চোখ তুলতেই শব্দ শুনল রানা একটা প্লেনের। মুহূর্তে মুহূর্তে বাড়ছে শব্দটা। খুব নিচু দিয়ে দ্রুতবেগে ছুটছে। ঝন ঝন শব্দে ফোন বাজল। ছোঁ মেরে তুলে নিল রানা রিসিভার। ফোনে প্লট জানিয়ে দেয়া হবে এক্ষুণি। কিন্তু গানপিটে সবাইকে ডেকে নিয়ে আসার আগেই হিংস্র শকুনটা স্টেশনের উপর পৌঁছে যাবে।

অপারেশন কন্ট্রোলরুমের অপারেটর ঘুম জড়ানো গলায় এক এক করে সবগুলো

গানপিট থেকে সাড়া আদায় করল। তারপর পাইকারী ঘোষণা দিল সে, 'আমাদের একটা মিগ ল্যান্ড করতে আসছে।' পরমুহূর্তে বাতাসের দিকে মুখ করে রানওয়ে বরাবর চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বল আলোর একটা মোড়কের মত জ্বলে উঠল ফ্লেয়ার-পাথ।

মেঘের গা ফুটো করে এরপর বেরিয়ে এল প্লেনটা। নেভিগেশন লাইট জ্বলছে। অনেক উঁচু থেকে গোত্তা খেয়ে সোজা নামছে সেটা কামানের দিকে। বুকের রক্ত ছলকে উঠল রানার, স্কোয়াড্রন লিডার কন্ট্রোল হারিয়ে ফেলেছে নাকি! তিনশো গজ কাছে চলে এসেছে···আড়াইশো গজ···দুশো গজের ভিতর এসে হঠাৎ সমান্তরাল হয়ে ফ্লেয়ার-পাথের দিকে একটু কাত হয়ে রানার ঠিক মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল প্লেনটা। এগজস্টের পেছন দিকে আগুনের শিখা দেখতে পেল রানা। পরক্ষণে প্লেনটা আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠল ফ্লেয়ার-পাথে প্রবেশ করে। মুগ্ধ দৃষ্টিতে ডিগবাজি খেতে দেখছে রানা। অত্যন্ত সহজ ভঙ্গিতে, উচ্চতা এতটুকু না খুইয়ে অদ্ভুত নৈপুণ্যের সাথে ডিগবাজি খাচ্ছে প্লেনটা। বিজয়োল্লাসের এমন চমৎকার প্রদর্শন খুব কমই চোখে পড়েছে রানার। মুহূর্তের জন্যে রূপোলী পাখিটার গা ঝিলিক দিয়ে উঠল, তারপরই ফ্লেয়ার-পাথের পিছনের অন্ধকার গ্রাস করল তাকে।

উদ্বেগ আর ক্লান্তি থেকে যেন মুক্তি পেল রানা। ফাইটার স্টেশন নাবাতিয়া এই প্রথম রাতের বেলায় ঘায়েল করেছে একটা শত্রু বিমান। অ্যারোড্রোমের দক্ষিণে আবার দেখল রানা মিগটাকে, একটা বৃত্ত রচনা করছে ধীরে ধীরে। ওর পিছন দিয়ে ঘুরে ফ্লেয়ার-পাথের ওপারে হারিয়ে গেল আলপিনের মাথার মত দুটো আলো। একটা লাল, আরেকটা সবুজ। তারপর হঠাৎ দু'দিকে অনড় ডানা মেলে দিয়ে ফ্লেয়ার-পাথের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তের দিকে ছুটে আসতে দেখা গেল সেটাকে। ব্রেকের কর্কশ আওয়াজের সাথে প্রতি মুহূর্তে কমছে গতি। রানওয়ের শেষ মাথায় গিয়ে ঘুরল সেটা, মাঠের উপর দিয়ে ফিরে এসে ওদের সাইটের একশো গজ উত্তরে ডিসপারসাল পয়েন্টের কাছে থামল। ক'মিনিট পর রানা দেখল রাস্তা ধরে ধীরে ধীরে হেঁটে আসছে পাইলট নাইট গ্লাস চোখে তুলে দেখতে লাগল তাকে ও। ফ্লাইং স্যুট পরে আছে বলে মুখটা দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু চওড়া কাঁধ আর লম্বা হাত দুটো পরিচিত বলেই মনে হলো।

দ্রুত ভেবে নিল রানা পরিস্থিতিটা। একান্ত গোপনে ইউনুসের চমক ভাঙার এমন সুবর্ণ-সুযোগ আর পাওয়া যাবে না। রাস্তার গানপিটের দিকের কিনারা ধরেই এগিয়ে আসছে সে, মাত্র কয়েক গজ দূর থেকে ওর সামনে দিয়ে হেঁটে যাবে ইউনুস।

আধ মিনিট আরও ভাবল রানা পরিচয় জানবেই ইউনুস আগে বা পরে, লুকিয়ে থাকা সম্ভব নয়। পরিচয় জানার পর কি প্রতিক্রিয়া হবে তার, কাউকে না জানাবার ওর অনুরোধ সে রাখবে কিনা, কিছু জানা নেই রানার। পরিচয় জানলে বিপদ ঘটতেই পারে, কিন্তু বিপদের ঝুঁকিটা যথাসম্ভব আগে এবং নিজে থেকে নেয়াই ভাল।

'স্কোয়াড্রন লিডার ইউনুস মেহের?'

'ইয়েস,' থমকে দাঁড়াল ইউনুস।

এগিয়ে গিয়ে স্যালুট করল রানা। 'চিনতে পারো, ইউনুস?'

এক ঝটকায় হেলমেটটা মাথার পিছনে সরিয়ে দিল স্কোয়াড্রন লিডার ইউনুস মেহের।

'মেজর রানা!'

'চুপ!' চাপা স্বরে বলল রানা। 'আমি এখানে গানার হিসেবে কাজ করছি…।'

'হোয়াট!' অবাক বিস্ময়ে রানার আপাদমস্তক দেখল ইউনুস।

'আস্তে, ইউনুস। বিশেষ একটা কারণেই গানার হিসেবে এই স্টেশনে ঢুকতে হয়েছে আমাকে। কেন, তা জিজ্ঞেস করো না…।'

'কিন্তু…ওঃ, বুঝেছি!' চাঁদের আলোয় উজ্জ্বল দেখাল ইউনুসের মুখ। 'আপনি একজন স্পাই, তার মানে।'

'হ্যাঁ, তার মানে, তাই,' বলল রানা। 'কিন্তু আমার পরিচয় এখানে কেউ জানে না। জানলেই বিপদে পড়ব। তুমি…।'

'আমি?' স্কোয়াড্রন লিডার হাসল। 'আপনার পরিচয় আমার জানা আছে নাকি যে প্রকাশ করে দেব? আপনি আমার ছোটবেলার বন্ধু, একসাথে স্কুলে পড়েছি, একবার খেজুর চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে এমন মার খাই দু'জনে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম খেজুরের একটা বাগান নিজেরাই তৈরি করব—কি, মনে নেই এসব কথা?'

স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে রানা বলল, 'কিন্তু এখানের অনেকে জানে তোমার সাথে আমার পরিচয় হয়েছিল বৈরুতে…।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঠিক তাই,' এগিয়ে এসে রানার হাত ধরল ইউনুস। 'আপনার সাথে…।'

'আপনি নয়, তুমি।'

'কী অদ্ভুত যোগাযোগ, তাই না বন্ধু? তোমার সাথে এইরকম জায়গায় দেখা হয়ে যাবে তা স্বপ্নেও কি ভেবেছি?'

কেউ জিজ্ঞেস করলে কি বলতে হবে তা নিয়ে মিনিট দুই আলোচনা করল ওরা। রানা তাকে টেনে এনে বসাল বালির তৈরি প্রাচীরের উপর। 'প্রথম আকাশে উঠেই আজ যা দেখালে, সত্যি মুগ্ধ হয়েছি। অদ্ভুত ওই ডিগবাজিটার অর্থ কি, একটা শত্রু-বিমানের অকাল মৃত্যু?'

'হ্যাঁ,' শিশুর মত ঝরঝর করে হেসে উঠল ইউনুস। 'ভাগ্যটা আমার খুব ভাল। দু'হাজার ফুটে একটা মাত্র পাতলা মেঘের স্তর ছিল। সেটার ওপর উজ্জ্বল ধবধবে চাঁদের আলো। ওরা যে পথে আসছিল সেখানে পৌঁছানোর জন্য বিশ হাজার ফুট উঠে গেলাম। অনুমান করেছিলাম, নির্দিষ্ট একটা রুট যখন ব্যবহার করছে ওরা, অ্যারোড্রোমের ওপরে অপেক্ষা করলে আগে বা পরে একটাকে দেখতে পাবোই। কয়েক মিনিটও অপেক্ষা করতে হলো না, একটা টু-সীটার লাইট বম্বার, ইংলিশ ইলেকট্রিক ক্যানবেরা নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে একেবারে আমার সামনে চলে এল। পাশ কাটিয়ে চলে যেতে দিয়েই ডিগবাজি খেয়ে ধাওয়া করলাম ওটাকে। বিশ্বাস করো, ফায়ার করার

সময় হাসি পাচ্ছিল আমার। লক্ষ্য যে ব্যর্থ হবে, তার কোন উপায়ই ছিল না। গুলি লাগার পরপরই পেট্রল ট্যাঙ্ক ফেটে তাতে আগুন ধরে গেল। এরপর লোভে পড়ে আরও কিছুক্ষণ আশপাশে ঝুলতে থাকে, কিন্তু কপাল মন্দ, একটাও আর চোখে পড়ল না।'

রিস্টওয়াচ দেখল রানা।

'হ্যাঁ, যাই এবার,' হাসতে হাসতে বলল ইউনুস। 'তা না হলে আমার খোঁজে সার্চ পার্টি পাঠাবে আবার ওরা।'

'খুব খুশি হয়েছি তোমাকে এখানে দেখে,' বলল রানা।

বালির বস্তার উপর থেকে নামল ইউনুস, 'রানা, নতুন করে দেখা হওয়া উপলক্ষে আমার সাথে খাচ্ছো কবে তুমি?'

'ধন্যবাদ, ইউনুস,' বলল রানা। 'কিন্তু ক্যাম্পের বাইরে যাওয়া নিষেধ আমাদের, তাছাড়া, আটচল্লিশ ঘণ্টার জন্যে ছাউনি-বন্দী হয়ে আছি আমি।'

'সে কি! তার মানে, এর মধ্যেই তুমি জড়িয়ে পড়েছ...?'

ইতস্তত করল রানা। তারপর দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে সংক্ষেপে সব কথা খুলে বলল, শুধু আতাসীর ব্যাপারে একটা শব্দও উচ্চারণ করল না।

'ইসরায়েলি একজন এজেন্টের কাছে গ্রাউন্ড ডিফেন্স প্ল্যান পাওয়া গেছে, এ খবরটা আমিও শুনেছি। প্ল্যানটা নাকি এমন একজনের তৈরি, নানান ধরনের দুষ্প্রাপ্য তথ্য যার আয়ত্তের মধ্যে।'

'জামাল আরসালানের পক্ষে এ ধরনের তথ্য অনায়াসে সংগ্রহ করা খুবই সম্ভব। কিন্তু ওর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ কিছুই নেই আমার হাতে। ওকে আমি সন্দেহ করি, ব্যস্ এইমাত্র।'

'ছোটখাট, টিপটপ ভদ্রলোক, মাথা ভর্তি কোঁকড়ানো পাকা চুল—এই লোকটাই তো জামাল আরসালান?'

'হ্যাঁ। সারাক্ষণ ফিটফাট হয়ে থাকে। মুখে হাসিটি লেগেই আছে।'

'ঠিক ধরেছি তাহলে। আজ রাতে 'স্পিনিং হুইলে' পরিচয় হয়েছে ওর সাথে আমার। গেছ কখনও ক্লাবটাতে? কি যেন নাম মেয়েটার...মনে করতে পারছি না...।'

'শাফা?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, শাফা। সাথে এই মেয়েটি ছিল।'

'কারও সাথে কথা বলতে দেখেছ তাকে?'

'হ্যাঁ, এদ্ দায়রার দু'জন লোকের সাথে অনেকক্ষণ ধরে কথা বলতে দেখেছি জামাল আরসালানকে। তবে প্রায় সারাক্ষণই সে ওই শাফার সাথেই কাটায়।'

রানা হঠাৎই দিল প্রস্তাবটা, 'বৈরুতের ডেলী সান পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদককে একটা মেসেজ পাঠাতে চাই আমি। এ ব্যাপারে আমাকে তুমি সাহায্য করতে পারো, ইউনুস?'

'কিন্তু ফোন করা তো এখন খুব কঠিন আর টেলিগ্রাম যা দেরিতে যায়।' ইতস্তত করতে লাগল ইউনুস। তারপর বলল, 'তবে আগামীকাল সন্ধ্যায় সাইদার দিকে যেতেও

পারি আমি, ঠিক নেই। যদি যাই, ওখান থেকে তোমার বন্ধুকে আমি ফোন করতে পারি। কি বলতে হবে?'

'বলতে হবে সে যেন জামাল আরসালান সম্পর্কে যত খানি সম্ভব তথ্য সংগ্রহ করে।'

'ঠিক আছে, টেলিফোন করব আমি। নম্বর?'

রানা টেলিফোন নম্বরটা বলল। তারপর পুরো কেতা-কায়দার সাথে স্যালুট করল ইউনুসকে। হাসি চাপতে চাপতে ঘুরে দাঁড়াল ইউনুস।

ছাউনিতে ফিরে নঈম যাকেরকে জাগিয়ে দিল রানা, এখন থেকে পাহারা দেয়ার পালা তারই। বিছানায় শুতে না শুতে ঘুমিয়ে পড়ার কথা; কিন্তু ঘুম এল না কিছুতেই। ইউনুস টেলিফোনটা করবে তো?

কখন ঘুম এসে ওর সচেতনতা কেড়ে নিয়ে গেল জানতেই পারল না রানা। ঠিক সাড়ে সাতটার কিছু পরে কয়েকজন মিস্তিরির চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে গেল ওর। চোখ মেলে দেখল দু'জন মিস্তিরি ছাউনিতে ঢুকে জানালার ভাঙা কাঁচ সরিয়ে নতুন কাঁচ লাগাচ্ছে। খুব মন্থর গতিতে পুরো সচেতনতায় ফিরে আসছিল রানা, এমন সময় হঠাৎ আজ বৃহস্পতিবার মনে পড়ে যেতেই সটান উঠে বসল ও।

গানপিটের কাছে দাঁড়িয়ে আছে ইফফাত। দূর থেকে তাকে হাসতে দেখে ভাল লাগল রানার।

'আমি দুঃখিত,' সামনে গিয়ে দাঁড়াতে ইফফাত বলল, 'শুনলাম সেই টেলিগ্রামটা নিয়ে বিপদে পড়েছ তুমি।' চোখাচোখি হতে দৃষ্টিতে সহানুভূতি অনুভব করল রানা।

'দুঃখিত আমার হওয়া উচিত,' বলল রানা। 'আমিই আসলে বিপদে ফেলে দিয়েছি তোমাকে।'

ইফফাত হাসল আবার। 'ঠিক তা নয়। পোস্ট মাস্টার টেলিগ্রামটা পড়ে যখন চোখ গরম করে আমার দিকে তাকায় তখনই আমি বুঝে নিই, সন্দেহ হয়েছে তার। প্রেরকের র‍্যাঙ্ক জানতে চাইল সে। বললাম। ঠিক মত যাতে পাঠানো হয় সে ব্যাপারে নজর রাখবে, বলল বটে, কিন্তু আমার সন্দেহ তাতে কাটেনি। ফিরে আসছি, তখন পরিচিত একজন পাইলটের সাথে দেখা। লিফট দিয়ে অ্যারোড্রোমে পৌঁছে দিল সে। শহরে যাচ্ছে শুনে মাথায় ঢুকল বুদ্ধিটা। অনুরোধ করতেই তোমার বন্ধুকে টেলিফোন করে মেসেজটা জানিয়ে দিতে রাজি হয়ে গেল। নিরাশ করবে বলে মনে করি না।'

'বাহ্!' বলল রানা। 'ধন্যবাদ।' কিন্তু ইউনুস মেহেরকেও ও যে এই একই অনুরোধ করেছে তা আর জানাল না ইফফাতকে। মনটা হালকা হয়ে গেল ওর। ডেলী সানের দায়রা দাউদ দু'দুটো মেসেজ পেয়ে ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে ভুল করবে না।

'আরও কিছু জানো নাকি তুমি?'

'না,' বলেও খানিকক্ষণ ইতস্তত করল রানা। শাফার কথা ভাবছে ও। মেয়েটার সম্পর্কে জানার চেষ্টা করে লাভ আছে কিছু? 'আচ্ছা, শাফার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক

কেমন?'

'ভালই তো।' হাসল ইফফাত।

'কাল রাতে স্পিনিং হুইল ক্লাবে জামাল আরসালানের সাথে ডিনার খেয়েছে ও।'

'ওঃ,' বলল ইফফাত, 'ক্লাবটা চিনি।'

'শাফা আর জামাল আরসালানের সম্পর্ক কতখানি ঘনিষ্ঠ বুঝতে পারছি না। চেষ্টা করলে তুমি ওর কাছ থেকে অনেক কিছু জেনে নিতে পারো।'

'হয়ত। কিন্তু...কি?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা আপন মনে। কি জানতে বলবে ও ইফফাতকে? 'ঠিক কি, তা জানি না। এমন কিছু যা আমাদের সাহায্য করে। অন্তত আগামীকাল আরসালান এখানে থাকছে কিনা—এ খবরটুকু।'

'যতটুকু পারি করব,' ফর্সা, গোল হাত তুলে সোনালী রিস্টওয়াচ দেখল ইফফাত। 'এবার যেতে হয়...।'

'তোমাকে ঝামেলায় ফেলার জন্যে সত্যি আমি দুঃখিত, ইফফাত। তুমি যদি না চাও...।'

'শুধু শুধু মন খরাপ করছ তুমি। কি জানো, ব্যাপারটার সাথে নিজেকে জড়াতে পেরে আসলে ভালই লাগছে আমার। তবে, আরও সাবধান হওয়া উচিত আমাদের,' শেষ শব্দটা জোর দিয়ে উচ্চারণ করল ইফফাত, মনে হলো রানার। খানিক ইতস্তত করল. তারপর রানার দিকে মুখ তুলে বলল, 'তোমার ধারণা যদি সত্যি হয়, আমার বিশ্বাস, তোমার বন্ধু দাউদ বিশেষ কোন তথ্য যোগাড় করে দিতে পারবে না। স্পাইরা পিছনের পায়ের ছাপ মুছেই তারপর সামনে এগোয়। এই অ্যারোড্রোমের বাইরে যতই খোঁজ করো, বিশেষ কিছু পাবে বলে মনে হয় না। যদি কিছু থাকে, এর ভেতরই তা আছে।'

একমত হতে পারল না রানা। কিন্তু যুক্তি খাড়া করতে গিয়ে বুঝল, ইফফাতের ধারণাটাই ঠিক। আক্রমণ করা হবে এমন সব অ্যারোড্রোমগুলোর মধ্যে এটাও যদি একটা হয় তাহলে কবে, কখন, কিভাবে আক্রমণ হবে অর্থাৎ গোটা প্ল্যানটা এখানেই কারও না কারও কাছে থাকার কথা।

'খোঁজ নিয়ে আমাকে জানাতে পারবে, ইফফাত, আরসালান আজ সন্ধ্যায় নিজের কোয়ার্টারে থাকবে কিনা?' প্রশ্নটা করেই পরমুহূর্তে ইতস্তত করল রানা, 'না। খুব বেশি চাওয়া হয়ে যাচ্ছে তোমার কাছে।'

'কি যে বলো!'

'এডুকেশন্যাল ইনস্টিটিউটে থাকে ও, তাই না?' ইফফাত মাথা ঝাঁকাতে আবার বলল রানা, 'ভাবছি, ওর রূমে একবার টুঁ মেরে দেখলে কেমন হয়? হয়ত পাব না কিছু, কিন্তু...'

'বিপজ্জনক কাজ, রানা। ধরা পড়লে...'

'ধরা পড়লে? সে দেখা যাবে—'

আপত্তি করতে গিয়ে কি ভেবে নিজেকে সামলে নিল ইফফাত। বলল, 'ঠিক আছে। আটটায় ডিউটি আমার, তার আগে যদি কিছু জানতে পারি, তোমার গানপিট পর্যন্ত হাঁটতে হাঁটতে চলে আসব। যদি জানতে পারি যে রুম ছেড়ে কোথাও বেরুচ্ছে না সে, তাহলে আসব না।'

'সুন্দর আইডিয়া। তোমার অপেক্ষায় থাকব আমি। অজস্র ধন্যবাদ, ইফফাত।'

গালে টোল ফেলে হাসল ইফফাত। 'গুড লাক।' ফিসফিস করে বলল সে। 'কি ঘটে না ঘটে আমাকে বলতে ভুল করো না যেন।'

রাস্তা ধরে ফিরে যাচ্ছে ইফফাত, একবারও পিছন ফিরে তাকাল না।

তুমুল বাক-যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে ছাউনির ভিতর। অফিস থেকে এইমাত্র খবর নিয়ে এসেছে গওহর জুমলাত, এখন থেকে তিন ইঞ্চি কামানের টিমকে গানপিটেই খাবার সংগ্রহ করতে হবে। খাবার আসবে ট্রুপ ভ্যানে, লাঞ্চ প্যাকেটের মত সবাই পাবে একটা করে। গানাররা অধিকাংশই এই নতুন ব্যবস্থার বিরোধী। তাদের অসন্তোষের একমাত্র কারণ, সাইটের কাছ থেকে নিয়মিত দূরে সরে যাবার যে স্বাধীনতা ছিল এতে তা ক্ষুণ্ন হবে। কিন্তু খাবারের জন্যে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে রোদে পোড়ার চেয়ে এ বরং ভালই হয়েছে, ভাবল রানা। কিন্তু এই ব্যবস্থার ফলে এখন থেকে শুধু গোসল করার জন্যেই ছাউনি থেকে দূরে যেতে পারবে ও।

'এরপর দেখা যাবে রানার মত আমাদের সবাইকে ছাউনিতে আটক রাখা হবে,' ঝাঁঝের সাথে বলল নঈম।

'কখন ভ্যান আসবে তার জন্যে অপেক্ষা করা? অসহ্য! তারপর বরফের মত ঠাণ্ডা রুটি! যা হয় হবে, আমি মেসে গিয়েই খাব; অন্তত দুপুরের খাবারটা তো বটেই!'

'না, জাফরী, তা হবে না,' গওহর জুমলাত বলল, 'আসলে ভাল দিকটা বিবেচনা করে তবেই এ-সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। মাত্র অর্ধেক লোক রেখে গানপিট থেকে কোথাও যাতে যেতে না হয় তার জন্যেই এ-ব্যবস্থা।'

হৈচৈটা থেমে গেল সহসাই। গাড়ির শব্দ শুনেছে সবাই। ভ্যান দেখতে বেরিয়ে গেল কেউ কেউ। ভ্যান থেকে প্যাকেট যখন বেরুল, কারও মুখে কথা নেই একটাও। খাবার যে শুধু গরম তাই নয়, মান এবং পরিমাণও আগের চেয়ে অনেক বেশি সন্তোষজনক।

ভরপেট খেয়ে বিছানায় চিৎ হলো রানা। আয়েশ করে সিগারেট ধরাল একটা। ক্লান্তি লাগলেও অদ্ভুত একটা আরাম অনুভব করছে ও। সিগারেটটা তখনও শেষ হয়নি, আলী কায়সার ঢুকল ছাউনির ভিতর। হাতে কাগজপত্র। 'পুরানোগুলোর বদলে নতুন অ্যারোড্রোম পাস। জমা দিয়ে নতুন একটা করে নিয়ে যাও।'

অ্যারোড্রোমে অবাঞ্ছিতদের আনাগোনা বন্ধ করার জন্যে এই নতুন ছাড়পত্র। ওর বিছানার পাশে স্যুটকেসটার উপর পড়ে আছে ব্যাটল ড্রেসটা, সেটা থেকে আর্মি পে-বুক বের করল রানা। পুরানো পাসটা ওরই পিছনের পকেটের ভিতর পাওয়া গেল।

সেটা বের করে আনার সময় বেরিয়ে পড়ল আরেকটা ভাঁজ করা কাগজের টুকরো।

ভুরু কুঁচকে উঠল রানার। কি ওটা? কোত্থেকে এল। মনেই পড়ছে না পে-বুকের পকেটে কখন ওটা রেখেছে। রেখেছে নিশ্চয়ই, নইলে এল কোত্থেকে?

ভাঁজ খুলে কাগজটায় চোখ বুলিয়ে জিনিসটা কি বুঝতে পারল রানা। ঠাণ্ডা একটা স্রোত বয়ে গেল ওর শরীরে। কাগজটায় যদি ওর মৃত্যুদণ্ডের রায় লেখা থাকত, কিংবা মুখ তুলেই যদি দেখত ওর দিকে রিভলভার তাক করে ট্রিগার টিপে দিচ্ছে কেউ, এতটা ভয় পেত না রানা। স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে আছে ও কাগজটার দিকে। দু'চোখে অবিশ্বাস আর আতঙ্ক।

ছয়

'কি ওটা?'

কানে শব্দ দুটো ঢুকতে আপনা থেকেই দ্রুত নড়ে উঠল রানার হাত। চোখের পলকে কাগজটা উল্টো করে ফেলল ও। অনুভব করল, চমকে উঠে মারাত্মক ভুল করে ফেলেছে।

একহাত সামনে দাঁড়িয়ে আছে নঈম।

'কিছু না, একটা চিঠি,' যথাসম্ভব নিরাসক্ত গলায় বলল রানা।

'চিঠি? বড় অদ্ভুত চিঠি!'

জিনিসটা পুরানো একটা ডায়াগ্রাম, ব্যাখ্যা করে বলবার জন্যে মুখ খুলল রানা। পরমুহূর্তে বন্ধ করল সেটা। যা খুশি ভাবুক নঈম, এ ব্যাপারে একটা শব্দও উচ্চারণ করতে পারছে না ও। নঈমের চোখের দিকে চেয়ে থাকল তীব্র দৃষ্টিতে। উত্তেজনায় টান টান হয়ে আছে শরীরের পেশী। আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল নঈম, কিন্তু আলী কায়সার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে পুরানো পাসটা চাইতে, ঘুরে দাঁড়িয়ে চলে গেল সে। সম্ভবত ভুলেও গেল সেই সাথে ব্যাপারটা, আশা করল রানা। পুরানোটা বদলে নতুন একটা পাস নিল ও। ওর আর্মি পে-বুকের পকেটে ভাঁজ করে রেখে দিল সেটা। বাঁ হাতের মুঠোর ভিতর ঘামে ভিজছে সেই কাগজটা এখনও। এক টুকরো আগুন যেন ধরে রেখেছে ও, পুড়িয়ে দিচ্ছে হাতের চামড়া। ছাউনির সকলের দৃষ্টি ওর মুখের উপর স্থির হয়ে আছে, মনে হলো ওর। কিন্তু চোরা-চোখে একবার চারদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিতে স্বস্তি বোধ করল, নতুন পাস নিয়ে জায়গা মত রেখে দিতে ব্যস্ত সবাই। হ্যাঙ্গারে ব্যাটল-ড্রেসটা ঝুলিয়ে রাখছে নঈম, গুনগুন করে গান গাইছে সে।

নিঃশব্দে, ধীরে ধীরে, বিছানার উপর উঠে বসল রানা। দ্রুত চোখ বুলিয়ে আর একবার দেখে নিল সবাইকে। কেউ লক্ষ্য করছে না ওকে। নামবার সময় ক্যাচ ক্যাচ করে শব্দ করে উঠল বিছানাটা। নিঃশব্দ পায়ে এগোল রানা পিছনের দরজাটার দিকে। ঘামের ফোঁটায় ভর্তি হয়ে গেছে মুখ। গনগনে আগুন বলে মনে হচ্ছে নিজের

শরীরটাকে।

ল্যাভেটেরীর ভিতর আলো কম দেশলাইয়ের একটা কাঠি জ্বেলে কাগজটা ভাল করে দেখল আবার। কাটাকুটি দাগের মত রানওয়েসহ গোটা ল্যাণ্ডিং গ্রাউন্ডটা আঁকা রয়েছে কাগজটায়। হ্যাঙ্গার, মেস, কোয়ার্টার, ছাউনি, গান-সাইট—ফাইটার স্টেশনের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ অংশের বিবরণ রয়েছে নকশাটায়। সাধারণ নীল কালিতে নিপুণ হাতে আঁকা হয়েছে প্রতিটি জিনিস। এমন কি টেলিফোন ওয়্যারিঙ এবং গান-সাইটের কাছে গোলাবারুদের স্টোরগুলোও বাদ পড়েনি। অ্যামুনিশন ডিপোগুলোও নিখুঁত ভাবে আঁকা। তথ্যগুলো শত্রুপক্ষের জন্যে অমূল্য, এক নজরে যে-কেউ বুঝতে পারবে। একজন ইসরায়েলি এজেন্টের কাছে ঠিক এই ধরনের একটা নকশা মাত্র কিছুদিন আগে পাওয়া গেছে—সুতরাং, ভাবল রানা, ওকে যদি সার্চ করে এটা পাওয়া যেত, সেই এজেন্টেরই দোসর বলে ধরে নেয়া হত বিনা দ্বিধায়।

সময় মত যদি চোখে না পড়ত…ভাবতে গিয়ে শিউরে উঠল রানা। আরেকটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালল ও। কাগজটাকে নিঃশেষে পুড়তে দেখে স্বস্তি আর মুক্তির একটা স্বাদ অনুভব করল অন্তরে।

কিন্তু বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না অনুভবটা। ব্যাপারটার অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে পেরেছে ও। শত্রু ওকে চিনে ফেলেছে।

ইসরায়েলি পাইলটের দেয়া তথ্যের ব্যাপারে আর কোন সন্দেহ নেই রানার। বুঝল, জামাল আরসালান সম্পর্কে ওর সন্দেহটা অমূলক নয়, নাবাতিয়া ফাইটার স্টেশনে সে সঙ্গীহীন একাও নয়।

ধারাল ক্ষুরের উপর দাঁড়িয়ে আছে, পরিষ্কার অনুভব করল রানা। যে-কোন সময়, যে কোন দিক থেকে ওকে লক্ষ্য করে বিপদের জাল ছুঁড়ে দেয়া হতে পারে। নিজেকে স্থির রাখতে চাইল ও। ছাউনিতে ফিরে যেতে হবে ওকে এমন একটা ভাব নিয়ে যেন কিছুই হয়নি। মাথা ঠাণ্ডা করে ভাবতে চেষ্টা করল, আর্মি পে-বুকে ডকুমেন্টটা ঢুকল কিভাবে? ও যখন ঘুমিয়ে ছিল তখনই কি ঘটেছে ব্যাপারটা? তাহলে জামাল আরসালানের লোক এই ডিটাচমেন্টেই আছে। অথবা, বাইরের কোন লোকের কাজও হতে পারে। ডিটাচমেন্টের কেউ ওর ব্যাটল ব্লাউজে হাত যদি দেয়ও সবার চোখকে ফাঁকি দেবে সে কিভাবে? গানপিট থেকে একা কেউ ছাউনিতে ফিরতে পারে না, কিছু যদি করতেই হয় সকলের উপস্থিতিতেই তা করতে হবে তাকে।

সকালের স্বল্পক্ষণ স্থায়ী সতর্ক-সঙ্কেতের সময়টায় সবচেয়ে বেশি সুযোগ ছিল, মনে হলো রানার। টেক-পোস্টের ঘোষণা শুনে শুধু শার্ট গায়ে দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল ও, ব্যাটল-ব্লাউজটা পড়ে ছিল বিছানাতে। তখন ছাউনি ছিল নির্জন।

হঠাৎ চোখ খুলে গেল ওর। হ্যাঁ, মনে পড়ছে, ছাউনিতে ডিটাচমেন্টের কোন লোকই ছিল না, ও যখন বেরিয়ে যায়। সবাই গানপিটে। কিন্তু দু'জন মিস্ত্রিরি ছিল ভিতরে। তাদের একজনকে সাইকেল চালিয়ে চলে যেতেও দেখেছে ও, ভিতরে তখন ঐ মিস্ত্রিরিটা ছিল যাকে ওর মনে হয়েছিল খ্রীস্টান।

পরিষ্কার বুঝতে পারল রানা, ওই সময় এবং ওই লোকটাই কর্মটি করে গেছে। ওদের পাঠানোই হয়েছিল এই কাজটা দিয়ে। যে জানালার কাঁচ গত তিনমাস ধরে ভাঙা তা হঠাৎ বদলাবার কারণটা পরিষ্কার বোঝা গেল এতোক্ষণে। তবে এই ঘটনায় প্রমাণিত হলো নির্ভুল পথেই এগোচ্ছে ও।

ছাউনিতে নতুন এক মানুষ হয়ে ফিরল রানা। আত্মবিশ্বাস লেখা রয়েছে ওর চোখেমুখে। কিন্তু চোখ তুলে কেউ তাকালই না ওর দিকে। বেশিরভাগ লোকই বিছানায় লম্বা হয়ে আছে, সিগারেট ফুঁকছে অথবা ইতিমধ্যে নাক ডাকতে শুরু করে দিয়েছে।

শুধু বসে আছে জাফরী। আঙুলের ফাঁকে সিগারেট। পা নাচাচ্ছে। রানাকে দেখে দাবা খেলবে কিনা জানতে চাইল। মাথা ঝাঁকিয়ে রাজি হলো রানা। মুখোমুখি বসে খেলা শুরু করল ওরা। ঘোড়ার সাহায্যে জাফরীর মন্ত্রীর হাত-পা বেঁধে নিয়ে রাজাটাকে কোণঠাসা করে একটা বড়ে দিয়ে যখন চেক দিয়েছে রানা, তখনই দরজা খুলে গেল।

'পার্টি, পার্টি, অ্যাটেনশন!'

ভিতরে ঢুকল ইয়াসির ফারুকী, সাথে উইং কমান্ডার তারেক হামেদী। ওদের পিছু পিছু চোরের মত ঢুকল আরও একজন লোক, দেখেই চিনতে পারল রানা, সেই মিস্তিরিটা, যাকে খ্রীস্টান বলে সন্দেহ করেছিল ও।

'গওহর জুমলাত কোথায়?' নাটকীয় ভঙ্গিতে প্রশ্ন করল ইয়াসির ফারুকী।

'নিজের কামরায়, স্যার,' কোন গুরুতর ব্যাপার ঘটেছে অনুমান করে তড়াক করে বিছানা থেকে লাফ দিয়ে নেমে স্যালুট করল বম্বারডিয়ার সাইয়িদ হাকাম। 'এক্ষুণি ডেকে আনছি!' ছুটল সে।

ছাউনির একপ্রান্তে ছোট্ট একটা আলাদা কামরায় থাকে সার্জেন্ট। বিশ সেকেন্ড পর এলোমেলো চুলে আঙুল চালাতে চালাতে দ্রুত হেঁটে আসতে দেখল তাকে রানা। ঘুম লেগে রয়েছে এখনও চোখেমুখে, আরও যেন অল্প বয়েসী দেখাচ্ছে তাকে।

'আইডেনটিফিকেশন প্যারেড, সার্জেন্ট জুমলাত,' গমগম করে উঠল নিস্তব্ধ ছাউনি। 'আমি চাই সবাই এক লাইনে পাশাপাশি দাঁড়াও!'

'ভেরি গুড, স্যার,' জুমলাত দ্রুত ঘুরল আধ পাক, 'বম্বারডিয়ার হাকাম, রাইট মার্কার!'

সাইয়িদ হাকাম ছাউনির মাঝখানে গিয়ে অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়াল।

'এক লাইনে দাঁড়াও!' কানের পর্দা ফাটিয়ে দেয়ার উপক্রম করল জুমলাতের গলার আওয়াজ।

নির্বিকার উইং কমান্ডার একধারে দাঁড়িয়ে আছেন দু'কোমরে হাত রেখে। জীবন্ত কোন প্রাণী, তা বোঝার কোন উপায়ই নেই, এমন কি চোখের পাতাও যেন তাঁর পাথরের তৈরি।

ছুটোছুটি করে ওরা সবাই এক লাইনে পাশাপাশি দাঁড়াল। জুমলাত চেঁচিয়ে উঠল আবার, 'ডিটাচমেন্ট, ডিটাচমেন্ট অ্যাটেনশন!'

'থ্যাঙ্কু, সার্জেন্ট! এখন...' মিস্তিরিটার দিকে ঘুরল ইয়াসির ফারুকী, 'দেখো, দেখে

বলো কে সেই লোক।' তারপর গওহর জুমলাতকে বলল, 'গানারের ইউনিফর্ম পরা এক লোক নাকি পোস্ট-অফিসের এই মিস্তিরিটাকে অপারেশনস লাইন বসানো সম্পর্কে নানারকম সন্দেহজনক প্রশ্ন করেছে।'

খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে রানা, পেশীগুলো টান টান। স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ সামনের দেয়ালের নির্দিষ্ট একটা জায়গায়। কি এবং কেন এসব ঘটছে, জানে ও। ঠিক দেখল না, অনুভব করল, লোকটা ওর সামনে দাঁড়িয়ে পড়েছে। মৃদু কণ্ঠে বলল সে, 'মনে হয় এই লোকটাই, হুজুর।'

'কে ও? রানা? ইশ!' চোখের কোণ দিয়ে দেখল রানা, ইয়াসির ফারুকী C. O. নাবাতিয়ার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। 'হুঁ, রানা, কি বলার আছে তোমার এ ব্যাপারে?'

'কোথাও কোন ভুল হয়েছে, স্যার,' কোনরকমে শুধু ঠোঁট জোড়া নেড়ে বলল রানা। 'এ লোককে কখনও আমি দেখিনি। টেলিফোন লাইন বসানো সম্পর্কে কোন প্রশ্নও করিনি আমি।'

'কিন্তু লাইন যে বসানো হয়েছে তা তুমি জানো?'

'নিশ্চয়ই জানি, স্যার। ক্যাম্পের কোন লোকেরই জানতে বাকি নেই এতদিনে।'

'কাল রাত সাড়ে সাতটা থেকে আটটা পর্যন্ত কি করেছ?'

'রেস্তোরাঁয় ছিলাম, স্যার, সার্জেন্ট জুমলাত জানে।'

'কথাটা ঠিক, সার্জেন্ট জুমলাত?'

'ইয়েস, স্যার। ওকে ও-সময় আমি দেখেছি!'

এখনও কি তুমি মনে করো এই-ই সেই লোক, এরাফিন?' মিস্তিরিটাকে প্রশ্ন করল ইয়াসির ফারুকী। ধীরে ধীরে কালো মুখটা তার লালচে হয়ে উঠছে।

'আমার তো তাই মনে হচ্ছে,' এরাফিনের কণ্ঠস্বর শুকনো ঠেকল রানার কানে। 'সঠিক বলতে পারব না। ওর মুখটা ছায়ায় ঢাকা ছিল। আর সময়ের ব্যাপারেও ঠিক কিছু বলা সম্ভব নয়। ঘড়ি দেখিনি তখন।'

'তুমি সুপার ক্যান্টিনে গিয়েছিলে কাল রাতে?' রানার দিকে ঘুরে হঠাৎ সরাসরি প্রশ্ন ছুঁড়ল ইয়াসির ফারুকী।

'গিয়েছিলাম, স্যার।'

'আই সি! কখন?'

'আটটার কিছু পরে স্যার,' বলল রানা 'খাকের নঈম আর কুতুব দীন ছিল আমার সাথে।'

'হুঁ। কিন্তু এই লোকটার সাথে তুমি কথা বলোনি?'

'না, স্যার। সারাক্ষণই এদের সঙ্গে ছিলাম আমি।'

'এরাফিন দাবি করছে, একজন গানার তাকে ক্যান্টিনে দেখে কাছে ডেকে নানান প্রসঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করে, এই ঘটনার পরপরই ও তাকে একটা কাগজে কিছু লিখতে দেখেছে। সেই গানার হিসেবে ও এখন তোমাকে সনাক্ত করছে। যে সময়ের

কথা বলছে ও সে-সময়ে ক্যান্টিনে ছিলে বলে তুমিও স্বীকার করছ।' ইয়াসির ফারুকী যাকের নঈমের দিকে রক্তচক্ষু ফেলল। 'ক্যান্টিনে সারাক্ষণ তোমাদের সাথেই ছিল রানা? সারাক্ষণ? ঠিক মনে আছে, ছিল?'

'যতদূর মনে পড়ে, ছিল, স্যার।'

'ওকে যে সবাই পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছে না, ব্যাপারটা আরও একবার উপলব্ধি করতে পারল রানা, সংক্ষেপে হ্যাঁ বললেই পারত নঈম, কিন্তু তা না বলে একটা ফাঁক রাখল ইচ্ছা করেই।

অনিশ্চিতভাবে চেয়ে আছে ইয়াসির ফারুকী রানার দিকে। কি করবে ভেবে পাচ্ছে না সে। 'তুমি বুঝতে পারছ, রানা, তোমার বিরুদ্ধে এটা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর একটা অভিযোগ?'

'ইয়েস, স্যার! কিন্তু এ অভিযোগের কোন ভিত্তি নেই। সম্পূর্ণ মিথ্যা একটা ব্যাপার। এ লোককে আমি জীবনে কখনও দেখিনি।'

মিস্ত্রী এরাফিনের দিকে ফিরল ইয়াসির ফারুকী। রাগে ফেটে পড়বার মত অবস্থা হয়েছে তার। 'এই ব্যাটা, অভিযোগ জানাতে এসে লোক চিনতে পারিস না কেন? ঠিক করে বল, এই-ই সেই গানার কিনা, নিশ্চয় করে বলতে না পারলে তোর অভিযোগ ঢুকিয়ে দেব, শালা, তোর পেছন দিয়ে।'

পিন-পতন স্তব্ধতা। রানার মুখে বার দুই তাকিয়ে যেন মনস্থির করতে চাইল মিস্ত্রী। মুখ খুলে কিছু বলতে গিয়ে আবার বন্ধ করে ফেলল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সমস্ত দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে বলল, 'হ্যাঁ, এখন আমার মনে হচ্ছে, এই-ই সে। আমাকে বিদায় করে দিয়ে খসখস করে কি যেন লিখছিল বা আঁকছিল একটা কাগজে, ঘাড় ফেরাতেই দেখতে পেয়েছিলাম। আমার মনে হয়, খুঁজলেই সেটা পাওয়া যাবে ওর কাছে।'

'কিন্তু তোমার সাথে কথাবার্তার সাথে কাগজে কিছু লেখার সম্পর্ক কি? তুমি জানলে কিভাবে···?'

'জানি না সেজন্যেই তো ওকে সার্চ করতে বলছি। কাগজটা পাওয়া গেলে সম্পর্ক আছে কিনা বোঝা যেত।'

'ইয়াসির ফারুকী অসহায় ভাবে তাকাল উইং কমান্ডারের দিকে। মহীরুহের মত দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। কোমরে দু'হাত রাখায় তাঁর শরীরের দু'পাশে বিরাট আকারের দুটো ত্রিভুজ তৈরি হয়েছে। সামান্য একটু নাড়লেন তিনি মাথাটা।

'অলরাইট,' ইয়াসির ফারুকী রানার দিকে তাকাল। 'তোমাকে সার্চ করা হবে। কোন আপত্তি আছে?'

'না, স্যার,' যেন আহত বোধ করছে এমনি কণ্ঠে বলল রানা, 'কিন্তু দায়িত্বজ্ঞানহীন বাজে একটা লোকের কথায় গুরুত্ব দিয়ে আমাকে সন্দেহ করা হচ্ছে বলে তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি আমি।'

'বুঝি। আমার কাছেও গোটা ব্যাপারটা তেতো ঠেকছে।'

*

গওহর জুমলাতের দিকে তাকাল সে। 'তুমি রানার ব্যাগব্যাগেজগুলো দেখবে, সার্জেন্ট? প্রত্যেকটা কাগজের টুকরো পড়ে দেখতে হবে। চোরা কোন পকেট যেন নজর না এড়ায়। রানা, তুমি আমার সাথে সার্জেন্টের রুমে চলো। আমি নিজেই তোমার বডি সার্চ করব।'

কোনরকম ঝুঁকি নিল না ইয়াসির ফারুকী। তার সার্চ করার নৈপুণ্য দেখে মনে মনে প্রশংসা না করে পারল না রানা। বুঝল, ও যে কোন অন্যায় করেনি তা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে নিজেকে সন্তুষ্ট করতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ সে।

ঝামেলা চুকতে রানা দেখল স্বস্তির একটা ভাব ফুটে উঠেছে ইয়াসির ফারুকীর চোখেমুখে। লোকটাকে যেন নতুন করে চিনতে পারল রানা। বদমেজাজী, কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু অধঃস্তনদের প্রতি আস্থা এবং ভালবাসার কোন অভাব নেই তার মধ্যে।

'আমার নির্দেশ, ব্যাপারটা সবাই ভুলে যাবার চেষ্টা করবে, দরজার দিকে ঘুরল ইয়াসির ফারুকী। কিন্তু উইং কমান্ডার তারেক হামেদী নিজের জায়গা ছেড়ে একচুল নড়ছেন না দেখে পা বাড়াতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে রইল সে। 'স্যার!'

রানার শরীরে ভয়ের একটা স্রোত বয়ে গেল। তারেক হামেদী এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন ওর দিকে। দৃষ্টি সরাতে গিয়েও সরাল না রানা। কোনরকম দুর্বলতা প্রকাশ করতে সায় দিল না মন। যা খুশি ভাবুক C. O.।

সাত, কি সতেরো সেকেন্ড, ঠিক বলতে পারবে না রানা, একটানা চেয়েই থাকলেন উইং কমান্ডার। রানার অন্তর ভেদ করে কি দেখলেন তিনিই জানেন, গম্ভীর থমথমে লাল মুখটা দেখে কিছুই বুঝল না রানা। হঠাৎ আধ পাক ঘুরে গট গট করে এগোলেন, বেরিয়ে গেলেন ছাউনি থেকে। তাকে অনুসরণ করার জন্যে প্রায় ছুটতে শুরু করল ইয়াসির ফারুকী।

এতক্ষণে ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করল মিস্ত্রী এরাফিন। প্রচণ্ড একটা ঘুসি মেরে তার নাকটা থেঁতো করে দিতে এগোচ্ছিল রানা, কিন্তু অতি কষ্টে সামলে নিল নিজেকে শেষ মুহূর্তে। লোকটার দু'চোখে নৈরাশ্যের গাঢ় ছায়া ফুটে উঠেছে, হঠাৎ রানার দিকে চেয়ে কি দেখল সেই জানে, ভয় পেয়ে দ্রুত পিছিয়ে গেল এক পাশে, তারপর দরজার দিকে ঘুরে হন হন করে হাঁটতে শুরু করল।

ওরা বেরিয়ে যেতে রানা ভাবল, জামাল আরসালানের একজন অনুচরকে চেনা হলো, এইটুকুই লাভ। এরাফিনের সাথে অল্পবয়েসী যে মিস্ত্রীটা এসেছিল কাঁচ বদলাতে, সে-ও হয়ত এদেরই দলের লোক। ওর আর্মি পে-বুকে এরাই ডায়াগ্রামটা রোপন করে গিয়েছিল আজ সকালে।

ছাউনির ভিতর অস্বাভাবিক নীরবতাটা হঠাৎ যেন স্পর্শ করল রানাকে। বুঝতে পারল, ব্যাপারটা নিয়ে তুমুল আলোচনা শুরু করার জন্যে মনে মনে ছটফট করছে সবাই, কিন্তু ওর সামনে মুখ খুলতে সাহস পাচ্ছে না কেউ। ধীর কিন্তু দৃঢ় ভঙ্গিতে হাঁটতে শুরু করল রানা। সোজা দরজা খুলে বেরিয়ে এল বাইরে। পিছন থেকে কাফার

অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর কানে ঢুকল ওর, 'তোমরাই বলো, একজন বেঈমান কি অমন বুক ফুলিয়ে হাঁটতে পারে…?'

বাইরে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরাল রানা। তীব্র রোদে ঝাঁ ঝাঁ করছে চারদিক। জামাল আরসালান তাহলে এইভাবেই ফাঁসিয়েছে আতাসীকে, ভাবতে ভাবতে গানপিটের দিকে এগোল ও। দৃঢ়-প্রতিজ্ঞায় কঠোর হয়ে উঠল ওর মুখের চেহারা।

রানাকে দেখেই এয়ার সেন্ট্রি আব্রাহাম দাহার প্রশ্ন করল, 'কি ঘটল ছাউনিতে? স্বয়ং কমান্ডার এসেছিলেন—ব্যাপারটা কি?'

ব্যাটল-ব্লাউজটা খুলে বালির বস্তাগুলোর উপর রাখল, তারপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল সেগুলোর উপর রানা। যেন শুনতে পায়নি দাহারের কথা। প্রশ্নটা আবার করতেই তার দিকে চোখ গরম করে তাকাল রানা। 'ওখানে যাও, সব জানতে পারবে,' ছাউনির দিকে আঙ্গুল নির্দেশ করল ও। 'সকলের ধারণা আমি একজন ইসরায়েলি গুপ্তচর।'

নড়ল না দাহার। শুধু আরও যেন শক্ত করে ধরল হাতের রাইফেলটা। একদৃষ্টে চেয়ে থাকল রানার দিকে।

চোখ বুজল রানা। মনে হলো, ভাগ্য নিতান্ত প্রসন্ন বলেই এখনও গ্রেফতার হয়নি ও। আগামীতে ভাগ্য এতটা অনুকূল নাও হতে পারে। জামাল আরসালান একবার ব্যর্থ হয়েছে, তার মানে দ্বিতীয় বার আরও অমোঘ আঘাত হানার চেষ্টা করবে সে।

চোখ মেলে আরও একটা সিগারেট ধরাল রানা। নাবাতিয়ায় আতাসীকে উদ্ধার করতে এসে কিছুই ও জানতে পারেনি এই বোধটা এখন আর ওর মধ্যে নেই। সবচেয়ে বড় তথ্য, কে ফাঁসিয়েছে তাকে, তা এখন জানে ও। গভীর চিন্তায় ডুবে গেল আবার রানা। জামাল আরসালানের পরিচয় উদ্‌ঘাটন করতে হবে। চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাতে হবে সবাইকে, জ্ঞান-তাপস, নিরীহ, প্রৌঢ় লাইব্রেরিয়ান ভদ্রলোকটিকে পরম বন্ধু বলে মনে হলেও সে আসলে ঘরের শত্রু বিভীষণ।

পৌনে একঘণ্টা পর ছাউনিতে ঢুকতেই সবাইকে থতমত খেয়ে চুপ করে যেতে দেখল রানা। কাফাকে দেখে বুঝল, নঈম যাকেরের সাথে হাতাহাতি করার জন্যে তৈরি হয়ে ছিল সে। সবাই চুপ করে ওর দিকে চেয়ে আছে দেখে হেসে ফেলল রানা। 'কি সিদ্ধান্ত হলো তোমাদের? আমি দোষী, না নির্দোষ?'

'চুরি করতে গিয়ে যেন হাতেনাতে ধরা পড়ে গেছে, এইরকম অবস্থা হলো ওদের। শুধু কাফা আর জাফরী চেয়ে আছে ওর দিকে। রানা ধরতে পারল , ওরাও পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছে না ওকে, তবে রানার হয়ে তর্ক করতে চেষ্টার ত্রুটি করেনি। জাফরীর মাংসল, ফোলা শিশুর মত মুখটায় অদ্ভুত একটা অভিমান লক্ষ্য করল রানা। বাকি সবাই, রানাকে এড়িয়ে যাবার জন্যে এদিক-ওদিক ঘাড় ফিরিয়ে অনড় বসে আছে, যেন কিছুই ঘটেনি। বম্বারডিয়ার সাইয়িদ হাকাম আর নঈম যাকেরের পেশীগুলো টান টান হয়ে আছে, দু'জনেই বসে আছে যার যার বিছানায়।

সতর্ক থাকতে হবে ওকে, অনুভব করল রানা। এখন থেকে ওর কথা এবং আচরণের উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখা হবে। বিছানায় শুয়ে পড়ল রানা। চাদরটা টেনে ঢেকে

নিল মাথা পর্যন্ত।

গোটা বিকেলটা নিস্তরঙ্গ কাটল। একটানা এতটা সময়ে একবারও সতর্ক-সঙ্কেত না পাওয়ায় অভ্যস্ত নয় ওরা। সময় কাটাল গানাররা ঘুমিয়ে, তাস বা [illegible]া খেলে। রানা কিছুই করল না, শুয়ে রইল চুপচাপ। চাদর সরিয়ে সকৌতুকে সকলকে দেখেছে ও। চোখাচোখি হতে ঝট্ করে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছে গানাররা। ব্যতিক্রম শুধু নঈম যাকের আর বব্বারডিয়ার সাইয়িদ হাকাম। হাকামের বৃষ স্কন্ধের উপর বসানো কামানো মাথাটার ভিতর কি চিন্তা চলছে, বুঝতে পারল রানা। চোখাচোখি হতে আরও তীক্ষ্ণ হয়েছে তার দৃষ্টি। তোমার পিছনে লেগে আছি আমি, তেমন কিছু সন্দেহজনক দেখলেই ক্যাঁক করে ধরব—ভাবটা এই রকম। আর নঈমের নিষ্পলক চোখে আতঙ্ক দেখে মনে হলো, রানা যেন জ্যান্ত একটা বিষাক্ত সাপ, সম্মোহিত করেছে তাকে।

দিনের দ্বিতীয় টেক-পোস্টের পালা এল পাঁচটার দিকে। কিন্তু বেশিক্ষণ তা স্থায়ী হলো না। ছাউনির বাইরে কাঁকরের উপর পা বিছিয়ে একটা পাথরে হেলান দিয়ে বসল রানা। হাতে একটা বই। বইটার খোলা পাতায় দৃষ্টি থাকলেও, চুরি করে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে ও রাস্তাটার দিকে। সাড়ে পাঁচটার দিকে বইটা ওর মনোযোগ একেবারেই ধরে রাখতে পারল না। মনে হতে লাগল ইফফাত বুঝি আসবেই না আজ আর।

ঠিক পৌনে ছয়টার সময় স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল রানা। হ্যাঙ্গারের সামনে দিয়ে ইফফাত হেঁটে আসছে। এতটা দূর থেকেও তার ক্যাপের দু'পাশে বেরিয়ে থাকা ঢেউ খেলানো চুলের উপর রোদের প্রতিফলন দেখল রানা। ইফফাত অপারেশন কন্ট্রোলরুমের দিকে মোড় নেয় কিনা দেখার জন্যে চেয়ে রইল ও।

না, ধীরে ধীরে গানপিটের দিকেই সোজা এগিয়ে আসছে ইফফাত। সে যখন আর মাত্র পঞ্চাশ গজ দূরে, সিধে হয়ে দাঁড়াল রানা। ইফফাতকে ও দেখেছে, তা তাকে বুঝিয়ে দেবার জন্যে হাঁটতে শুরু করল ছাউনির দিকে।

ছাউনি থেকে টোবাকো পাইপটা নিয়ে বেরিয়ে এল রানা আবার বাইরে। দেখল, ঘুরে গেছে ইফফাত, হেঁটে ফিরে যাচ্ছে এখন অপারেশন কন্ট্রোলরুমের দিকে।

সন্ধ্যার পরপরই স্ট্যান্ড-টু-এর ডিটাচমেন্ট গানপিটে চলে গেছে। সাইয়িদ হাকামের নেতৃত্বে দল বেঁধে গেছে গানাররা দক্ষিণের পাহাড়টায়, ঝর্ণার পানিতে গোসল করবে তারা। ছাউনি ফাঁকা। গোসল করার সরঞ্জাম নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল রানা।

সাইয়িদ হাকামের অনুপস্থিতিতে স্ট্যান্ড-টু-এর নেতৃত্ব দিচ্ছে গওহর জুমলাত। গোসল করতে যাওয়ার অনুমতি চাইতে সে আপত্তি তুলল না, কিন্তু বলল, 'ওদের সাথে গেলেই তো পারতে।'

হ্যাঙ্গারের পশ্চিম দিকে বিশাল একতলা বাড়িটা এয়ার স্টেশনের স্নানাগার। সেদিকে একশো গজ এগোবার পর বাঁক নিয়ে সোজা শিক্ষা ভবনের দিকে এগোল রানা। চাঁদ এখনও ওঠেনি, কিন্তু ঘন কালো একটা ছায়াকে সামনের দিকে মৃদু নড়তে দেখেই ঝট্ করে দাঁড়িয়ে পড়ে ছোট্ট একটা লাফ দিল রানা। পাথরের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল ও। ছায়াটাকে ক্রমশঃ বড় হতে দেখে বুঝল, ভুল দেখেনি।

হন হন করে হেঁটে আসছে একজন। আরও কাছে আসতে সন্দেহটা সত্যি প্রমাণিত হল রানার। সাইয়িদ হাকামই। তারার আলোয় চিক চিক করছে তার কামানো মাথা।

নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ পেল রানা। ওর কাছ থেকে আড়াই হাত দূর দিয়ে হেঁটে গেল সে। কিছু দেখেছে কিনা বোঝা গেল না। দেখে থাকলেও কোন ভাব প্রকশ না পাবারই কথা, ভাবল রানা। কাঁকরের উপর পায়ের শব্দ দূরে মিলিয়ে যেতে পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করল ও। সাইয়িদ হাকামের হয়েছেটা কি? গানারদের ফেলে ছাউনিতে ফিরছে কেন সে?

কয়েকবার দাঁড়িয়ে পিছনটা ভাল করে দেখে নিল রানা। কেউ অনুসরণ করছে বলে মনে হল না।

গওহর জুমলাতের কাছ থেকে খবর পেয়ে হাকাম কি গোসলখানায় যাবে ওর খোঁজে? ভাবছে রানা? যদি যায়, এবং গিয়ে ওকে না পায়, কি করবে সে? রিপোর্ট করবে ইয়াসির ফারুকীর কাছে? যা খুশি করুক, এখন আর পিছিয়ে যেতে রাজি নয় রানা।

জানতে হবে জামাল আরসালান সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে সন্ধ্যাটা নিজের রুমেই কাটাচ্ছে কিনা। সোজা শিক্ষা ভবনে গিয়ে ঢুকল রানা। নিচের তলায় দুটো ক্লাসরুম, একটা লেকচার রুম। আরেকটা কামরার জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে রানা দেখল বাদ্যযন্ত্র আর খেলাধুলার নানারকম জিনিসে সেটা ঠাসা।

উপর তলায় বিরাট দুটো কামরার একটায় টেবিল টেনিস, আরেকটায় বিলিয়ার্ড খেলা চলছে। লাইব্রেরিটা একেবারে শেষ মাথায়, রাজ্যের টেকনিক্যাল বই-পুস্তকে ভর্তি। লাইব্রেরির উপরের কামরাটাই জামাল আরসালানের।

কেউ ওকে লক্ষ করছে কিনা ভাল করে দেখে নিয়ে খালি একটা কামরায় ঢুকল রানা। হাতের কাপড়চোপড় একটা চেয়ারে রেখে বেরিয়ে এল তখুনি করিডরে। ছোট্ট সিঁড়ির ধাপ ক'টা টপকে জামাল আরসালানের সবুজ রঙ করা দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল ও।

বোতামে চাপ দিয়ে কলিংবেল বাজাল রানা। বেশ অনেকটা দূর থেকে আওয়াজটা ভেসে এল। ভিতর থেকে কেউ সাড়া না দিতে দরজার হাতল ধরে ঘোরাবার চেষ্টা করল ও। ঘুরল না সেটা। তালা লাগিয়ে রাখা হয়েছে।

ইয়েল কোম্পানীর বিখ্যাত তালা। রিঙে দুটো ইয়েলের চাবি ছিল, বের করে খুলতে গিয়ে রানা দেখল, কী-হোলে ঢুকছেই না।

তালা ভাঙার প্রশ্ন অবান্তর। দরজা ভাঙতে গেলেও চোর বা পাগল ভেবে তাড়া করবে সবাই। একমাত্র উপায় ছাদে ওঠা, তারপর সেখান থেকে কোন জানালায় নেমে ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করা।

বেরোবার সময়ও কারও সাথে দেখা হল না ওর। আবছা আলোয় বিল্ডিংয়ের সামনেটা একনজর দেখেই বুঝল উপরে ওঠার কোন উপায় নেই এদিকে। তাছাড়া, এদিক দিয়ে উঠতে চেষ্টা করলে লোকের চোখে পড়তে হবে। শিক্ষা ভবন আর স্টেশন

হেডকোয়ার্টারের মাঝখানে সরু একটা গলি, সেটা দিয়ে পিছনের দিকে চলে এল ও। অনেকগুলো খেজুর গাছ আর কিছু আধমরা ঝোপ-জঙ্গল একটা আড়াল তৈরি করেছে এদিকটায়।

বিল্ডিংটার একটা পাশ বেয়ে উপরে উঠে গেল রানার দৃষ্টি। একটা ড্রেন পাইপ দিয়ে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু সেটা যেখানে গিয়ে দেয়ালের ভিতর ঢুকে গেছে সেখান থেকে সবচেয়ে কাছের জানালার কার্নিসটা হাত পাঁচেক উঁচুতে, তারমানে নাগালের বাইরে। লিভিং কোয়ার্টার এবং স্টেশন হেডকোয়ার্টারের ভবনগুলো ঘিরে রেখেছে শিক্ষা ভবনকে, কিন্তু এটা আরগুলোর তুলনায় অত লম্বা নয়। শিক্ষা ভবনের ছাদটা অসম্ভব ঢালু , এর গায়ে আবার সেঁটে আছে পুরানো একটা বিল্ডিং। আগে এটা একটা বাড়িই ছিল, মনে হল রানার। শিক্ষা আর বিনোদনের প্রয়োজন দেখা দেয়ায় এটার সাথে নতুন একটা ভবন যোগ করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শিক্ষা ভবন।

পুরানো বিল্ডিংটার ছাদে ওঠা হয়ত সম্ভব, কিন্তু ঢালু ছাদ বেয়ে ঠিক মাঝখানে উঠে যাওয়া, তারপর অপ্রশস্ত ছাদের মেরুদণ্ডটার উপর দাঁড়িয়ে নতুন ভবনটার গায়ে বসানো জানালাটা লাফিয়ে ধরা সম্ভব কিনা নিচে থেকে তা ঠিক বুঝতে পারল না রানা।

জানালা কয়েকটাই দেখা যাচ্ছে। তার মধ্যে একটা মাত্র সামান্য একটু খোলা। অন্যগুলোর চেয়ে ওটাকে আকারে ছোট এবং শার্সির কাঁচ ঝাপসা দেখে বাথরুমের জানালা বলেই মনে হল ওর। নিচে পাইপ রয়েছে, সোজা নেমে এসেছে পুরানো ভবনের ছাদের কাছে, তারপর ছাদটার সাথেই ঢালু হয়ে নেমে এসেছে নতুন ভবনটার গা ধরে কিনারা পর্যন্ত, বাঁক নিয়ে হারিয়ে গেছে চোখের আড়ালে। পনেরো সেকেন্ড দেখার পর রানা সিদ্ধান্ত নিল, এটাই একমাত্র পথ।

ঝোপের ভিতর থেকে বেরিয়ে পুরানো বিল্ডিংটার সামনে দাঁড়াল রানা। একতলার একটা জানালার কার্নিসে উঠে বাঁ হাত উঁচু করে দিয়ে মাথার শেডটা ধরে ফেলল, তারপর কবাটের খাঁজে পা দিয়ে শরীরটা তুলে নিল কংক্রিটের তেকোনা শেডটার উপর।

একেবারে ছাদের কাছে গিয়ে বিপদটা টের পেল রানা। দোতলার একটা জানালার শেডের উপর দাঁড়িয়ে আছে ও। দু'দিকে ঢালু সেটা, একটু এদিক ওদিক হলেই পা ফসকে যাবে। খেজুর গাছের আড়াল এখন আর ওকে ঢেকে রাখছে না। ঘাড় ফেরাতে স্টেশন হেডকোয়ার্টারের বিশাল উঠান আর লিভিং কোয়ার্টারগুলোর ভিতর পর্যন্ত দেখতে পেল ও। রাত বলেই কিছুটা বাঁচোয়া। তবে যে-কোন মুহূর্তে কারও চোখে পড়ে গেলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। বিপদটা হলো, ঢালু ছাদটা দেয়ালের পরও এক হাত বেড়ে আছে। কিনারা ধরে ঝুলে পড়তে হবে ওকে, ঝুলন্ত অবস্থা থেকে উঠতে হবে ছাদে, পা দুটোর কাছ থেকে কোনরকম সাহায্যের আশা না করেই।

পুরানো ছাদ, কিনারাটা ওর ভার সহ্য করতে পারবে কি? সংশয়টাকে নিজের মধ্যে বাড়তে না দিয়ে উপর দিকে লাফ দিল রানা। হাতটা ঘষা খেল ছাদের কিনারায়।

পরমুহূর্তে রানা দেখল, ঘড়ির পেন্ডুলামের মত শূন্যে দুলছে ও।

কিছু নড়তে দেখলে মানুষের দৃষ্টি সেদিকেই আকৃষ্ট হয়, কথাটা মনে পড়তে নিজেকে থামাতে চাইল রানা। কিন্তু পা দুটো বিল্ডিংটার গায়ে ঠেকাতে পারল না বলে সফল হলো না তাতে। অনুভব করল ছাদের কিনারায় আলগা হয়ে জমে থাকা ধুলো-বালির পাতলা স্তরে ঘামে ভেজা হাত দুটো টিকে থাকতে পারছে না, নেমে আসছে পিছলে। নিচের দিকে তাকাতে শিউরে উঠল ও। পড়লে হাড়-গোড় আস্ত থাকবে না একটাও।

দু'হাতের কনুই ভাঁজ করে শরীরটাকে উপরে তুলতে চেষ্টা করল ও। ছাদের কিনারায় ঠেকল চিবুক। হাত দুটো থরথর করে কাঁপছে। থুতনিটা কিনারায় ঠেকিয়ে শরীরের ভার হাত দুটোর উপর থেকে কমাল খানিকটা। ডান হাতটা পিছলে গেল হঠাৎ, ছ্যাত্ করে উঠল বুক। আপনা থেকেই উপর দিকে উঠে গিয়ে বিদ্যুতবেগে পড়ল সেটা ছাদের উপর। মসৃণ, ঢালু ছাদে তিন সেকেন্ড কিলবিল করল পাঁচটা আঙ্গুল, ধরার মত কিছুই পেল না রানা। শেষ পর্যন্ত কিনারাটা আঁকড়ে ধরল ও। সেই সাথে উপর দিকে প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনির সাথে উঁচুতে ওঠাতে চাইল শরীরটা। চোখমুখ বিকৃত হয়ে গেল ওর। বুকটা ঠেকল ছাদের কিনারায়। দুটো হাত মাথার উপর উঠে গেল। ছাদের কিনারায় ঝুলে রইল শরীরটা। শরীরের নিচের অংশটা ভারি, সেটা নেমে যেতে শুরু করল নিচের দিকে। হাত দুটো আছড়ে পড়ল ছাদের উপর। থমকে গেল শরীরটা। কংক্রিটের ছাদের গা খামচাচ্ছে দশটা আঙ্গুল। ডান হাঁটুটা ভাঁজ করে শরীরের পাশ দিয়ে ছাদের কিনারায় তুলে আনল রানা। পতনের প্রবণতা কাটিয়ে উঠল শরীরটা। ছাদের উপর উঠে বসতে পারল রানা এবার সহজেই।

কিনারায় কোন খাঁজ-ভাঁজ কিছুই নেই, অসম্ভব ঢালু ছাদটা শরীরকে নিচের দিকে গড়িয়ে দিতে চাইছে। দুই হাতের তালু ছাদের উপর রেখে শরীরটা ঘুরিয়ে কিনারার দিকে মুখ করল রানা। হাপরের মত হাঁপাচ্ছে ও। নিচে তাকাতেই দেখল লিভিং কোয়ার্টারের ভিতর ছোট একটা উঠানে দু'জন লোক দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাচ্ছে।

এদিকে যদি চোখ তোলে ওরা, ধরা না পড়ে উপায় নেই রানার। ভাবল, সিগারেট ধরাবার জন্যেই দাঁড়িয়েছে, চলে যাবে এখুনি। কিন্তু সিগারেট ধরানো হতেও নড়ার লক্ষণ দেখল না রানা ওদের মধ্যে। সময় দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে ভেবে অস্থিরতা বোধ করল ও। পুরোপুরি ওর দিকে মুখ করে না হলেও লোক দু'জন দাঁড়িয়ে আছে এমন ভঙ্গিতে, যে-কোন একজন মাথাটা ইঞ্চি দেড়েক নাড়লেই ওকে মুখোমুখি দেখতে পাবে।

ঝুঁকিটা নিতেই হবে, ভাবল রানা। গুটানো কার্পেটের ভাঁজ খোলার ভঙ্গিতে গড়াতে শুরু করল ও।

ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে রানা ছাদটার একদিকের প্রান্ত সীমার দিকে। সংলগ্ন নতুন ভবনের গায়ে গিয়ে ঠেকেছে ছাদটা। ভবনটার দেয়াল উঠে গেছে আরও তিন মানুষ সমান উঁচু পর্যন্ত।

প্রান্তসীমায় পৌঁছে ভবনটার দেয়াল ধরে অত্যন্ত সাবধানে উঠে বসল রানা। উঠে

দাঁড়াবার আগে লিভিং কোয়ার্টারের দিকে তাকিয়ে লোক দু'জনকে দেখে নিল একবার। হঠাৎ ছ্যাঁত্ করে উঠল বুকটা। চলে যাবার জন্যে লোক দু'জন একটা রূম থেকে বেরিয়ে আসা আলোর দিকে ফিরতেই পরিষ্কার সাইয়িদ হাকামকে চিনতে পারল সে। সঙ্গের লোকটাকেও দেখল, ঠিক চিনতে পারল না তাকে। একটা গলিতে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল দু'জনেই।

গা ঢাকা দেবার একটা তাড়া অনুভব করল রানা। লিভিং কোয়ার্টারের গেট পেরিয়ে সাইয়িদ হাকাম শিক্ষা ভবনের পিছন দিকে যদি চলে আসে...।

দেয়াল ধরে ধরে এগোচ্ছে রানা। পঁচিশ হাত দূরত্ব পেরিয়ে ছাদের মাঝখানে উঠে দাঁড়াল ও। অপরদিকে আরও পঁচিশ হাত ঢালু ছাদ। মাঝখানের মেরুদণ্ডটা মাত্র দু'ইঞ্চি চওড়া। ঊরু এবং বুক দেয়ালে ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রানা। উপর দিকে মুখ তুলে জানালাটা দেখল আর একবার। নাগালের বাইরে কার্নিসটা। লাফ দিয়েও ধরা যাবে কিনা সন্দেহ।

পানির পাইপটা ওর বুক বরাবর, আধ হাত তফাতে, দেয়াল ভেদ করে বেরিয়ে এসেছে বাইরে। ওটার উপর পা দিয়ে দাঁড়ানো সম্ভব, কিন্তু আগে উঠতে হবে, তবে তো! যত জোরেই লাফ দিক, পা দুটো অতটা উঁচুতে তোলা কক্ষনো সম্ভব নয়।

জানালার কার্নিসটাই এক লাফে ধরতে হবে। যদি ধরতে না পারে, বা ধরার পর ফসকে যায়, ঢালু ছাদে পড়ে গড়িয়ে যাওয়াটা রোধ করতে পারবে না ও...দুত্তোরী ছাই! সমস্ত নেতিবাচক ভাবনাচিন্তা বাদ দিয়ে অকস্মাৎ উপর দিকে লাফ দিল রানা।

ডান হাতটা দিয়ে জানালার কার্নিস আঁকড়ে ধরল সে। আধ সেকেন্ড ঝুলে রইল। মৃদু, ভোঁতা শব্দ হলো একটা, কার্নিসের চার ইঞ্চি একটা টুকরোসহ হাতটা নেমে এল নিচে। ঝুলে রইল রানা বাঁ হাতের উপর। কার্নিসটার অপরদিকটাও ওর ভার সইতে পারার কথা নয়, মনে হতেই শরীরের ডান পাশ দিয়ে নিচে নেমে গেল দৃষ্টি। হাঁটু দিয়ে দেয়ালে ধাক্কা দিল রানা, শরীরটা এদিক ওদিক দুলতে শুরু করতেই পাইপটার বেরিয়ে থাকা মাথার উপর একটা পা রেখে স্থির হল সে।

এবার জানালায় ওঠা তেমন কঠিন ব্যাপার হলো না। জানালার কবাট দুটো পুরো মেলে দিয়ে কামরার ভিতর নেমে পকেট থেকে দিয়াশলাই বের করে জ্বালল। যা ভেবেছিল, এটা একটা বাথরূমই। দরজা টপকে প্যাসেজে বেরিয়ে এল ও নিঃশব্দ পায়ে।

প্যাসেজের শেষ মাথায় পাশাপাশি দুটো দরজা। দিয়াশলাইয়ের কাঠিটা নিভে যেতে অন্ধকার নিশ্ছিদ্র হয়ে উঠল। কোন শব্দ হয় কিনা শোনার জন্যে পুরো এক মিনিট দাঁড়িয়ে রইল রানা। তারপর নিশ্চিন্ত মনে এগোল দরজা দুটোর দিকে।

দুটো দরজাই বন্ধ মনে হলো। কিন্তু ডান দিকেরটা মৃদু ধাক্কা দিতে খুলে যেতে দেখে ভুরু কুঁচকে উঠল রানার। খোলা কেন? কিছু আছে নাকি সে-রূমের ভিতর? সামান্য ফাঁকটা দিয়ে ভিতরটা দেখার চেষ্টা করল রানা। অন্ধকার। এক ইঞ্চি সামনের জিনিসও দেখা যাচ্ছে না। আছে? কিন্তু এই তীব্র অন্ধকারে কি করছে সে? নাকি

ভুলক্রমে, কিংবা অভ্যাসবশত আরসালান খুলে রেখে গেছে রুম?

পাশ থেকে ঠেলা দিয়ে কবাট দুটো পুরো ফাঁক করল রানা। কোন শব্দ নেই ঘরের ভিতর থেকে। খুক করে কাশল ও। সাড়া নেই কারও। জামাল আরসালান ফাঁদ পেতে বসে আছে ঘরের ভিতর? আগেই অনুমান করেছে সে ও আসবে?

শেষ দেশলাইয়ের কাঠিটা জ্বালল রানা। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে জ্বলন্ত কাঠিটা বাড়িয়ে দিল কামরার ভিতর। নিবু নিবু কাঠিটা হঠাৎ জ্বলে উঠল উজ্জ্বল হয়ে। রুমের যতটুকু দেখা গেল, কেউ নেই সেখানে।

নিঃসন্দেহ হবার কোন উপায় যখন নেই ঝুঁকিটা নিতেই হল। হামাগুড়ি দিয়ে ঘরের ভিতর ঢুকল রানা। অন্ধকার কামরার মাঝখানে গিয়ে থামল ও। অপেক্ষা করল কয়েক মুহূর্ত, যদি কারও নিঃশ্বাসের শব্দ কানে ঢোকে।

কেউ নেই কামরায়, মনে হল ওর। দেয়াল হাতড়ে সুইচবোর্ডটা খুঁজে বের করল ও। আলো জ্বলে উঠতেই একটা শোফার উপর বসে ওর দিকে রক্তচক্ষু মেলে তাকিয়ে থাকতে দেখল রানা কুচকুচে কালো একটা বিড়ালকে।

ঠাণ্ডা, ডিসটেম্পার করা কামরা। মাঝখানের দরজাটা দিয়ে পাশের কামরাটাতেও কেউ নেই দেখে এল রানা। জানালা-দরজায় ঝুলছে গাঢ় সবুজ সিল্কের পর্দা। জল রঙে আঁকা ক'টা ছবিও রয়েছে দেয়ালে। চারদিকটা আর একবার দেখল রানা। বুক-কেসের পাশে বড় আকারের রেডিওগ্রামটা, তারপর জানালা, জানালার পাশেই পুরানো ধাঁচের মস্ত একটা ডালাওয়ালা টেবিল। প্রথম ওটাতেই হাত লাগাতে চাইল রানা।

ভাগ্যটা ভাল মনে হলো—তালাটা খোলাই পাওয়া গেল। সেটা তুলতেই ছোট ছোট বাক্স আকারের অনেক ড্রয়ার দেখা গেল ভিতরে। কাগজ, বই, নোট-বই, চিঠি, খাম ইত্যাদি হাজারও জিনিসে সবগুলো ঠাসা। রিস্টওয়াচ দেখে কাজে হাত দিল রানা। মনে মনে একটা নিয়মশৃঙ্খলা তৈরি করে জিনিসগুলো এক এক করে পরীক্ষা করতে শুরু করল ও। প্রথমে ধরল খামসমেত চিঠির স্তূপ, তারপর খামহীন চিঠির বাণ্ডিল।

টেবিলটার অর্ধেক জিনিসও দেখা শেষ হয়নি, হঠাৎ রিস্টওয়াচ দেখে আঁতকে উঠল সে। দশটা বাজতে বিশ মিনিট আর! মাত্র পঁয়ত্রিশ মিনিটের মধ্যে সাইটে ফিরতে হবে ওকে।

কি খুঁজছে তা নিজেই জানে না রানা। শৃঙ্খলা শিকেয় তুলে দিয়ে অনিয়মের চূড়ান্ত নমুনা রাখতে শুরু করল। একটা করে বই ধরে, কাভার ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে ভিতরে কিছু আছে কিনা পরীক্ষা করে, তারপর যেদিক খুশি ছুঁড়ে ফেলে দেয়। ভাবল, সে যদি ফিরে এসে দেখে রুমগুলো কেউ তছনছ করে গেছে, তাতে কিবা আসে যায়? দেখেই বুঝবে, এ কার কাজ। তাতে বরং সুবিধে হতেও পারে। একটু যদি ভয় পায়। শত্রু ভয় পেলে নিজের অজ্ঞাতে এমন সব ভুল করে বসে, প্রতিপক্ষ অনায়াসে জানতে পারে কোথায় তার দুর্বলতা।

বুক কেসটাকে নিয়ে পড়ল এরপর রানা। টেকনিক্যাল বইয়ের আশ্চর্য সংগ্রহ

এখানে। সামরিক কলা-কৌশল আর ইতিহাসের বই, ডায়নামিকস্, ব্যালিস্টিকস্ আর উচ্চতর অঙ্কের বই।

আরও পনেরো মিনিট পর নিজের উপর রেগে গেল রানা, জামাল আরসালান ভাল একজন অঙ্কবিদ এবং তার বিস্তর বন্ধু-বান্ধব আছে, এতক্ষণে এ ছাড়া তার সম্পর্কে আর কিছুই জানতে পারেনি ও।

অসহায় লাগল নিজেকে। সামান্য একজন গানার হিসেবে ঢুকেছে ও স্টেশনে, প্রতি পদে হাজারও রকম অপরিচিত বাধা ওর সামনে প্রাচীর হয়ে দাঁড়াচ্ছে। গানার না হয়ে একজন অফিসার হিসেবে ঢোকার সুযোগ যদি থাকত, এতদিনে হয়ত ষড়যন্ত্র উন্মোচন করে আন্ডারগ্রাউন্ড সেল থেকে তুলে আনতে পারত ও আতাসীকে মুক্ত বাতাসে।

টিক্-টিক্, টিক্-টিক্—দেয়াল ঘড়িটা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে সময়। মরিয়া হয়ে উঠল রানা মনে মনে। কিছু না পেয়ে ফিরে যেতে হবে ভাবতেই জ্বালা ধরে গেল শরীরে, ঘামে চটচট করছে কপাল আর হাত দুটো কিছু যদি পাওয়া না যায়, কাউকে বোঝাতে পারবে না ও যে আতাসী নির্দোষ তা বোঝাতে না পারলে…।

চারদিকে তাকাতে গিয়ে দরজার আড়ালে লম্বা একটা স্টীলের সেফ চোখে পড়ল। বুক-কেসের ভিতর থেকে পাওয়া চাবির গোছা থেকে বেছে বেছে একটা করে চাবি ঢুকিয়ে সেফটার তালা খোলার চেষ্টায় গলদঘর্ম হল ও। অবশেষে খুলল দরজাটা। আরও অনেকগুলো দেরাজ দেখল ও। কাগজপত্র তুলে সেফটার মাথার উপর রাখল রানা। নেড়েচেড়ে দেখে ফেলে দিল সব মেঝেতে। নানান সাইজের কাগজে নিখুঁতভাবে আঁকা নকশা দেখল রানা চল্লিশ পঞ্চাশটা। কাল্পনিক যুদ্ধের ছবি এঁকে নতুন নতুন রণকৌশলের বৈশিষ্ট্য বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে এগুলোয়। সব ছুঁড়ে ফেলে দিল।

পিঠে ব্যথা নিয়ে সিধে হয়ে দাঁড়াল রানা। সেফটা এখন খালি, ঝাড়লে ধুলো ছাড়া আর কিছু পাওয়া যাবে না! সন্দেহজনক কিছুই পায়নি ও।

বেডরূমটা? কিন্তু ওখানে আছেই বা কি যাতে গোপনীয় কিছু থাকবে? পা বাড়াতে গিয়েও বাড়াল না রানা, চমকে গেল। রেডিওগ্রামের উপর পড়ে রয়েছে মানিব্যাগ। রাখার মধ্যে একটা অযত্নের ছাপ লক্ষ করা যায়। সেজন্যেই ভেবে আশ্চর্য হলো রানা, এতক্ষণ ওটা চোখে পড়েনি কেন ওর?

এগিয়ে গিয়ে তুলে নিল রানা মানিব্যাগটা। ভিতরে বিশ দিনারের দুটো নোট, স্ট্যাম্প, ভিজিটিং কার্ড আর একটা ফটোগ্রাফ পাওয়া গেল।

ছবিটা বহুদিনের পুরানো, কিনারাগুলো ফেটে গেছে অনেক জায়গায়, এক নজর দেখে মেঝেতে ফেলে দিতে যাচ্ছিল, এমন সময় ছবির দ্বিতীয় ব্যক্তি, পুরুষটার উপর দৃষ্টি আটকে গেল। খুব বেশি লম্বা নয় লোকটা, তবে শরীরের কাঠামো বেশ মজবুত। বড় একটা নাক, ক্লিনশেভ, চুলগুলো কোঁকড়ানো।

কোঁকড়ানো চুল? নিজের ভিতর একটা উত্তেজনা অনুভব করল রানা জামাল

আরসালানকে চিনতে পেরে। তার বাহুলগ্ন হয়ে আছে একটি মেয়ে। পরিচিত নয়, কিন্তু চেনা চেনা লাগছে। খাই খাই একটা ভাব রয়েছে তার চোখেমুখে, অঙ্গভঙ্গিতে—এইটুকুই যেন চেনা চেনা, হাফ-প্যান্ট আর হাফ-শার্ট পরে জামান আরসালানের খালি বুকে গাল ঠেকিয়ে উপর দিকে চেয়ে আছে সে, মুক্তো ঝরছে হাসিতে।

ফটোটা উল্টো করতেই অস্পষ্ট তারিখটা এবং তার নিচে ঝাপসা, প্রায় পড়া যায় না, ছোট ছোট অক্ষরে লেখা হোটেল ইটন, জাদরুন। তড়াক করে লাফিয়ে উঠল বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ডটা। জাদরুন! তেলআবিবের একটা অভিজাত এলাকার নাম।

তিন কি তেরো সেকেন্ড, বলতে পারবে না রানা, ছবিটার দিকে চেয়ে রইল সম্মোহিত হয়ে। খুট করে একটা আওয়াজ। চমকে উঠল ও। হাতটা আপনা থেকে এগিয়ে গেল পকেটের দিকে। বিদ্যুৎবেগে ঘুরে দাঁড়াল ও সেই মুহূর্তে।

খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে জামাল আরসালান।

সাত

আষাঢ়ের কালো মেঘের মত দেখাল জামাল আরসালানের মুখটা। কিন্তু চোখ দুটো অনড় এবং সতর্ক। ঝড়ো ভাবটা মুখ থেকে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। এগিয়ে এল সে রানার দিকে। 'অতিথির পরিচয় জানতে পারি কি? কে হে তুমি, বাপু?' হালকা, ভাল মানুষের কণ্ঠস্বর। কি যেন এক যাদু আছে স্বরটায়, অদ্ভুত একটা আকর্ষণ আছে। সহজ ভঙ্গিতে শো-কেসটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে, রানার দিকে পিছন ফিরে।

নিজের উপর লোকটার আস্থা দেখে অবাক হলো রানা। সিগারের বাক্স খুলছে সে। বেশ সময় নিয়ে ধরাল একটা সিগার। তারপর ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ফিরল রানার দিকে।

'আমার নাম তুমি শুনেছ, জামাল আরসালান,' বলল রানা। 'আমি একজন গানার।'

'মাসুদ রানা?'

হ্যাঁ-না কিছুই না বলে টান হয়ে দাঁড়িয়ে রইল রানা। দ্রুত ভাবতে চেষ্টা করছে রানা, ওকে নিয়ে কি করবে লোকটা। মোক্ষম একটা সুযোগ পেয়েছে সে ওকে স্টেশন থেকে বহিষ্কার করার। ওর এখন একমাত্র ভরসা, অত বড় ঝুঁকি নেয়াটা বোকামি হয়ে যাবে বলে মনে করতে পারে সে। যদি গ্রেফতার করে, কোর্ট মার্শাল ঠেকানো যাবে না। কিন্তু কোর্ট মার্শালে রানা নিজের সন্দেহের ভিত্তি এবং কারণগুলো ব্যাখ্যা করে বলার সুযোগটা ছাড়বে না। চুরি করার জন্যে রুমের ভিতর অনধিকার প্রবেশ করেনি ও এ-কথা বিচারককে বিশ্বাস করানো কঠিন হবে না। এসব নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছে জামাল আরসালান, ভাবল রানা। তারপর, ডায়াগ্রামটা রয়েছে। রানা সেটা দাখিল

করবে কোর্টে, এই ভয়ও তার থাকতে বাধ্য। সে তো আর জানে না যে সেটা রানা পুড়িয়ে ফেলেছে।

'ওয়েল, পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থেকে কোথাও আমরা পৌঁছুতে পারব না।' রুমের সর্বত্র ছড়ানো কাগজপত্র আর বইগুলো আঙ্গুল দিয়ে দেখাল সে, 'এসবের ব্যাখ্যাটা কি জানা যায়?'

'ব্যাখ্যাটা তোমার জানা আছে বলেই মনে করি।'

নীল ট্রফিক্যাল স্যুট পরে আছে জামাল আরসালান। নাকের মাথায় একটা বড় লাল আঁচিল। সেটার ডান পাশটা কড়ে আঙ্গুলের নখ দিয়ে চুলকাল সে। ব্যাকব্রাশ করা কোঁকড়ানো চুল। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। নাকের আঁচিল, চোখের চশমা, গায়ের মেদ আর মাথার পাকা চুল—এগুলোই ফটোর ছবির সাথে বর্তমান চেহারার বৈসাদৃশ্য তৈরি করেছে।

ইতস্তত করছে জামাল আরসালান। তারপর মাথাটা কাত করল একদিকে। 'হ্যাঁ, সম্ভবত ব্যাখ্যাটা জানি, গানার রানা। টেলিগ্রামটার কথা শুনেছি আমি। শোনার পর তখনই তোমার সাথে কথা বলার ইচ্ছে ছিল আমার। স্নেহের একটা অদ্ভুত আন্তরিক হাসি ফুটে উঠেছে তার চোখেমুখে, হঠাৎ করে বানোয়াট মনে করা যায় না। কিন্তু উইং কমান্ডার হামেদী কানে তুললেন না কথাটা এখন দেখছি, তাঁকে বাধ্য করা উচিত ছিল আমার। কামরার এই করুণ অবস্থা তাহলে আর হত না।'

'আমার সাথে দেখা করতে চাওয়ার ইচ্ছাটা তোমার লোক-দখানো ছিল,' রানা বলল। 'তুমি চেয়েছিলে অন্যত্র বদলি করা হোক আমাকে। উইং কমান্ডারও সেই ইচ্ছা ব্যক্ত করেন মি. ইয়াসির ফারুকীর কাছে। কিন্তু, তোমার কপাল মন্দ, মি. ইয়াসির ফারুকী মাঝেমধ্যে নিজের সিদ্ধান্তটাকেই বেশি মূল্য দেয়।'

আকাশ থেকে পড়ল যেন এমনি ভাব ফুটল আরসালানের মুখে। তারপরই চোখ আধবোজা করে, মাথাটা এদিক ওদিক দুলিয়ে টানা স্বরে নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল সে, 'না, রানা, না! তুমি আমাকে সম্পূর্ণ ভুল বুঝছ।' এগিয়ে এসে সোফার সামনে দাঁড়াল সে। হাত ঝাড়িয়ে পাশের একটা সোফা দেখিয়ে আন্তরিকতার সাথে বলল, 'বসো, শান্ত হয়ে বসো। বেশ বুঝতে পারছি, মাথার ভিতর সন্দেহের পোকা ঢুকেছে তোমার। এমন হয়। কোন বাপারে খটকা লাগলে বা সন্তোষজনক ব্যাখ্যা না পেলে এই বয়সে আমরাও এরকম করেছি, মানুষকে ভুল বুঝেছি। বসো, রানা। এসো, গোটা ব্যাপারটা আমরা আলোচনা করে মিটিয়ে ফেলি।'

শুধু কণ্ঠে নয়, লোকটার ভঙ্গি এবং দৃষ্টিতেও যাদু মাখানো। অনুরোধে গলে গিয়ে প্রায় বসে পড়তে যাচ্ছিল রানা। কিন্তু টান হয়ে দাঁড়িয়েই থাকল ও। 'এই বয়সে দাঁড়িয়ে থাকতেই পছন্দ করি আমরা।'

'তোমার এই তেজস্বী ভাব—সিনসিয়ারলি বলছি, প্রশংসনীয়। সে যাক। আচ্ছা, তুমি জানো তো, আমি তোমাকে গ্রেফতার করার ক্ষমতা রাখি?'

লোকটা ভয়ঙ্কর, ভাবল রানা। যে-কোন পরিস্থিতিতে অদ্ভুত শান্ত ভাব বজায়

রাখার দুর্লভ গুণ রয়েছে ওর মধ্যে।

হাসল রানা।

'হাসছ যে?'

'তুমি আমাকে গ্রেফতার করার মত বোকামি করবে না।' স্পষ্ট ভাষায় জানাল রানা। 'এত বড় ঝুঁকি তুমি নিতে পারো না, কারণ অনেক কিছু হারাতে হতে পারে তাতে তোমার।'

রানার মনে হল, জামাল আরসালানের মুখটা কঠোর হয়েই পরমুহূর্তে সরলতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। মৃদু হাসছে সে। 'কথাটা বোধহয় উভয় পক্ষের জন্যে সত্যি। সেক্ষেত্রে, আলোচনা করা উচিত আমাদের, তাই নয়? আচ্ছা, গানার রানা, কেন তুমি আমাকে ইসরায়েলি গুপ্তচর বলে সন্দেহ করছ, পরিষ্কার করে খুলে বলবে কি?'

পাল্টা প্রশ্ন করল রানা, 'কে বলল তোমাকে আমি ইসরায়েলি গুপ্তচর বলে সন্দেহ করছি?'

'উইং কমান্ডার হামেদী সব কথাই বলেছে আমাকে।'

'তাহলে তুমি জানো কেন তোমাকে আমি সন্দেহ করি।'

'উইং কমান্ডারকে যা বলেছ সেটাই শুধু শুনেছি আমি,' বলল জামাল আরসালান। 'তোমার বক্তব্য তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই আমি, যাতে বিষয়টা নিয়ে সরাসরি তোমার সাথে আলোচনা করতে সুবিধে হয়।' সিগার কামড়ে ধরে কি যেন ভাবল সে। তারপর আবার বলল, 'তোমাকে আমি গ্রেফতার করতে পারি, আবার বলছি, এবং এ ব্যাপারে কোনরকম ভুল ধারণা তোমার না থাকাই ভাল। কিন্তু, আমি তোমাকে গ্রেফতার করে চালান করতে চাই না।'

'কারণটা আগেই বলেছি।'

একটা ইজিচেয়ারে বসে হেলান দিল জামাল আরসালান। কোন উদ্বেগের চিহ্ন নেই চেহারায়। শুধু যা একটু ক্লান্ত বলে মনে হচ্ছে। 'ঠিক কি দেখে, কেন লেগেছ তুমি একটা পাওয়ারের পেছনে? তুমি নিশ্চয়ই জানো, নাবাতিয়া ফাইটার স্টেশনে আমি একটা প্রচণ্ড পাওয়ার। তোমার ব্যাকগ্রাউন্ড যতটুকু জানতে পেরেছি, তাতে আমার মনে হয়নি জেনেশুনে আমার মত একজন লোকের বিরুদ্ধে লাগার ক্ষমতা তোমার থাকা সম্ভব। কার কাছ থেকে নির্দেশ পাচ্ছ তুমি, গানার রানা? কে সেই ইসরায়েলি গুপ্তচর?'

হেসে উঠল রানা। 'খুবই কাঁচা কাজ করছ এটা, আরসালান। এভাবে নিজেকে তুমি রক্ষা করতে পারবে না।'

'তোমার সন্দেহের কারণগুলোর মধ্যে একটা সম্ভবত এই যে তেলআবিবে কিছুদিন ছিলাম আমি, তাই না? তোমার জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি, ওখানে আমি বন্দী ছিলাম, বেড়াতে যাইনি।'

'হ্যাঁ,' ব্যঙ্গের সাথে বলল রানা, 'তবে, বান্ধবীকে নিয়ে ছবি তোলার জন্যে মাঝে মাঝে ছেড়ে দিত জেলখানা থেকে, তাই না?' পরমুহূর্তে তীক্ষ্ণ স্বরে প্রশ্ন করল রানা, 'মেয়েটা কে? শাফা নয়ত, আরসালান?'

উদ্বেগের ছায়া ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল জামাল আরসালানের মুখ থেকে। 'তার মানে, ফটোটা দেখেছ তুমি।' হঠাৎ আবার মাথা দুলিয়ে হাসতে শুরু করল সে, যেন রানার ছেলেমানুষি বোকামি দেখে না হেসে পারছে না। 'আরে বোকা, এই সামান্য ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে পাগল হচ্ছ তুমি? অবশ্য ফটোটা দেখে অনেক কথা মনে হতে পারে, সত্যি, কিন্তু আসল ব্যাপারটা কি জানো,—ওটা কোন স্টুডিওতে তোলা হয়নি। জেলখানার ভিতরই ইসরায়েলি একজন ফটোগ্রাফারকে দিয়ে তুলিয়েছিলাম। একটা জিনিস তুমি ঠিক ধরেছ, ও শাফাই। তুমি বোধহয় জানো না, আমার সাথে ওকেও বন্দী করা হয়েছিল?'

তার মানে, শাফাও তোমার পথেরই পথিক, ভাবল রানা। হঠাৎ রানা উপলব্ধি করল, গ্রেফতার হওয়া চলবে না কোনমতেই। কোন কাজই শেষ করতে পারেনি ও, গ্রেফতার হলে সবই বাকি থেকে যাবে। কোর্ট মার্শালে নিজের সন্দেহের কথা প্রকাশ করার সুযোগ হয়ত পাবে ও, কিন্তু কবে তা? জামাল আরসালান ইচ্ছা করলেই উইং কমান্ডারকে কিছু একটা বুঝিয়ে কোর্ট মার্শালের দিন তারিখ নিজের সুবিধে মত স্থির করতে পারবে। বোকার ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে এখন ওকে, সিদ্ধান্ত নিল রানা।

'না, শুনিনি।'

'শোনোনি তুমি অনেক কথাই,' বলল জামাল আরসালান। 'যেমন, তোমাদের উইং কমান্ডার আমার শুধু ছাত্রই নয়, সে আমাকে বাপের মত শ্রদ্ধা করে। যেমন, গোটা লেবাননে যত মেজর জেনারেল আছে তারা সবাই আমাকে চেনে—তারা কেউ আমার ছাত্র, কেউ বন্ধু, কেউ ভক্ত।' মুচকি হাসল জামাল আরসালান। 'ওরা সবাই জানে আমার অতীত ইতিহাস। কি গুণে গুণী আমি, তাও ওরা বোঝে। আমার সেবা আমি লেবানন এয়ারফোর্সকে নিঃস্বার্থভাবে দিয়ে যাচ্ছি, এর জন্যে আমার প্রতি এরা সবাই কৃতজ্ঞ। শুধু যে অফিসাররাই আমার ঘনিষ্ঠতা লাভ করে তাও নয়, তোমার মত গানার বা আরও নিচু পদের লোককেও আমি আমার সান্নিধ্য দিয়ে থাকি আন্তরিকতার সাথেই। ইচ্ছা করলে তুমিও আমার ক্লাশে ভর্তি হতে পারো। অঙ্কই যে শুধু শেখাব তাই নয়, তোমাকে আমি···।' হঠাৎ থামল জামাল আরসালান। 'তোমার বয়স অল্প, গানার রানা। জীবনটা ভুল করে ধ্বংস করে ফেলো তা একজন গুরুজন হিসেবে আমি চাইতে পারি না। একটা ভুল করে ফেলেছ, সেজন্যে তোমার প্রতি কঠোর হওয়া আমার পক্ষে সাজে না। দেখো, এসব কথার আবার উল্টো অর্থ করো না। আর হ্যাঁ, যখনই মনে কোনরকম সন্দেহ দানা বেঁধে উঠবে অমনি সোজা চলে এসো আমার কাছে। তোমাদের সকলের জন্যে আমার দরজা সবসময় খোলা আছে। জানালা গলে ঢোকা খুব বিপজ্জনক, কি দরকার হাত-পা ভাঙার ঝুঁকি নিয়ে?'

চোখেমুখে বিস্ময় ফুটিয়ে তুলেছে ইতিমধ্যে রানা। যেন জামাল আরসালানের ক্ষমতা আর মহত্ত্বের পরিচয় পেয়ে নিজের ভুল বুঝতে পেরে লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে চাইছে ওর মাথা।

ইজিচেয়ার ছেড়ে উঠল জামাল আরসালান। 'তোমার কোন প্রশ্ন করার আছে,

রানা?'

নিঃশব্দে, বোকার মত এদিক ওদিক মাথা নাড়ল রানা।

'সেক্ষেত্রে, এতক্ষণ ধরে যা বললাম, ঠাণ্ডা মাথায় সেসব নিয়ে ভালমত ভেবে দেখো।' এগিয়ে এসে দাঁড়াল সে রানার সামনে। তারপর একটা হাত ধরল রানার। ওকে নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল সে দরজার দিকে। হাঁটছে দু'জন। রানার কানের কাছে মুখ এনে বলল, 'বুড়ো বয়সের প্রেম কেমন হয় সে সম্পর্কে কোন ধারণা আছে তোমার?' সিলিংয়ের দিকে মুখ তুলে কৃত্রিম ভাবাবেগে রুদ্ধ স্বরে সে বলল, 'গড, ওহ্ গড! নিভে যাবার আগে আগুনের শিখা যেমন লকলকিয়ে ওঠে, বুড়ো মানুষের প্রেম ঠিক তেমনি। কিন্তু ক'টা মেয়ে তা বোঝে?' রানার কানের কাছে ঠোঁট নিয়ে এল সে আবার। 'রাতের জন্যে ওটাই আমার সম্বল।' রানা অনুভব করল, পকেট মারা হচ্ছে ওর। 'কোথায় রেখেছ ফটোটা, রানা? প্লীজ, এই বুড়ো বয়সে ওটা থেকে বঞ্চিত করে আমাকে আর কষ্ট দিয়ো না। কিছু না, শুধু ওই একটি নারীর ওপরই আমার যত দুর্বলতা।'

বাধা দিল না রানা। ফটোসহ হাতটা ওর পকেট থেকে বের করে নিল জামাল আরসালান। চোখাচোখি হতে রানা লজ্জাবনত ভঙ্গিতে বলল, 'দুঃখিত, মি. আরসালান। আমি···ক্ষমা চাই।'

'করতে পারি এক শর্তে,' জামাল আরসালান অস্বাভাবিক গম্ভীর। 'যদি কথা দাও শাফার ওপর নজর ফেলবে না। বুড়ো হই, অক্ষম হই—ও আমার। ওর দিকে হাত বাড়ালে আত্মহত্যা করতে হবে আমার, আর সেজন্যে দায়ী থাকবে তুমি!'

মাথা কাত করে রাজি হলো রানা। হেসে উঠল দু'জনে একযোগে। অবাক বিস্ময়ে ভাবল রানা, নিজের ভয়ঙ্কর বিপদ আঁচ করতে পারছে লোকটা, অথচ···

বাইরে বেরিয়ে রিস্টওয়াচে মাত্র দশটা বাজতে দেখে অবাক হয়ে গেল রানা। মনে হচ্ছিল, কয়েক ঘণ্টা কথা বলেছে ও জামাল আসালানের সাথে।

দৌড়ুতে শুরু করল রানা। ঠিক দশটাতেই ওদের ডিটাচমেন্টের ডিউটি গানপিটে। দু'মিনিট দেরিতে পৌঁছুল রানা। সকলের মনে ওর বিরুদ্ধে বিষ ছড়িয়ে দিয়েছে সাইয়িদ হাকাম, ধরেই নিয়েছিল রানা। কিন্তু গোসল করতে এত দেরি হলো কেন এ প্রশ্ন তো উঠলই না, সাইয়িদ হাকাম ওকে দেখেও কোনরকম ভাব প্রকাশ করল না।

সবাইকে নতুন একটা হুকুম নিয়ে আলোচনা করতে দেখল রানা। হুকুমটা হলো, এখন থেকে ওরা বিশ হাজার ফুট উঁচুতে পর্যন্ত কামান দাগতে পারবে। অবশ্য, অনুমতি ছাড়া কাজটা ওরা গত তিনমাস ধরেই করে আসছে।

আট

ঘুম ওদের কেড়ে নিল মাথার উপর অদৃশ্য শত্রুরা। আসছে, আসছে, আসছেই—একের পর এক মিছিলের মত। মৃদু, ভোঁতা গুঞ্জন শুধু শোনা যায়। ক্রমশ সামান্য একটু স্পষ্ট

হয়, তারপর অস্পষ্ট হতে হতে মিলিয়ে যায় দূরে। গুলি করার কোন সুযোগই পায় না ওরা।

এদ্ দায়রা থেকেও কোন প্লেন উড়ল না। উপত্যকার উপর দিয়ে ছুটে আসা বাতাস আজ রাতে হঠাৎ যেন খুব ঠাণ্ডা বলে মনে হলো রানার। একটা থেকে চারটে পর্যন্ত দ্বিতীয় ডিটাচমেন্ট রইল গানপিটে। কেউ বিশেষ ঘুমাতে পারল না। রানার যখন ঘুম মত এল, চারটে বাজছে তখন। ক্লান্ত শরীরটাকে টেনে নিয়ে গেল ও গানপিটে। তখনও মাথার উপর দিয়ে অদৃশ্য শত্রুদের মিছিল চলেছে—তবে সংখ্যায় এখন কম।

ভোর রাতের এই ডিউটির সময় হঠাৎ রানাকে একা করে দেয়া হলো দল থেকে। সাইয়িদ হাকামের নেতৃত্বে গোল হয়ে বসেছে সবাই, মনোযোগ দিয়ে তার কথা গিলছে প্রত্যেকে। আর মাঝে মাঝে আড়চোখে এক একজন এক একবার তাকাচ্ছে ওর দিকে।

বিশেষ গুরুত্ব দিল না রানা ব্যাপারটায়। মন থেকে সরাতে পারছে না ও একটা কথাঃ আজ শুক্রবার।

সত্যিই কি কিছু ঘটবে?

ছয়টায় আবার ছাউনিতে ফিরে যাবার সময় হলো ওদের ডিটাচমেন্টের। নবারুণের হলুদ মেখে ফিরছে ওরা। এমন সময় রাস্তার উপর দিয়ে বিদ্যুতবেগে একটা ভ্যানকে ছুটে আসতে দেখে, রানা বাদে থমকে দাঁড়াল সবাই। নিজের খেয়ালে হাঁটছে রানা। ভ্যানটা দেখতে পেয়েছে ও, কিন্তু ওটার স্পীড দেখে চমকে ওঠার মত কিছু পায়নি। এই ভ্যানগুলো ওই রকমই, স্টেশনে ঢোকেও তীরবেগে, বেরিয়েও যায় তীরবেগে। মুখ তুলে আর একবার তাকাল রানা। পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সেই মুহূর্তে ও। তারপরই লাফ দিয়ে রাস্তায় উঠে প্রাণপণে দৌড়ুতে শুরু করল।

প্রিজন ভ্যানটার ছাদের কাছে লোহার শিক দিয়ে ঘেরা ছোট্ট একটা ভেন্টিলেটার। সেখানে একটা মুখ দেখতে পাচ্ছে রানা। লোকটা ব্যাকুল দৃষ্টিতে চেয়ে আছে রানার পিছনে, গানপিটের দিকে। সামনে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে ভ্যানটা, সাথে সাথে ছুটছে রানা।

'কে?' চিৎকার করে উঠল রানা উন্মাদের মত, 'কে? কে?'

'জামাল আরসালান!' রানাকে দেখতে পেয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠল লোহার ফ্রেমের মাঝখানে মুখটা। অস্পষ্ট হলেও পরিষ্কার শুনতে পেল রানা আতাসীর কণ্ঠস্বর।

দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে ভ্যানটা। ভোরের বাতাসে এলোমেলো চুল উড়ছে রানার। কি মনে হতে পিছন ফিরতেই দেখল তিন হাত তফাতে দাঁড়িয়ে আছে গোটা ডিটাচমেন্ট। সকলের চোখমুখ বেজায় গম্ভীর। সাইয়িদ হাকাম ওর দিকে পা বাড়াল।

'ঠ্যাং খোঁড়া করে দেব কেউ আমার সাথে কথা বলতে এলে,' শান্তভাবে বলল রানা। তারপর দৃঢ় ভঙ্গিতে হাঁটতে শুরু করল ও। ছাউনিতে ঢুকে সোজা উঠল বিছানায়। মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে শুধু আতাসীর কথা। জামাল আরসালান কি জানতে পেরেছে ওর পরিচয়? আতাসীকে স্টেশন থেকে সরিয়ে দেয়ার ব্যাপারে তার কি কোন হাত আছে? কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আতাসীকে?

ক্লান্তি, প্রচণ্ড ক্লান্তি। ঘুম এল ওর নিজের অজ্ঞাতেই।

সাড়ে ন'টার সময় জাগল রানা। ব্যাগ থেকে চকলেট বের করে খেল ক'টা। গোসল করার জন্যে বেরিয়ে পড়ল খানিকপরই। চৌরাস্তায় গেছে, এমন সময় তপ্ত রোদকে কাঁপিয়ে দিয়ে গম গম করে উঠল লাউডস্পীকার। 'অ্যাটেনশান, প্লীজ! অ্যাটেনশান, প্লীজ! টাইগার স্কোয়াড্রনকে এই মুহূর্তে তৈরি হতে বলা হচ্ছে।'

ফ্লায়িং ফিল্ডের চারদিক থেকে একযোগে গর্জন তুলল অনেকগুলো প্লেনের ইঞ্জিন।

মাত্র পনেরো সেকেন্ড পর লাউডস্পীকার আবার ঘোষণা করল, 'টাইগার স্কোয়াড্রন স্ক্র্যাম্বল! টাইগার স্কোয়াড্রন স্ক্র্যাম্বল। টাইগার স্কোয়াড্রন স্ক্র্যাম্বল! ইমিডিয়েটলি। স্ক্র্যাম্বল! স্ক্র্যাম্বল!'

ইতস্তত করতে লাগল রানা। দাড়ি কামাবার সময় কি পাবে ও? চৌরাস্তা থেকে পঞ্চাশগজ মাত্র এগিয়েছে, একটা কণ্ঠস্বর শরীরে যেন ওর শান্তির ঠাণ্ডা পরশ বুলিয়ে দিল, 'গুডমর্নিং!'

ফিরতেই ইফফাতকে গালে টোল ফেলে হাসতে দেখল রানা।

'আমরা পরস্পরকে চিনি কিনা?' জানতে চাইল ইফফাত।

'মানে?'

'পাশ ঘেঁষে চলে গেলে, কই, কথা তো বললে না? জানি, কি বলবে—দেখতে পাওনি।'

মৃদু হাসল রানা।

'কি ব্যাপার?' উদ্বেগের ছায়া পড়ল ইফফাতের মুখে। 'কি হয়েছে তোমার? কথা বলছ না কেন?'

'কথা বলে কি হবে? কিছু কাজ দেখাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু নিরিবিলি জায়গা নেই কোথাও এখানে।' চারদিকে তাকাল রানা। 'নাহ্! সত্যি নেই। তোমাদের লিভিং কোয়ার্টারে আছে নাকি, ইফফাত?'

'আছে,' হাসি চেপে বলল ইফফাত। 'কিন্তু সেখানে গেলেই সাইয়িদ হাকামের হাতে ধরা পড়ে যাবে তুমি।'

টনক নড়ল রানার। 'তার মানে?' পরমুহূর্তে নিজেই বলল, 'বুঝেছি। আমার খোঁজে তোমার কোয়ার্টারে গিয়েছিল সে কাল রাতে!'

'শুধু গিয়েছিল? রীতিমত জেরা করে কথা বের করতে চেয়েছিল পেট থেকে। তোমার দিকে চেয়ে মনে মনে কেঁদেছি আর দোয়া করেছি, আল্লা যেন না পড়ে, আল্লা যেন না পড়ে, আর ওর প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি...।'

'কি! আমাকে তুমি দেখেছ?'

'পরিষ্কার দেখেছি। পড়োনি সে তো আমারই দোয়ায়।' হাসতে লাগল ইফফাত। 'আসলে, আমি জানতাম, ওই পথেই উঠতে হবে তোমাকে। তাই অনেক আগে থেকেই ওদিকে তাকিয়ে ছিলাম। তা, কি ঘটল? সারারাত ঘুমুতে পারিনি আমি তোমার জন্যে...।'

সংক্ষেপে সব কথা বলল রানা।

'চমকে দেব তোমাকে, দাঁড়াও,' রানার একটা হাত ধরে রাস্তার এক ধারে সরিয়ে নিয়ে গেল ইফফাত। 'গতরাতে শাফা ঘুমের মধ্যে কথা বলছিল। জানোই তো, ওর পাশের বিছানাটাই আমার। তোমার দুশ্চিন্তায় ঘুম আসছিল না, ওর কথা তাই না শুনে আমার উপায় ছিল না।'

'কি বলছিল শাফা?' কৌতূহলে তীক্ষ্ণ শোনাল রানার কণ্ঠ।

'বলছিল, রানাকে আমি প্রাণ দিয়ে ভালবাসি।' নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বলল ইফফাত।

'আহ্, ইফফাত! এখন ঠাট্টা করার সময় নয়। কি বলেছে বলো তাড়াতাড়ি।'

হাসি মিলিয়ে গেল ইফফাতের মুখ থেকে। 'আরসালান, এখানে আমি থাকব না, থাকব না। তুমি এখান থেকে আমাকে নিয়ে চলো, প্লীজ! আমার ভীষণ ভয় করছে। ওরা হ্যাঙ্গারে পর্যন্ত আঘাত করবে—ঠিক এই কথাগুলো নিজের কানে শুনেছি আমি,' বলল ইফফাত। 'আরও একটা ব্যাপার। আজ সকালে অস্বাভাবিক আচরণ করতে দেখলাম ওকে। ভয়ে যেন সিঁটকে আছে।'

খারাপ ভাল কিছুই বলল না রানা। চোয়াল দুটো শুধু উঁচু হয়ে উঠল দু'বার। 'আর কিছু বলেনি?'

'হ্যাঁ, বলেছে—কিন্তু পরিষ্কার ধরতে পারিনি আর একটা কথাও। দুটো কি তিনটে শব্দ অবশ্য শুনেছি, কিন্তু অর্থ করতে পারিনি। আমার জন্মদিন—এই দুটো শব্দ দু'তিনবার উচ্চারণ করেছে। আর, আল মাকারদানা—এই শব্দটা। কি একটা জায়গার নাম না আল মাকারদানা?'

দূরে সাইরেন বাজতে শুরু করল এমন সময়। চৌরাস্তার দিকে তাকাতেই মোটরসাইকেলে একজন সোলজারকে দেখল রানা। তীরবেগে ছুটছে সে ছাউনির দিকে। 'ওই যাচ্ছে, টেক পোস্ট ঘোষণা করতে।' ওর দিকে তাকাতে হাত নেড়ে জানিয়ে দিল রানা মেসেজটা বুঝতে পেরেছে ও। 'তোমার ডিউটি নেই আজ?'

'না,' বলল ইফফাত। 'কি বুঝছ, রানা? আক্রমণ সত্যি আজ হবে? আচ্ছা, গানপিটে যদি আমি···।'

'দূর! আর হলেই বা কি! সবগুলোকে নামিয়ে আনব, দেখো না! ভাল কথা, শেলটার ছেড়ে নড়বে না কিন্তু তুমি।'

'আর তুমি?'

হেসে ফেলল রানা। পরমুহূর্তে উদ্বিগ্ন দেখাল রানাকে, 'আমি যোদ্ধা, ইফফাত। রেইডের সময় কোথায় থাকব এ-কথা জিজ্ঞেস করা কি উচিত?' ইফফাতের দু'কাঁধে হাত রাখল ও। 'খবরদার, শেলটার ছেড়ে ভুলেও বেরুবে না।'

'কিন্তু···।'

লাউডস্পীকার জানিয়ে দিল কঠোর নির্দেশ, 'প্রিলিমিনারি এয়ার রেইড ওয়ার্নিং! প্রিলিমিনারি এয়ার রেইড ওয়ার্নিং! গ্রাউন্ডে এয়ারক্রাফট দেখাশোনার কাজে নিযুক্ত নয় এমন সব ব্যক্তিকে শেলটার নিতে হবে!'

'কথা দাও, ইফফাত!' চারদিকে হঠাৎ মানুষজনের ছুটোছুটি শুরু হয়ে গেল। 'কথা দাও, শেলটার ছেড়ে তুমি বেরোবে না, যতক্ষণ অল ক্লিয়ার সিগন্যাল না দেয়া হয়।'

'কিন্তু তুমি আমার কথা মনে রেখে সাবধানে থাকবে…।'

'টেক শেলটার ইমিডিয়েটলি! টেক শেলটার ইমিডিয়েটলি! ডিউটিতে নেই এমন সব ব্যক্তিকে শেলটার নিতে হবে এই মুহূর্তে।'

'কথা দিচ্ছি, কিন্তু…।'

ইফফাতকে ছেড়ে দিয়ে ছুটল রানা। চিৎকার করে বলল, 'আবার দেখা হবে।'

ফ্লায়িং ফিল্ডের কিনারায় পৌঁছেচে রানা, পিছন থেকে কাফা হাঁক ছাড়ল, 'দোস্ত, আমাকে ফেলে যেয়ো না।'

পিছন ফিরল রানা। কাফাকে দেখে হেসে ফেলল ও। গওহর জুমলাতের সাইকেলটা তীরবেগে চালিয়ে আসছে সে। পাশে থামল ব্রেক কষে। 'ধরা ছোঁয়ার বাইরে কিনা শালারা, বড় ভয় করে।' সাইকেলটা রানার গায়ে ঠেকিয়ে ছেড়ে দিল সে। 'দোস্ত, হাত কাঁপছে, চালাতে পারব না আর।'

গানপিটে পৌঁছে গোটা ডিটাচমেন্টকে হাজির দেখল রানা।

'বড় আকারের একটা রেইড উপকূল অতিক্রম করছে,' স্টীলের হেলমেটটা পরতে পরতে শুনতে পেল রানা কার যেন কণ্ঠস্বর। ওর স্টীল হেলমেটটা রয়ে গেছে ছাউনিতে। সেটা আনতে যাবার সময় নেই এখন।

'রানা,' গওহর জুমলাত বলল, 'ফোনটা তোমার দায়িত্বে থাকল।'

কানে গোঁজার জন্যে দুটো তুলোর প্যাকেট খোলা হলো।

'এয়ার প্লাগ?' কাফার ঝগড়াটে গলা শুনে ঘুরে তাকাল রানা। দেখল, মারমুখো হয়ে আছে কাফা। 'খুনোখুনি হয়ে যাবে কেউ যদি দ্বিতীয়বার কানে তুলো দিতে বলে আমাকে। কি ভেবেছ তোমরা আমাকে? যদি মরি, নিজের কান্না পর্যন্ত শুনে মরতে পারব না? ইয়ার্কি মারার…।'

'অ্যাটেনশান, প্লীজ! অ্যাটেনশান, প্লীজ! ইগল স্কোয়াড্রন স্ক্র্যাম্বল! ঈগল স্কোয়াড্রন স্ক্র্যাম্বল! স্ক্র্যাম্বল! স্ক্র্যাম্বল!'

নাবাতিয়ায় রানা আসার পর এই প্রথম একই সময়ে দুটো স্কোয়াড্রনকে বেরিয়ে আসতে বলা হলো আন্ডারগ্রাউন্ড শেলটার থেকে।

অফিসার্স মেসের দিক থেকে ঝড় তুলে ছুটে আসছে একটা কার পাইলটদের নিয়ে। কয়েকজন পাইলট ছুটে আসছে রাস্তা ধরে। পুরো পোশাকে সজ্জিত সবাই। তাদের মধ্য ইউনুস মেহেরকেও দেখল রানা। কি সাবলীল ভঙ্গিতে ছুটছে সে।

গানপিটের পাশ দিয়ে যাচ্ছে ইউনুস। রানাকে দেখে হাত নাড়ল সে। নিখুঁত ভঙ্গিতে স্যালুট করল রানা।

'আমাদের নতুন স্কোয়াড্রন লিডার ইউনুস মেহের না ও?' প্রশ্নটা যাকের নঈমের। 'সত্যি তাহলে পরিচয় আছে তোমার সাথে?'

'কে বলল?' জবাবটা কাফার কাছ থেকে পেল যাকের। 'ও তো তোমাকে উদ্দেশ্য করে হাত নাড়ল।'

ডিসপারসাল পয়েন্টে হারিয়ে গেল ইউনুস। কয়েক মুহূর্ত পরই ইঞ্জিনের শব্দে কেঁপে উঠল পায়ের তলার মাটি। বেরিয়ে এল ইউনুসের মিগ সেভেনটিন।

খ্যাপা ষাঁড়ের মত ছুটে গেল মিগটা রানওয়ের উপর। চারদিক থেকে আরও মিগ ছুটে আসছে ওখানে।

স্কোয়াড্রনটা টেক-অফ শুরু করতেই ফোন বাজল। কপালের ঘাম মোছার জন্যে হাত তুলেছিল রানা, ঘাম না মুছেই হাত বাড়িয়ে রিসিভার কানে তুলল ও। 'ফোর।'

'একমিনিট,' অপারেশন কন্ট্রোলরূম থেকে ভেসে এল একটা কণ্ঠস্বর, 'সতর্ক-সঙ্কেত আসছে একটা' সাত সেকেন্ডের নীরবতা। তারপর সতর্ক-সঙ্কেত, 'চারশো, আই রিপিট, চারশো শত্রু-বিমানের একটা ঝাঁক আসছে। পঞ্চাশ মাইল দক্ষিণ-পুবে, আসছে উত্তর-পশ্চিম মুখো হয়ে। উচ্চতা পঁচিশ হাজার ফুট।'

গওহর জুমলাতকে জানাল রানা সঙ্কেতটা। সবাই খবরটা নীরবে গ্রহণ করল। কিন্তু কারও মুখের চেহারা নিভাঁজ থাকতে দেখল না রানা। সবাই কি ভাবছে, বুঝতে পারল ও। ও নিজেও ভাবছে সেই কথাটাঃ শত্রুর লক্ষ্য কি আজ নাবাতিয়া?

'অ্যাটেনশান, প্লীজ! অ্যাটেনশান প্লীজ!' আবার লাউডস্পীকার। 'অ্যাটাক অ্যালার্ম। অ্যাটাক অ্যালার্ম! অ্যাটেনশান, প্লীজ! অ্যাটেনশান, প্লীজ!' লোমকূপ দাঁড়িয়ে যাচ্ছে শরীরের, অনুভব করল রানা। 'অ্যাটাক অ্যালার্ম! অ্যাটাক অ্যালার্ম! টেক কাভার ইমিডিয়েটলি! অ্যাটাক অ্যালার্ম। অফ!'

লাউডস্পীকার থামতে ভৌতিক নির্জনতা নেমে এল গানপিটে। পাশে তাকাতেই প্রার্থনা করার ভঙ্গিতে দুটো হাত একত্রে দেখল রানা। আকাশের দিকে হাত তুলে চোখ বুজে আছে কাফা। কেউ হাসছে না এখন আর তাকে দেখে।

মাটির সাথে পুঁতে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে যেন ওদেরকে। আকাশের দিকে মুখ। চোখের মণি ঘুরছে। টান টান হয়ে আছে শরীর। আকাশটাকে আশ্চর্য নীল দেখাচ্ছে আজ। ঈগল স্কোয়াড্রন আকাশের গায়ে সাদা ধোঁয়ার একটা রেখা ছাড়তে ছাড়তে দক্ষিণ-পুব দিকে উঠে গেল। বিনকিউলার চোখে এঁটে গওহর জুমলাত আকাশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত চষে ফেলছে।

প্রচণ্ড গরমে সেদ্ধ হচ্ছে ওরা। কড়া রোদ লেগে চকচক করছে ঘামে ভেজা মুখগুলো।

'সূর্যের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসবে ওরা,' বলল তাইয়েব সায়ানী।

'চুপ!' স্বভাবের বিরুদ্ধে প্রায় গর্জে উঠল গওহর জুমলাত।

শোনা যায় কি যায় না, অস্পষ্ট একটা গুঞ্জন শুনতে পেল রানা। অনেক উঁচুতে ওটা, দেখতে পাবার কথা নয়।

'মনে হয়, আসছে,' যাকের বলল।

'অথচ আমাদের লড়াকুরা একটাও নেই কাছে পিঠে।'

গুঞ্জনটা বাড়ছে।

'দোস্ত,' রানার কানের কাছে ফিস ফিস করে উঠল কাফা, 'সত্যিই কি পাইলটটা বলেছিল আজ কেয়ামত দেখিয়ে দেয়া হবে আমাদের?'

মাথা নাড়ল রানা। 'না, তা বলেনি।'

কি বলেছিল তা আর বলল না রানা। কটমট করে যাকের নঈম তাকাতে কাফাও আর কোন প্রশ্ন করল না।

কিন্তু পনেরো সেকেন্ড পরই অখণ্ড নিস্তব্ধতা খান খান হয়ে পড়ল তার চিৎকারে। 'শালারা! বেজন্মার বাচ্চারা! তোদের আমি ইয়ে করি! সাহস থাকে তো নেমে আয়, দেখি কত বাহাদুরি আছে তোদের বাহুতে। বেয়োনেট দিয়ে তোদের শালা আমি...'

উন্মাদের মত লাফাচ্ছে কাফা। রানাকে পা বাড়াতে দেখে সম্মতি দেবার ভঙ্গিতে মাথা দোলাল গওহর জুমলাত। ঠাস করে একটা চড় মারল রানা কাফার গালে।

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গালে হাত দিল কাফা। 'দোস্ত, তুমি আমাকে মারলে?'

তীক্ষ্ণ চোখে দেখল রানা কাফাকে। অভিমানে দু'চোখ ভরে উঠল তার পানিতে।

তার কাঁধে হাত রাখল রানা। হাসল হঠাৎ। 'ঠাট্টা করলাম, কাফা। তোমাকে কি সত্যি সত্যি মারতে পারি?'

ছেলেমানুষের মত সরল হাসি ফুটে উঠল কাফার মুখে। নিজের জায়গায় ফিরে গিয়ে সিগারেট বের করল সে। তার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে গওহর জুমলাতের দিকে তাকাল রানা। চিন্তিত দেখাচ্ছে জুমলাতকে। চিন্তাটা অকারণে নয়, ভাবল রানা। ভয়, আতঙ্ক আর অপেক্ষার উত্তেজনা—একজন মানুষকে পাগল করে দেবার জন্যে যথেষ্ট। কাফার মত দুর্বলচেতা মানুষের জন্যে কথাটা আরও সত্যি।

'কিন্তু এখনও এমন কিছু দেখছি না যাতে মনে করা যেতে পারে যে আক্রমণ নাবাতিয়ার ওপর হবে।'

যাকের থামতেই সাইয়িদ হাকাম বলল, 'আর কোন কথা নেই নাকি? কে কি বলল আর অমনি সবাই তোমরা সেটা নিয়ে মেতে উঠলে। ঘেন্না ধরে গেল আমার!'

'ওই ওপরে দেখো!' জাফরী মাথার উপর হাত তুলে তর্জনী দিয়ে উত্তর-পশ্চিমের আকাশ দেখাল। সূর্যের ঠিক বাঁ পাশে কি যেন চিকচিক করে উঠল।

চোখ কুঁচকে তাকাল ওরা। কারও চোখে কিছু ধরা না পড়লেও ইঞ্জিনের শব্দ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। জাফরীর দেখানো দিক থেকেই আসছে যেন।

'ওই ওই যে!' লাফ দিয়ে এক পা এগিয়ে গেল জাফরী। 'এক, দুই, তিন,...সব ক'টাকে দেখতে পাচ্ছি আমি—এগারোটা।' মাথাভর্তি সোনালী চুল কপালটা ঢেকে ফেলেছে ওর।

'পেয়েছি, আমি দেখতে পেয়েছি!' বলল কুতুব দীন।

চওড়া জুলফীর ভিতর আঙ্গুল ঢুকিয়ে চুলকাচ্ছে গওহর জুমলাত। রানার দিকে এইবার নিয়ে দু'বার তাকাল সে কিন্তু কিছু বলল না। জাফরীর হাতে তুলে দিল সে বিনকিউলার। 'তুমিই দেখো, আমার চোখে তা ধরা পড়ছে না। এগারোটা হলে

শত্রুপক্ষ বলে মনে করি না।'

পনেরো সেকেন্ড পর জাফরী বলল, 'হ্যাঁ, ভুল হয়নি আমার। এগারোটাই। তোমার কথাই ঠিক। আমাদের মিগ ওগুলো।'

ফোন বাজল।

অপারেশন কন্ট্রোলরুম থেকে ভেসে আসা কণ্ঠস্বর শুনতে শুনতে অদ্ভুত একটা রোমাঞ্চ অনুভব করল রানা। রিসিভারটা নামিয়ে রেখে গওহর জুমলাতের দিকে ফিরল ও।

'তোমার পায়ে পড়ি, দোস্ত। দয়া করে বোবা হয়ে থেকো না!' সারাক্ষণ ঠোঁট ফাঁক করে আছে কাফা, সামনের পাটির দাঁতগুলো বাইরের দিকে বেরিয়ে আছে।

চোখ নামিয়ে সবাই চেয়ে আছে রানার দিকে।

'প্রথম রেইডটা ছড়িয়ে গেছে,' বলল রানা। 'কিন্তু আর একটা উপকূল অতিক্রম করছে এই মুহূর্তে। একশো বোমারুকে সাথে নিয়ে আসছে তিনশো ফাইটারের বিরাট একটা ঝাঁক। বোমারুগুলো বিশ হাজার আর ফাইটারগুলো পঁচিশ-ত্রিশ হাজার ফুট উঁচুতে।'

কেউ কথা বলল না। নিজের অজান্তেই প্রত্যেকে তাকাল আকাশের দিকে। বিড় বিড় করতে শুরু করল কাফা আপন মনে।

রোদে পুড়ে কালো হয়ে গেছে সারা গা-হাত-পা, খোঁচা খোঁচা দাড়ি মুখে, গোসল হয়নি, নোংরামাখা খনি-শ্রমিকদের মত চেহারা হয়েছে প্রত্যেকের।

একটা সিগারেট ধরিয়ে কাফার আঙুলের ফাঁকে গুঁজে দিল রানা।

রানার গায়ের কাছে চলে এল কাফা। 'দোস্ত, ঠিক এই ভাবে কেউ যদি একটা বেয়োনেট ধরিয়ে দিত আমার হাতে!'

অ্যারোড্রোমের উপর চক্কর মারছে দুটো স্কোয়াড্রন।

এইভাবে অপেক্ষার পালা চলছিল। ঠিক কতক্ষণ ধরে আকাশ দেখছে, খেয়াল নেই কারও। কোন ঘটনা নেই। শুধু দুটো স্কোয়াড্রন চক্কর মারছে আর চক্কর মারছে। সময় বয়ে যাচ্ছে ওদের অজ্ঞাতসারে। কথাবার্তা প্রায় হলোই না। এমন কি কাফা পর্যন্ত বটবৃক্ষের মত নীরব। অপেক্ষার উত্তেজনা সকলের চোখে মুখেই স্পষ্ট ফুটে রয়েছে।

লাউডস্পীকারের যান্ত্রিক ঘর ঘর শুনে পরস্পরের দিকে তাকাল ওরা। কিন্তু না, কোন দুঃসংবাদ নয়।

'অ্যাটেনশন, প্লীজ! আবার জ্বালানী আর গোলাবারুদ নেবার জন্যে নেমে আসছে আমাদের প্লেন। বিমান বাহিনীর সকল কর্মীকে প্রস্তুত থাকতে বলা হচ্ছে। যথাসম্ভব দ্রুত আবার উড়ে যাবে প্লেনগুলো। সকল কর্মীকে প্রস্তুত থাকতে বলা হচ্ছে। অফ।'

'তার মানে আমাদের ফাইটারগুলো কোথাও তাহলে সত্যিই যুদ্ধ করে এসেছে!'

রিস্টওয়াচ দেখল রানা, এগারোটা বেজে দশ। দ্বিতীয় রেইডটাও সম্ভবত ছড়িয়ে পড়েছে, ভাবল ও। খুব কাছে ইঞ্জিনের শব্দ হতে মুখ তুলল ও।

পুব দিকের খুব নিচু দিয়ে আসছে বলে কারও চোখে ধরাই পড়ল না।

'কি করে বুঝব ওটা আমাদের কিনা?'

হঠাৎ দেখা গেল প্লেনটাকে। বিদ্যুৎগতিতে ছুটে এল সেটা ওদের উপর। মাথার উপর দিয়ে খানিকদ্দূর গিয়েই নামল রানওয়েতে। কংক্রিটের সাথে চাকার ঘর্ষণের বিকট শব্দ—চারদিক থেকে ভেসে আসতে লাগল একের পর এক।

রানওয়ে জুড়ে তীরবেগে ছুটোছুটি শুরু হলো পেট ভর্তি পেট্রলওয়ালা ট্রাকগুলোর। জ্বালানী নিয়ে এক এক করে উঠে যাচ্ছে দুই স্কোয়াড্রনের প্লেন। স্কোয়াড্রন ঈগলের একটা প্লেনের লেজ অর্ধেকটা নেই দেখল রানা। আরেকটার ডানা মোচড়ানো অবস্থায় দেখল ও। আরও কয়েকটা অ্যারোড্রোমে প্লেন নামল রানওয়েতে। তার মধ্যে দুটো মিরেজ। একটার আবার ককপিট উড়ে গেছে গোলা খেয়ে। সবার শেষে নামল ইউনুস মেহের। ককপিট থেকে হাত নাড়ল সে রানার উদ্দেশে।

পঁচিশ মিনিট বাকি বারোটা বাজতে। শরীরের যেখানেই লাগছে, আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে যেন বাতাস। যতদূর দৃষ্টি যায়, উষর মরুভূমি তপ্ত রোদে কাঁপছে বলে মনে হয়।

'ঘাম যেন নদীর মত বইছে শরীরে!' কপালে আঙ্গুল বুলিয়ে ঘাম ঝরাল কাফা।

নাবাতিয়া আক্রান্ত হয়নি এখনও। তবে যুদ্ধ চলছে অন্যত্র। স্কোয়াড্রন দুটো যুদ্ধ করার জন্যে আবারও চলে গেছে নিজেদের এলাকা ত্যাগ করে। অপারেশন কন্ট্রোলরুমে দু' দু'বার ফোন করল ও। নতুন কিছুই বলতে পারল না তারা।

'শুনতে পাচ্ছ?' কে যেন বলল হঠাৎ। অস্পষ্ট, কিন্তু ভরাট একটা গুঞ্জন। অনেক দূর থেকে আসছে। ভোজবাজির মত হঠাৎ মাথার উপর উদয় হলো ওদের দুটো স্কোয়াড্রন। চক্কর দিতে শুরু করল অ্যারোড্রোমকে ঘিরে।

পরিষ্কার অনুভব করল রানা, ঘটনা মোড় নিতে শুরু করেছে। সকলের দিকে তাকিয়ে বুঝল, কারও জানতে বাকি নেই ব্যাপারটা। এমন সময় লাউডস্পীকার ঘরঘর করে উঠল।

'অ্যাটেনশান, প্লীজ!' ঘোষক অস্বাভাবিক দ্রুত কথা বলছে। 'অ্যাটেনশান, প্লীজ! বিশাল ঝাঁকের আক্রমণ সঙ্কেত! বিশাল ঝাঁকের আক্রমণ সঙ্কেত! মাস ফরমেশন অ্যাটাক অ্যালার্ম! মাস ফরমেশন অ্যাটাক অ্যালার্ম! উড়তে পারে এমন সব এরোপ্লেনকে এই মুহূর্তে মাটি ছাড়ার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। অল এয়ারক্রাফট স্ক্র্যাম্বল! অল এয়ারক্রাফট স্ক্র্যাম্বল! স্ক্র্যাম্বল! স্ক্র্যাম্বল!' গুরুত্ব বোঝাবার জন্যে সেই একই ঘোষণা আবার,'...বিশাল ঝাঁকের আক্রমণ সঙ্কেত! বিশাল...!'

ব্যাপক আক্রমণের পূর্বাভাস নাবাতিয়ায় এই প্রথম। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল কাফা। কিন্তু রানা ছাড়া আর কারও নজরেই পড়ল না ব্যাপারটা। ক্রমশ বাড়ছে আওয়াজ। শব্দে কোন কম্পন নেই, গভীর একটা গুঞ্জন শুধু।

প্রতিটি ডিসপারসাল পয়েন্ট থেকে ঝাঁকুনি খেতে খেতে বেরিয়ে আসছে প্লেনগুলো। গোটা অ্যারোড্রোম জুড়ে পাইলট, ক্রু, টেকনিশিয়ানদের ছুটোছুটি চলছে। ভাঙাচোরা, উড়তে পারার কথা নয়—অথচ আকাশে ডানা মেলে উড়ে যাচ্ছে একের পর এক প্লেনগুলো।

তারপর হঠাৎ গোটা অ্যারোড্রোম যেন মৃত নগরীতে পরিণত হলো। মানুষের একটা ছায়া পর্যন্ত দেখল না কোথাও রানা। প্লেনগুলো সব উড়ে গেছে, আকাশে তাদেরকে এখন এক একটা কালো বিন্দুর মত দেখাচ্ছে।

'দেখো-দেখো! ওই দেখো!' থরথর করে কাঁপছে জাফরীর হাতটা।

ঘুরে দাঁড়াল রানা, চোখের উপর হাত রেখে রোদ আটকে তাকাল। গুনতে শুরু করেছে এতক্ষণে জাফরী। হাল ছেড়ে দিল সে পরমুহূর্তে। 'অসম্ভব! ওপরে আরও কয়েকটা ঝাঁক—দেখতে পাচ্ছ?'

কিছুই দেখল না রানা সেই মুহূর্তে। পরিচ্ছন্ন নীল আকাশ, এক ফোঁটা মেঘ নেই কোথাও। তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখে জ্বালা শুরু হলো, হঠাৎ আলোর অত্যুজ্জ্বল একটা কণা দেখল ও। চোখ বুজে ফেলে মাথাটা ঝাঁকি দিল ও। সারাক্ষণ ভারি, ভরাট গুঞ্জনটা বাড়ছেই। দক্ষিণ-পুব দিক থেকে আসছে সেটা। চোখে গ্লাস এঁটে গভীর মনোযোগের সাথে চেয়ে আছে সেদিকে গওহর জুমলাত। ওদের ফাইটারগুলোকে দেখতে পাচ্ছে রানা। দেখল, চক্কর মারা বন্ধ করে স্কোয়াড্রন দুটো সূর্যের ভিতর অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ শত্রু-বিমানের বিশাল ঝাঁকটা চোখে পড়ল ওর। কালো অশুভ বাদুড়ের মত শত্রু-বিমানের স্পষ্ট তিনভাগে বিভক্ত ঝাঁকটাকে আরও আগে দেখতে না পাওয়ায় আশ্চর্য হয়ে গেল রানা। সবচেয়ে নিচের স্তরে, বিশ হাজার ফুট উঁচুতে, ফোলা আঙ্গুলের মত কালো রঙের বোমারুগুলোকে দেখা যাচ্ছে। পঁচিশ হাজার ফুট উঁচুতে ঝলমল করছে দ্বিতীয় স্তরের ফাইটারগুলো। উজ্জ্বল আলোর কণার মত দেখাচ্ছে উপরের স্তরে প্লেনগুলোকে। কামানের ব্যারেল ঝাঁকটাকে অনুসরণ করে ঘুরতে শুরু করেছে ইতিমধ্যে। চোখ থেকে হঠাৎ গ্লাস জোড়া নামাল গওহর জুমলাত। শান্ত এবং সহজভাবে বলল, 'হ্যাঁ, আকাশের এই আক্রমণ আমাদেরকে লক্ষ্য করেই।' তিন সেকেন্ড বিরতি দিয়ে আবার বলল সে, 'ফিউজ টোয়েনটি ফাইভ। লোড!'

শব্দ শুনে মুখ ফেরাতেই রানা দেখল মুখের কাছ থেকে বাঁ হাতটা নামাচ্ছে কাফা। 'ও কি!' কাফার শার্টের আস্তিন ছেঁড়া, ইতিমধ্যে খানিকটা জায়গা ভিজে গেছে রক্তে।

থোঃ থোঃ করে থুথু ফেলল কাফা। ব্যথায় বিকৃত মুখটা আরও কদাকার হয়ে উঠল হাসতে চেষ্টা করায়। 'কামড়ে খানিকটা চামড়া তুলে নিলাম, দোস্ত! ভয়টাকে তাড়াবার জন্যে!'

পাশেই বালির বস্তা, তার উপর আগেই তৈরি রেখেছিল একটা শেল বম্বারডিয়ার সাইয়িদ হাকাম, ফিউজ সেট করে সেটা সে তুলে দিল কুতুব দীনের হাতে। কুতুব দীন ছুটল কামানের দিকে। তার হাত থেকে শেলটা নিয়ে কামানে ঢোকাল কাফা। ব্রীচ-ব্লক উঠে যেতে ঘণ্টাধ্বনি হল। জাফরী জানাল, 'গান লোডেড!'

গওহর জুমলাত থেমে আছে। প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে আওয়াজটা। গমগম করছে এখন। খালি চোখেও এখন সবাই শত্রু বিমানগুলোর আকার-আকৃতি দেখতে পাচ্ছে।

'বোয়িং B-47 স্ট্রাটোজেট…'

'তোমার মাথা!' সাইয়িদ হাকাম তেড়ে উঠল কাফার উদ্দেশ্যে। 'বোয়িং B-52 স্টার্টো-ফোরট্রেস—উইং স্প্যান একশো পঁচিশ ফুট, দেখে বোঝো না?'

'ত্রিশ টন বোমা এক একটায়?' ঢোক গিলল জাফরী।

'সামনের ঝাঁকটা গুনেছ কেউ?'

'তেত্রিশটা পর্যন্ত।'

'তাহলে পঞ্চাশটার কম হবে না।'

'আর ফাইটারগুলো?'

'অসংখ্য।'

খালি চোখে ফাইটারগুলোর আকৃতি দেখা অসম্ভব বলে মনে হলো রানার। কিন্তু বোমারুগুলোর পিছনে এবং উপরে প্রকাণ্ড একটা ইলেকট্রিক পাখার মত আকৃতি নিয়েছে ঝাঁকটা, ক্রমশ এগিয়ে আসছে অ্যারোড্রোমের দিকে, পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রানা।

অকস্মাৎ সূর্যের চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বলতার বাইরে বিরাট এলাকা জুড়ে বেরিয়ে এল আরও প্লেন। 'ওই ওদের সাথে লড়তে যাচ্ছে আমাদের ফাইটার!' কে যেন চিৎকার করে উঠল। রুদ্ধশ্বাসে দেখছে সবাই। চারশো কিংবা তারও বেশি শত্রু-বিমানের সাথে লড়তে যাচ্ছে ওদের একুশটা। নিরাশায় ছেয়ে গেল রানার মন। মনে হলো যুদ্ধ নয়, আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে মিগগুলো। মুঠো হয়ে গেছে ওর দুটো হাত। তাকিয়ে থাকতে থাকতে ব্যথা করছে চোখ জোড়া। অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে চাইল রানা। কিন্তু মিগগুলো যেন সম্মোহিত করেছে ওকে। অবাক হয়ে চেয়ে আছে ও।

বোমারুর ঝাঁকটা একভাবে উড়ে আসছে, প্রায় ধীর গতিতে। হঠাৎ গোত্তা খেল সামনের পুরো ঝাঁকটা। বেপরোয়া গতিতে খাড়া নেমে আসছে বোমারুগুলো। ওগুলো কাছে পৌঁছুবার আগেই স্কোয়াড্রন দুটো বিচ্ছিন্ন হয়ে ছড়িয়ে পড়ল নানা দিকে। কিন্তু কয়েকটা মিগ হিংস্র ঝাঁকটার দিকে বিপুল একগুঁয়ে ভঙ্গিতে ছুটে যাচ্ছে দেখতে পেল রানা। বোমারুগুলো খাড়াভাবে ডাইভ দিতে শুরু করতেই ভরাট গমগমে আওয়াজটা মুহূর্তে বদলে গিয়ে তীক্ষ্ণ কানফাটানো শব্দ হয়ে উঠল। পরমুহূর্তে শোনা গেল এমন একটা আওয়াজ, দাঁতের উপর দাঁত চেপে বসল ওদের—মেশিনগানের ব্রাশ ফায়ার, কাফনের কাপড় টেনে ছিঁড়ছে যেন কেউ।

ঝাঁকটা থেকে একটা বোমারু খসে পড়ল। অনর্গল কালো ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ধীর-মন্থরভাবে ডিগবাজি খেতে খেতে নিচে নামছে। দূর থেকে দেখে মনে হলো আকাশের গায়ে গড়াচ্ছে প্লেনটা।

ঘাড়ের উপর প্রচণ্ড একটা ধাক্কা লাগল রানার। পরমুহূর্তে কাঁধের উপর দিয়ে দুটো পা ঝুলে পড়ল ওর বুকের দু'পাশে। মাথার উপর থেকে চিৎকার করে উঠল কাফা 'দোস্ত, ছুঁড়ে তুলে দাও আমাকে আকাশের ওইখানে...'

মুখ তুলতে রানা দেখল আকাশের দিকে তাকিয়ে এলোপাতাড়ি ঘুসি মারছে কাফা। কাঁধ থেকে ওকে নামিয়ে দিল রানা। উত্তেজনায় অধীর দেখাচ্ছে কাফাকে।

'দোস্ত, ঠাট্টা করছি না, তোমরা যদি রাজি হও, কামানের ভিতর দিয়ে গোলা হয়ে উঠে যেতে পারি আমি দুশমনদের মাঝখানে।'

রানার ধাক্কা খেয়ে টলমল করতে করতে নিজের জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল কাফা। কে কি করছে, কি বলছে—হুঁশ নেই কারও। ঠিক কি ঘটছে সে সম্পর্কে পরিষ্কার কিছুই বোঝার উপায় নেই এখন আর। চিৎকারের প্রতিযোগিতা চলছে কুতুব দীন আর জাফরীর মধ্যে। শত্রুর উদ্দেশ্যে আবার ঘুসি ছুঁড়তে শুরু করেছে কাফা। যাকের নঈম স্তম্ভিত, বিড়বিড় করে কি বলছে ঠিক শুনতে পাচ্ছে না রানা। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতেই পরপর দু'বার ঢোক গিলতে দেখল ও সাইয়িদ হাকামকে।

অবিচল শুধু গওহর জুমলাত। এক বিন্দু উত্তেজনাও তাকে স্পর্শ করতে পারেনি বলে মনে হলো রানার।

আর একটা বোমারু খসল। দ্রুত, প্রায় চোখের পলকে ডিগবাজি খেল এটা, তারপরই নাক উঁচু করে উল্টো দিকে ছুটতে শুরু করল। বোঝা গেল, বিশেষ ক্ষতি করতে পারেনি গোলাটা, কোন জায়গায় হালকা ফুটো-ফাটা করতে পেরেছে মাত্র বা খানিকটা ছাল তুলতে পেরেছে—সেই অবস্থায় বাড়ির দিকে পালাচ্ছে বোমারুটা।

বাতাস ভরে আছে ইঞ্জিনের গর্জন আর সুতি কাপড় ছেঁড়ার মত দূর থেকে ভেসে আসা স্ট্র্যাফিং-এর আওয়াজ। লকহীড F-104 স্টারফাইটারগুলোর মধ্যে ওদের মিগগুলোকে আলাদাভাবে চেনা যাচ্ছে না এখন।

প্রকাণ্ড কালো একটা বিচ্ছিন্ন মেঘের মিছিলের মত অব্যাহত গতিতে এগিয়ে আসছে বোমারুগুলো। ওগুলোর উপরে ইসরায়েলি ফাইটারগুলো বিদ্যুতের মত ছুটোছুটি করছে মিগের সন্ধানে। সবচেয়ে উপরের ফাইটারগুলো লাইনচ্যুত হয়নি এখনও। পিছু পিছু আগের মতই আসছে তারা। কখনও একা একটা, কখনও দুটো মিগকে মাঝখানের ঝাঁকটার দিকে ছুটতে দেখল রানা।

লাউডস্পীকারের শব্দ অস্পষ্ট ঠেকল কানে। 'গ্রাউন্ড ডিফেন্স সাবধান! গ্রাউন্ড ডিফেন্স সাবধান! ফায়ার ওপেন করার ব্যাপারে সতর্ক হবার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। আমাদের বীর বৈমানিকেরা শত্রু-বিমানের ঝাঁকে আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে!'

চোখ থেকে গ্লাস জোড়া নামাল গওহর জুমলাত। 'বোম্বারগুলোর লিডিং ফ্লাইটটাকে ধরো। ওখানে আমাদের ফাইটারকে কেউ দেখতে পাচ্ছ?'

কেউ দেখছে না। আমরা তৈরি, ঘোষণা দিল জাফরী। একমুহূর্ত থেমে রইল গওহর জুমলাত। রেঞ্জ মাপল সে। শত্রু-বিমানের ঝাঁকটা অ্যারোড্রোমের পুব দিকে সরে যাচ্ছে বলে মনে হলো রানার। প্রত্যেকটি ফ্লাইটে তিনটে করে প্লেন, যেন পরস্পরের সাথে সুতো দিয়ে টান করে বাঁধা, একটার কাছ থেকে আরেকটা এগিয়ে বা পিছিয়ে যেতে পারছে না।

'ফায়ার!'

গর্জে উঠল অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট গান। ব্রীচ-রিঙ লাফ দিয়ে পিছিয়ে আসতেই আগুনের শিখা আর ধোঁয়া ছুটে এল ভিতর থেকে। ব্যারেল ত্যাগ করে শিস দিয়ে

বেরিয়ে গেল শেলটা। দ্বিতীয় অ্যামুনিশন নম্বর ছুটে এল আরেকটা শেল হাতে নিয়ে। কাফা সেটাকে কামানের ভিতর গায়ের জোরে ঠেলে দিতেই আবার গর্জন তুলল কামান। অনেকগুলো শেলের ফিউজ সেট করে রেখেছে সাইয়িদ হাকাম। অ্যামুনিশন নম্বররা একটা করে হাতে তুলে নিয়ে তৈরি হয়েই আছে।

এক এক করে পরপর পাঁচটা শেল বেরিয়ে গেল। মুখ তুলল রানা। লিডিং ফ্লাইটের মাঝখানে চার জায়গায় চার মুঠো সাদা ধোঁয়া দেখল ও। ঠিক লিডিং প্লেনটার পিছনেই আরেক মুঠো ধোঁয়া চোখে পড়ল। মুহূর্তের জন্যে মনে হল শূন্যে স্থির হয়ে গেছে বোমারুটা। তারপরই নাক নামিয়ে ঝুলে পড়তে শুরু করল নিচের দিকে, ধোঁয়ার একটা চওড়া ফিতে পিছনে ফেলে আসছে। পাঁচ সেকেন্ড পর অকস্মাৎ বিস্ফোরিত হল সেটা। মুহূর্ত আগে যেখানে ইসরায়েলি বোমারুটা ছিল সেখানে আগুনের একটা ঝলক আর খানিকটা ধোঁয়া দেখা গেল শুধু।

'ফিউজ টোয়েনটি-টু!' চিৎকার করে বলল গওহর জুমলাত।

ফিউজ নিয়ে মহা ব্যস্ততায় জড়িয়ে পড়ল সাইয়িদ হাকাম। শেলের নাক-টুপিতে ধাতব পদার্থের বৃত্তটা ঘুরিয়ে নতুন ভাবে ফিউজ সেট করতে শুরু করল সে।

কামান দাগা চলতে থাকল একনাগাড়ে। বিরতির সময় দ্বিতীয় থ্রী-ইঞ্চ গানের কড়-কড় আওয়াজ কানে এল ওদের। ঝাঁকের মাঝখানে অসংখ্য ফাঁক-ফোকরে তুলোর ছোট বলের মত ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে।

'ফিউজ টোয়েনটি!'

বিশাল ঝাঁকটা অ্যারোড্রোমের প্রায় পুব দিকে সরে এসেছে। পাশ কাটিয়ে খানিকক্ষণের মধ্যেই বৈরুতের দিকে চলে যাবে বলে মনে হলো। ডগ-ফাইটিং-এ মত্ত ফাইটারগুলোর দিকে তাকাল রানা। তাকাতেই দীর্ঘ দুটো চিকন ধোঁয়ার ফিতে দেখতে পেল। ফিতের আগায় একটা করে স্টারফাইটার, প্রতিযোগিতার ভঙ্গিতে নিচে নামছে।

সরে প্রায় মাথার উপর চলে এসেছে যুদ্ধক্ষেত্রটা। অকস্মাৎ সকল শব্দকে ম্লান করে দিয়ে কানের পাশে একটা ডাইভিং প্লেনের তীক্ষ্ণ আওয়াজ হকচকিয়ে দিল রানাকে। দ্রুত এদিক ওদিক তাকাল ও। কোন্‌দিক থেকে আসছে বুঝতেই পারল না। তারপর হঠাৎ দেখল, একেবারে অ্যারোড্রোমের উত্তর প্রান্তে। নিখুঁত খাড়াভাবে পড়ছে। ডানা দুটো দু'পাশে মেলা, নাকটা মাটির দিকে, লেজটা আকাশের দিকে ক'টা গাছের পিছনে অদৃশ্য হয়ে গেল। পরক্ষণেই গাছগুলোর পিছন থেকে মাটি আর ধোঁয়া লাফ দিয়ে উঠল উপর দিকে। তারপর এল পতনের ভারি শব্দটা।

বোমারুগুলোর দিকে মুখ তুলল রানা। পশ্চিম দিকে বাঁক নিচ্ছে লিডার। হেদোগ আকুরার দিকে যাচ্ছে কিনা ঠিক বুঝতে পারল না ও। মুঠো মুঠো সাদা তুলোর মত ধোঁয়ার জাল ঘিরে আছে গোটা ঝাঁকটাকে।

অকস্মাৎ কাত হলো লিডার। হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে উঠল রানার। কি ঘটতে যাচ্ছে, পরিষ্কার বুঝতে পারল ও। সিধে হবার সময়টুকুও নিল না লিডার, ডাইভ দিতে শুরু করল সে। দূর থেকে দেখা এদ্ দায়রার পরিণতিটা চোখের সামনে ভেসে উঠল রানার...

সেই একই পরিণতি হতে যাচ্ছে ওদের।

অকস্মাৎ অ্যারোড্রামের উপর যেন হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল গোটা নরকটা। বোমারুগুলো ডাইভ দিয়ে সাত হাজার ফুট নেমে সমান্তরাল হতে না হতে সব Bofors, Hispano আর Lewis গান একসাথে বিকট শব্দে আর্তনাদ শুরু করে দিল। Bofor-এর লাল ট্রেসার শেল জ্বলজ্বলে কমলালেবুর মত বাতাস চিরে অলস ভঙ্গিতে উঠে যাচ্ছে বোমারুগুলোর সাথে দেখা করার জন্যে।

প্রথম বোমাটা অ্যারোড্রামের কোন্ দিকটায় পড়ল কেউ বলতে পারবে না। রানা দেখল গানপিটের উত্তর দিকে একটা ডিসপারসাল পয়েন্টের ঠিক পিছনের বালি আর পাথর তীরবেগে ছড়িয়ে পড়ছে শূন্যে। নাড়া খেল গানপিটটা। পরমুহূর্ত থেকে যা কিছু ঘটল, দুঃস্বপ্ন বলে মনে হতে লাগল রানার।

ইসরায়েল বোমা ফেলে কবর দিতে চাইছে যেন লেবাননকে। একের পর এক, ঝাঁক ঝাঁক, টন টন বোমার প্রপাত কবে কোন্ যুগে যেন শুরু হয়েছে, আজও তার বিরাম নেই বলে মনে হলো রানার। গোটা অ্যারোড্রাম জুড়ে বিশাল পাথর আর বালির চাঙগুলোকে মুহূর্তের জন্যে শূন্যে ঝুলে থাকতে দেখল রানা। সেগুলো নামতে শুরু করতেই চারদিক থেকে আরও অসংখ্য উঠে যাচ্ছে। চোখের সামনে এই দৃশ্যটা নাচানাচি করছে অবিরাম।

এবং সারাক্ষণ সহজভাবে ঠিক কামানের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে গওহর জুমলাত, ফায়ার কন্ট্রোল করছে আশ্চর্য নৈপুণ্যের সাথে। ওদের অনেকেই হামাগুড়ি দিয়ে বালির বস্তা দিয়ে তৈরি প্রাচীরের নিচে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু কামানের প্ল্যাটফর্মে সীট দুটো খালি করেনি জাফরী আর নঈম যাকের, দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে তারা। এবং কাফা, রানা অবাক হয়ে দেখল, ফায়ার করার কাজে পুরোদস্তুর মগ্ন হয়ে আছে, দুনিয়া সম্পর্কে পুরো বেখেয়াল। শেল পৌঁছুতে দেরি হওয়ায় কামানটা গুম মেরে রইল কয়েক মুহূর্তের জন্যে। ফিউজ সেট করার কাজে সাইয়িদ হাকামের হাত দুটো তখনও সচল। তিনলাফে তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল রানা। একটা শেল নিয়ে ছুটল কাফার দিকে।

ঝাঁকে ঝাঁকে স্প্লিন্টার উড়ছে গানপিটের উপর দিয়ে। বাতাসে শিস কেটে ছুটছে ধাতব পদার্থের হাজার হাজার কণা।

আর সবাই ছুটে এল রানার সাহায্যে। বোমা পতন শুরু হয়েছে পুরো দেড় মিনিট হয়নি এখনও, কিন্তু ইতিমধ্যেই বোমা বিস্ফোরণের কাঁপন সয়ে গেছে ওদের। প্রতি মুহূর্তে কাঁপছে পায়ের নিচের মাটি, যেন ভূমিকম্প সেই যে শুরু হয়েছে তার আর থামাথামি নেই।

সাঁ সাঁ করে একটা বোমা নামতে দেখে পাথর হয়ে গেল রানা। সোজা গানপিটে নামছে। পরমুহূর্তে ডাইভ দিল রানা, উপুড় হয়ে পড়ল বালির বস্তার কাছে। এক সেকেন্ড পর পড়ল বোমাটা। গানপিট থেকে বিশ ফুট দূরে। আওয়াজটা ভয়ঙ্কর। বালি ভর্তি বস্তার প্রাচীর ভেঙে পড়ল ভিতরের দিকে খানিকটা। খণ্ড পাথর আর বালির চাঙ প্রায় ঢেকে ফেলল ওদের। সবাই দাঁড়াবার পর দেখা গেল তাইয়েব সায়ানি প্রায় ডুবে

আছে পাথর আর বালিতে। কয়েকজন হাত লাগিয়ে সরানো হলো সেগুলো। মাথা ফেটে রক্ত গড়িয়ে নামছে তার, জ্ঞান নেই। দশ সেকেন্ড পর আবার গর্জে উঠল কামান।

এরমধ্যে হঠাৎ বাজল টেলিফোন। শুনতে পাবার কথা নয়, ভাগ্যই বলতে হবে। ডাইভ দিয়ে পড়ল রানা বেঞ্চটার কাছে। হাত বাড়িয়ে রিসিভারটা নামিয়ে নিল ও, কানের সাথে চেপে ধরল সেটা। ইতিমধ্যে অপারেশন কন্ট্রোলরুম থেকে পড়তে শুরু করে দিয়েছে মেসেজ।

'...দক্ষিণের খুব নিচু দিয়ে। ভয়াবহ আরেকটা রেইড আসছে, দক্ষিণের খুব নিচু দিয়ে...অস্বাভাবিক নিচু দিয়ে! আরেকটা রেইড আসছে...' গায়ের লোম দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, অনুভব করল রানা। ঘোষকের কণ্ঠস্বর আতঙ্কিত হতে এই প্রথম শুনল ও।

'কত দূরে?' গলার রগগুলো ফুলে উঠল রানার চিৎকার করার সময়।

'দূরে নয়!' জবাব এল।

গওহর জুমলাতের হাত চেপে ধরল রানা, তার কানে ঠোঁট ঠেকিয়ে চিৎকার করে জানাল মেসেজটা।

'অল রাইট!' পাল্টা চিৎকার করল গওহর জুমলাত। 'শুধু হ্যাঙ্গারের ওপরটা তাক করে থাকো। শ্রাপনেল, ফিউজ টু লোড!'

ঘুরতে শুরু করল কামানের ব্যারেল।

আক্রমণ ২

প্রথম প্রকাশঃ জুলাই, ১৯৭৮

এক

দ্রুত এক পাক ঘুরল রানা। এক নজরে দেখে নিল দিগন্তরেখা পর্যন্ত চারদিকের আকাশ। দক্ষিণ দিকে কিছু নেই, একেবারে খালি। মাথার উপর এবং বাকি তিনদিকের আকাশ থেকে বৃষ্টির মত ঝরছে বোমা।

অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া হল গানপিটে। ওদেরকে ঘিরে শত্রুপক্ষের মহা আস্ফালন চলেছে। পুব, পশ্চিম এবং উত্তর থেকে ডাইভ দিয়ে আসছে বোমারুগুলো, এমন সময় এল সিজ ফায়ারের নির্দেশ। স্তব্ধ হয়ে গেল কামান। মুহূর্তের জন্যে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল সবাই। অসহায় পুতুলের মত দাঁড়িয়ে থাকল গানপিটে।

শত্রু-বিমানের দিক থেকে কামানের ব্যারেল ঘুরে গেল হ্যাঙ্গারের দিকে। ওদিকে প্লেনের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। হঠাৎ শিউরে উঠল ওরা সবাই। দ্বিতীয় তিন ইঞ্চি কামানটাও স্তব্ধ হয়ে গেছে।

বিস্ফোরণের মুহুর্মুহু বিকট আওয়াজ। তার সাথে ভূমিকম্পের মত কাঁপছে মাটি। মাথার উপর মরণপণ যুদ্ধে মেতে উঠেছে নাবাতিয়া ফাইটার স্টেশনের দুটো স্কোয়াড্রন। স্টেশনের আরও প্রায় চল্লিশটা প্রায়-অচল আধা-অচল বিমান উঠে গেছে ওদের সাহায্যে। পাশের স্টেশনগুলো থেকে উড়ে এসেছে অতিরিক্ত আরও একটা স্কোয়াড্রন।

রানাকে দু'হাত দিয়ে ধরে গায়ের জোরে নিজের দিকে ফেরাল গওহর জুমলাত। ঘন জুলফি থেকে সড় সড় করে ঘাম নেমে আসছে তার। প্রকাণ্ড মুখটাকে বিকৃত হয়ে উঠতে দেখল রানা চোখের সামনে। চিৎকার করছে গওহর জুমলাত। 'আবার শোনাও আমাকে মেসেজটা।'

চিৎকার করে বলল রানা, 'আরও একটা ভয়াবহ···'

'ভয়াবহ?' হঠাৎ যেন সাপের কামড় খেয়ে আর্তচিৎকার করে উঠল গওহর জুমলাত।

উত্তরে উপর-নিচে একবার মাথা ঝাঁকাল রানা। তারপর আবার চিৎকার করে বলল, 'আরও একটা ভয়াবহ আক্রমণ আসছে দক্ষিণের খুব নিচু দিয়ে···।'

ছিটকে কামানের দিকে চলে গেল গওহর জুমলাত। দৃষ্টি দিয়ে তাকে অনুসরণ করতে গিয়ে কাফার উপর চোখ আটকে গেল রানার। হাঁটু গেড়ে বসে অদ্ভুত শান্ত ভঙ্গিতে পোড়া একটা সিগারেট ধরাচ্ছে সে। এর চেয়ে খাপছাড়া দৃশ্য এই মুহূর্তে

আর চোখে পড়ল না রানার। যন্ত্রণায় কে যেন ককিয়ে উঠতে ঘাড় ফেরাল ও।

খানিক আগে উন্মাদের মত হাসছিল জাফরী। প্ল্যাটফর্মের সীট ছেড়ে নিচে নেমেছে কখন লক্ষ করেনি রানা। দু'হাত দিয়ে পেট চেপে ধরে তীব্র ব্যথায় গোঙাচ্ছে সে এখন। টলছে। হঠাৎ বিস্ফারিত হয়ে উঠল চোখ দুটো। মৃত্যু-ভয়ে থরথর করে কেঁপে উঠল শরীরটা। সটান পড়ে গেল মাটির উপর। সদ্য কোরবানি দেয়া উটের মত চার হাত-পা ছুঁড়ছে।

প্রশংসা উপচে পড়ছে নঈম যাকেরের দু'চোখ থেকে। সাইয়িদ হাকাম শেলের ফিউজ নিয়ে ব্যস্ত, মুখ তুলে সে-ও একবার তাকিয়ে দেখল জাফরীকে। 'উপযুক্ত শাস্তি!' মন্তব্য করল সে।

যুদ্ধে নাম লেখাবার আগে অভিনয় করত জাফরী। অভ্যাসটা এখনও সে পুরো চালু রেখেছে। পরিস্থিতি যতই গুরুতর হোক, ক'সেকেন্ড সময় পেলেই হয়, ইসরায়েল সাজার সুযোগটা সে হাতছাড়া করে না কখনও।

যাকেরকে কি.যেন বলল চিৎকার করে কুতুব দীন, তারপর ক্যাঙ্গারুর মত এক লাফে চলে এল রানার সামনে। 'খোদার কসম রইল তোমাদের ওপর, বউকে বোলো একটুও ভয় পেয়ে মরিনি আমি···।' লাফ দিয়ে আরেকজনের সামনে চলে গেল সে।

তাকাতেই হ্যাঙ্গারের পিছনটা আলোকিত হয়ে আছে দেখতে পেল রানা। ফোম স্কোয়াড আর ফায়ার ফাইটাররা ভূপাতিত বিমানটার আগুন নেভাতে ব্যস্ত। অফিসার্স মেসের দিকে চোখ পড়তে বিশ্বাস্য ঠেকল না দৃশ্যটা। বিল্ডিংগুলোর দীর্ঘ সারির ঠিক মাঝখান থেকে অর্ধেকটা অংশ ধুলোর সাথে মিশে গেছে। হ্যাঙ্গারের ডান পাশের ছাউনিগুলোর কোন চিহ্নই দেখল না ও। ফ্লাইংফিল্ডে গোটা কতক বোমা পড়েছে মাত্র, কিন্তু তার চারপাশে মাথা উঁচু করে যা কিছু ছিল সবগুলোকেই প্রায় শুইয়ে দেয়া হয়েছে মাটির সাথে।

মাত্র ক'সেকেন্ডের মধ্যে এতসব দেখা হয়ে গেল রানার। নিজের জায়গা ছেড়ে নড়ল না ও। তাইয়েব সায়ানীর মাথা ফেটে রক্ত গড়াচ্ছে, কেউ তার দিকে এগোচ্ছে না। জাফরী বিশ সেকেন্ডের অভিনয় শেষ করে উঠে দাঁড়াল, ছুটে গেল প্ল্যাটফর্মের উপর বসানো স্টীল-চেয়ারের দিকে। কুতুবদীন এরই মধ্যে নিজের আসন দখল করেছে। নঈম যাকেরের সাথে জায়গা বদল করে নিয়েছে সে। শেলের ফিউজ সেট করার কাজে সাইয়িদ হাকামকে সাহায্য করার জন্যে এগোল রানা। অসংখ্য দ্রুতগামী প্লেনের একত্রিত শব্দটা কানে ঢুকল। চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে দুনিয়া কাঁপানো গর্জন হয়ে উঠল সেটা। দ্বিতীয় আক্রমণটা আসছে।

তখনও যুদ্ধ চলছে মাথার উপর। কিন্তু সে যুদ্ধের কোন শব্দ পেল না রানা। অকস্মাৎ নবাগত শত্রুদের দেখতে পেল ও। কোন এক যাদুকরের অবিশ্বাস্য কীর্তির মত লাগল ব্যাপারটা। হ্যাঙ্গারের ঠিক মাথার উপর দীর্ঘ একটা রেখা টেনে দিয়েছে কেউ যেন। এত নিচে দিয়ে আসছে যে মেইন গেটের অয়্যারলেস মাস্তুলের সামনে পড়ে যেতে একটা প্লেনকে তার পোর্ট উইং তুলে নিতে দেখল রানা। এত কাছাকাছি,

যেন একটার সাথে আরেকটার ডানা ছুঁয়ে আছে। লিভিং কোয়ার্টারের উপর বোমা ফেলার সময় মাত্র ত্রিশ ফুট উপরে দেখল ওগুলোকে রানা। বোমা পড়তে দেখে মুহূর্তের জন্যে মনে হল প্রতিটি প্লেনের পেট থেকে মাটি পর্যন্ত মোটা একটা পিলার দাঁড়িয়ে রয়েছে।

গওহর জুমলাত দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে হুকুম করল, 'ফায়ার!'

কামান গর্জে উঠল। সেই সাথে গোটা নাবাতিয়া ফাইটার স্টেশন যেন লাফ দিয়ে উঠল আকাশের দিকে। মাটি বালি আর পাথর; ধোঁয়া, আগুন আর চিৎকার স্টেশনের উপর ছুটোছুটি করছে বিদ্যুৎবেগে। অবশিষ্ট লিভিং কোয়ার্টারটা শত সহস্র টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল চারদিকের শূন্যে। বিকট বজ্রপাতের শব্দ হল সেই সাথে। ধোঁয়া, আগুন, পাথর, ইট, কংক্রিটের চাঙ আর বোমা দিয়ে তৈরি একটা প্রাচীর মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে, প্রাচীরের উপর রূপালী পাখির মত ঝলমলে প্লেনগুলোকে দেখতে পাচ্ছে রানা। তপ্ত রোদের ভিতর দিয়ে সেগুলো ছুটে আসছে ওদের দিকে।

মুহূর্তে সেগুলোর আকার দ্বিগুণ, ত্রিগুণ হয়ে যেতে দেখছে রানা। গোটা আকাশ ঢেকে ফেলছে ক্রমশ। উঁচু পাথরের ধাক্কা খেয়ে গাড়ি যেমন ঝাঁকুনি খায় তেমনি ঝাঁকুনি খেলো দুটো প্লেন ওদের কামানের শ্রাপনেলের সাথে ঘষা খেয়ে, কিন্তু এগিয়ে আসছে অপ্রতিহত গতিতে।

অবিরত গর্জন করছে কামান। দ্বিতীয় তিন-ইঞ্চিটাও সচল এখন। কিন্তু তেড়ে আসা শত্রু-বিমানের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া নেই। যে ফিউজ ব্যবহার করছে ওরা তার তুলনায় অনেক কাছে চলে এসেছে ওগুলো ইতিমধ্যে। দীর্ঘ লাইনটা দু'ভাগে ভাগ হয়ে আলাদা দুটো ঝাঁক হয়ে গেছে, ল্যান্ডিং ফিল্ডের দু'দিকে ছুটে আসছে প্রবল বেগে।

বুকটা হঠাৎ কেঁপে উঠল রানার ভয়ে। ও যেন দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পেল, স্টেশনের গ্রাউন্ড ডিফেন্সসহ অ্যারোড্রোমের যাবতীয় অফিশিয়াল প্রতিষ্ঠান মাটির সাথে সমান ভাবে মিশিয়ে দেয়াই এই আক্রমণের উদ্দেশ্য।

মেস, ক্যানটিন এবং রেস্তোরাঁর তিনটে তাঁবু পাশাপাশি পুড়ছে। পুড়ছে ছাউনিগুলো। বিশাল পাহাড়ের মত ধোঁয়ার ভিতর প্রকাণ্ড হ্যাঙ্গারটা এখনও অক্ষত, তার চারদিকে চলেছে লেলিহান আগুনের তাণ্ডব নৃত্য।

ঘাড় ফেরাতেই বোমার সাদা গা চকচক করে উঠতে দেখল রানা। অপারেশন কন্ট্রোলরূমে পড়ল সেটা। মধ্য-আকাশ থেকে পড়ছে আরও একটা। দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করছে রানা বোমাগুলোকে। Hispano পিটের কাছে পড়ল দু'সেকেন্ডের ব্যবধানে পর পর দুটো। গানপিটের কাছ থেকে মাত্র পঞ্চাশ গজ দূরে ইট আর কংক্রিটের তৈরি পাঁচ হাত উঁচু এক চাতালের উপর পড়ল একটা। এক সেকেন্ড আগে ছিল ওটা, পনেরো দিন আগেও ঠিক যেমনটি ছিল, পরমুহূর্তে জিনিসটা প্রায় পাউডারের মত গুঁড়ো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল শূন্যে।

এই সময় প্রথম প্লেনটাকে আসতে দেখা গেল ওদের দিকে। পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে

কামান দাগাবার নির্দেশ দিল গওহর জুমলাত। রানার মনে হল, ব্যর্থ হল শেলটা। আসলে কোন্‌দিক দিয়ে গেল সেটা টেরই পেল না ও। ওদের উপর এসে পড়ল যন্ত্র-দানবটা। কালো মৃত্যুর মত তার ডানারা ছায়া পড়ল গানপিটে। পলকের জন্যে পাইলটকে দেখল রানা। কাঠের মূর্তির মত বসে আছে ককপিটে, দাঁতে দাঁতে বাড়ি খাচ্ছে তার।

পিছনে মেশিনগানের ব্যারেলটা দেখেই ডাইভ দিল রানা। মাটিতে পড়ে থাকা বালির একটা বস্তার উপর ঠেকল ওর মাথাটা। পরমুহূর্তে নাড়া খেল বস্তাটা। মুখ তুলে তাকাল রানা। মাথা থেকে ঠিক এক ইঞ্চি তফাতে এক ঝাঁক বুলেট বস্তার গায়ে একটা রেখা টেনে দিয়ে গেছে। উঠে দাঁড়িয়েই ওদের দিকের Bofor টাকে লিগু করতে দেখল রানা। কমলালেবুর মত গোলাটা বিদ্যুৎবেগে ধাওয়া করছে প্লেনটাকে। পিছনে আরও একটা গোলা অনুসরণ করল সেটাকে। প্লেনের ফিউজিলাজের উপর তিন ইঞ্চি ব্যবধানে আঘাত করল গোলা দুটো।

ধাক্কা খেয়ে মুহূর্তের জন্যে একটু উপরে উঠল প্রকাণ্ড প্লেনটা। পরক্ষণে দুমড়ে মুচড়ে কিম্ভূত আকার ধারণ করল সেটা। লোহালক্কড়ের একটা স্তূপের মত পড়ছে মাটির দিকে। পতনটা দেখার সুযোগ পেল না রানা। ইতিমধ্যে আর একটা প্লেন কাছে চলে এসেছে। গানপিটের মাথার উপর পৌঁছুবার আগেই পিছনের গানার মেশিনগান দিয়ে শুরু করে দিয়েছে ব্রাশ ফায়ার। অকস্মাৎ মাথাটা প্রচণ্ডভাবে সামনের দিকে ঝাঁকি খেল রানার। ওর স্টীল হেলমেটের পিছনে কি যেন আঘাত করেছে। ঘাড়টা ভেঙে গেছে কিনা সেই মুহূর্তে ঠিক বুঝতে পারল না ও। বাতাসে তীক্ষ্ণ একটা শিস ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেই থেমে গেল। পড়ে গেছে ও ঝাঁকুনি খেয়ে, হামাগুড়ি দিয়ে বালির বস্তাগুলোর দিকে এগোচ্ছে। শরীরের দু'ধারে বুলেটের লাইনবন্দী ফুটো দেখল রানা।

একের পর এক মাথার উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে প্লেনগুলো। ব্রাশফায়ারের যুগ যেন শেষ হবার নয়। ঘাড় ফেরাতেই কাফাকে পড়ে যেতে দেখল রানা। বাঁক নিয়ে তার দিকে ওকে এগোতে দেখে গওহর জুমলাত কি বলতে গিয়েও বলল না। কাফার শরীরের উপর দিয়ে ক্রল করে এগোল রানা।

সটান দাঁড়িয়ে আছে গওহর জুমলাত। প্ল্যাটফর্মের সীটে কুতুব দীন আর জাফরী অটল। মুখ বুজে ফায়ার করে চলেছে। ফিউজ ওয়ানে কামান দাগা হচ্ছে এখন। কামান গর্জে ওঠার পরপরই শোনা যাচ্ছে শেল বিস্ফোরণের শব্দ। ফিউজ সেট করার কাজে নিরলস সাইয়িদ হাকামের মাথা প্রায় ঠেকে গেছে মাটির সাথে। হাতে শেল নিয়ে কামানের দিকে অবিরত ছুটছে অ্যামুনিশন নম্বররা।

ফায়ার করার ফাঁকে মুহূর্তের জন্যে চোখ তুলল রানা। তির্যক ভঙ্গিতে বিদ্যুৎবেগে নেমে আসছে একটা মিগ হ্যাঙ্গারের দিকে। সংঘর্ষ অনিবার্য ভেবে চোখ জোড়া ছোট হয়ে গেল ওর। পরক্ষণে দেখল হ্যাঙ্গারের উপর দিয়ে একটা থান্ডারচীফের পিছু ধাওয়া করে আসছে সেটা। সহস্র বজ্রপাতের মত শব্দকে চাপা

দিয়ে ফেলল তার আটটা মেশিনগান একযোগে মাথার উপর গর্জে উঠে। সূর্যের চোখ ধাঁধানো ছটার মধ্যেও মাজলগুলো থেকে আগুনের বর্শা নিক্ষিপ্ত হতে দেখল রানা। মিগটার ফিউজিলেজের গায়ে আঁকা নম্বরগুলো পরিষ্কার পড়তে পারল ও। অদ্ভুত একটা গর্ব অনুভব করল রানা। ইউনুস মেহেরের মিগ ওটা।

থান্ডারচীফটা ঠিক তখন গানপিটের মাথার উপর। মিগটা থেকে বেরিয়ে ঝাঁক ঝাঁক বুলেট খ্যাপা মৌমাছির মত আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলল সেটাকে। কোনদিন ভুলবে না রানা দৃশ্যটা। তপ্ত সীসার তৈরি মৌমাছির অসহ্য কামড়ে অস্থির হয়ে শূন্যে ওলটপালট খেতে শুরু করল থান্ডারচীফ। গতি এবং উচ্চতা এতটুকু ক্ষুণ্ন হল না তার। প্রতি সেকেন্ড দূর থেকে দূরে চলে যাচ্ছে বিদ্যুৎবেগে ডিগবাজি খেতে খেতে। একসময় সেটা আগুনের একটা কুণ্ডলী হয়ে উঠল।

মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে প্লেনগুলো, এক এক করে গুনছে রানা। পাঁচ এবং বারো নম্বর প্লেন দুটোকে আঘাত করতে পেরেছে ওরা। তেরো নম্বরটা এল মাত্র তিন সেকেন্ডের ব্যবধানে। রানার ডানপাশে বস্তার প্রাচীর, কে যেন আঘাত করল তাতে। মাটি কেঁপে উঠতে পড়ে গেল রানা। উপর থেকে বালি পড়ে প্রায় ঢেকে ফেলল শরীরটা। লকার খুলে গিয়ে গানপিটের মেঝেতে বেরিয়ে পড়ল শেলগুলো। বস্তার প্রাচীরটা পড়ে যাচ্ছে গানপিটের দিকে। ঠিক তখন প্লেনটাকে দেখল রানা। দাঁড়িয়ে লাফ দিলে ওটার ডানা ছুঁতে পারবে বলে মনে হলো ওর।

শরীর থেকে দু'হাত দিয়ে বালি সরিয়ে উঠে দাঁড়াবার আগেই প্লেনটার শব্দ উত্তর দিকে মিলিয়ে গেছে, থেমে গেছে কামান, শান্ত হয়ে গেছে সবকিছু।

মেঘহীন নীল আকাশে চোখ তুলল রানা। ডাইভ অ্যাটাকের ইতি ঘটেছে, শত্রুবিমানের শেষ ঝাঁকটাকে আকাশের দক্ষিণ-পুব প্রান্তে শেষবারের জন্যে দেখা যাচ্ছে, নাক নিচু করে ফিরে যাচ্ছে তেলআবিব বা হাইফা বিমানবন্দরে। ভৌতিক নিস্তব্ধতার মাঝখানে হঠাৎ রানা নতুন একটা আওয়াজ শুনতে পেল। প্রচণ্ড বাতাসে পতাকা ওড়ার মত চারদিকে উড়ছে আগুনের চাদর, পত্ পত্ শব্দে দলিত মথিত হচ্ছে গোটা ফাইটার স্টেশন নাবাতিয়া।

চারদিকে দৃষ্টি বুলাল রানা। নাবাতিয়াকে একটা ধ্বংসস্তূপ দেখাচ্ছে। ল্যান্ডিং ফিল্ডের দক্ষিণে গোটা এলাকাটাকে মুড়ে রেখেছে আগুন। আগুনের ভিতরে দেখা গেল হ্যাঙ্গারগুলোকে, প্রায় সবগুলোই অক্ষত। বাকি বিল্ডিংগুলো ভেঙে গুঁড়িয়ে পড়েছে, কোনটা আংশিক, কোনটার কোন হদিসই নেই। কালো ধোঁয়ার পাহাড় দেখা যাচ্ছে, তার উপর হঠাৎ করে উঠছে লাল আগুনের শিখা। ক্যাম্প আর গানপিটের মাঝখানে বোমার আঘাতে সৃষ্ট অসংখ্য গভীর গর্ত দেখা যাচ্ছে—কাছ থেকে তোলা চাঁদের পিঠের ছবি যেন জায়গাটা।

রানার মনে আর কোন সন্দেহ নেইঃ ল্যান্ডিং ফিল্ড বা বিমানবহর নয়, ইসরায়েলি আক্রমণের উদ্দেশ্য ছিল স্টেশনের বিল্ডিং এবং লোক-বলকে ধ্বংস করা। হ্যাঙ্গারগুলোর ভিতর এখনও মেরামতের অপেক্ষায় প্রচুর প্লেন রয়েছে, কিন্তু

সেগুলো দেখেও যেন দেখেনি ইসরায়েলি পাইলটরা।

একটা কথা ভেবে ইসরায়েলি পাইলটদের প্রশংসা না করে পারল না রানা। নাবাতিয়া সুরক্ষিত একটা বিমান ঘাঁটি, একথা জেনেও ডাইভ অ্যাটাকের জন্যে এইভাবে দল বেঁধে আসা অসম সাহসেরই পরিচয়। উত্তর দিকে তিনটে অগ্নিকুণ্ড দেখল ও। শত্রুবিমানের শেষকৃত্য অনুষ্ঠিত হচ্ছে ওখানে।

অকস্মাৎ গওহর জুমলাতের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা। দু'হাত দিয়ে তাকে ধরে উন্মাদের মত চিৎকার করতে শুরু করল ও, 'গেট আউট! গেট আউট! গানপিট থেকে বেরোও সবাই! কুইক!'

রানা পাগল হয়ে গেছে ভেবে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টার সাথে এর-ওর দিকে অসহায় ভাবে তাকাল গওহর জুমলাত। যেন এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিল সাইয়িদ হাকাম। হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল সে শার্টের আস্তিন গুটাতে গুটাতে। গওহর জুমলাতকে ছেড়ে দিয়ে আধপাক ঘুরল রানা। জায়গা ছেড়ে নড়ল না এক পা। সাইয়িদ হাকাম নাগালের মধ্যে আসতেই ডান পা তুলে প্রচণ্ড একটা লাথি মারল তার তলপেটে। মাথাটা ঝাঁকি খেল হাকামের। কুঁজো হয়ে গেল শরীরটা। তলপেট টেনে ধরে দু'পা পিছিয়ে গেল সে। পিছন থেকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল রানাকে নঈম যাকের। কনুই চালাল রানা। কোঁক করে আওয়াজ বেরিয়ে এল যাকেরের গলা থেকে। ছিটকে গান-প্ল্যাটফর্মের উপর পড়ল সে।

'হুঁশ নেই তোমাদের?' চিৎকার করে বলল রানা, 'ডিলেইড অ্যাকশন বোমা পড়েছে গানপিটে, দেখোনি?' বোমাটা পড়েছে এবং এখনও ফাটেনি, এটুকুই শুধু জানে রানা। কিন্তু গানপিটের ঠিক কোথায় রয়েছে জানে না ও।

কাফার দিকে ছুটল রানা। জ্ঞান ফেরার পর দু'হাতে মুখ ঢেকে ফোঁপাচ্ছে। দু'হাত দিয়ে তার মাথার চুল ধরে নির্মম ভাবে টেনে দাঁড় করাল তাকে রানা। 'বেরোও! বেরিয়ে যাও এই মুহূর্তে...।'

টনক নড়ল এতক্ষণে গওহর জুমলাতের। বোমাটা দেখতে পেয়েছে সে-ও। আর্তনাদ বেরিয়ে এল তার কণ্ঠ চিরে। 'গেট আউট! গেট আউট! অল অফ ইউ...।'

ঝাঁপিয়ে পড়ল সবাই আহতদের তুলে নিয়ে গানপিট থেকে বেরিয়ে যাবার জন্যে। সাইয়িদ হাকাম গোঙাতে গোঙাতে একা হাঁটছে। যাকের তাকে অনুসরণ করতে গিয়েও থমকাল হঠাৎ, তারপর কুতুব দীনের সাথে হাত লাগাল তাইয়েব সায়ানীকে বহন করার কাজে। হেজাজীর দুই হাত ধরল রানা, পা দুটো ধরল গওহর জুমলাত। বাকি সবাই টলতে টলতে ছুটল। জাফরী খোঁড়াচ্ছে, সাদা কাগজের মত ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে তার মুখ। কাফা হাত দিয়ে চোখের পানি মুছতে মুছতে হাঁটছে ধীরে ধীরে। পিছন থেকে তার পিঠে মাথা দিয়ে গুঁতো মারল গওহর জুমলাত। হাঁটার গতি বাড়ল না কাফার, একপাশে সরে গিয়ে পথ ছেড়ে দিল সে ওদেরকে।

গানপিট থেকে বেরুবার ঠিক আগের মুহূর্তে বোমাটাকে দেখতে পেল রানা। প্রাচীর ভেঙে পড়ায় বস্তা চাপা পড়েছে।

ছাউনিতে ঢুকে হেজাজীকে মেঝেতে নামিয়ে ল ওরা। পিছন ফিরে তাকাল রানা। বোমার দাড়াগুলো বস্তার ভিতর থেকে বেরিয়ে রয়েছে দেখল ও। বালির ভিতর সেঁধিয়ে গেছে নাকটা। মাত্র ত্রিশ ফুট উঁচু থেকে পড়ায় আরও গভীরে ঢুকে আত্মগোপন করতে পারেনি বোমাটা। এখনও ওরা সবাই বেঁচে আছে, এ যেন সৃষ্টিকর্তার আশীর্বাদ বলে মনে হল ওর।

'ওটাকে সরাতে হবে এখুনি,' গওহর জুমলাত রানার পাশ থেকে বলল। 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কামানটাকে চালু করতে চাই আবার আমরা।'

'হ্যাঙ্গারের স্টোরে দড়ি আছে,' বলল রানা। 'তোমার সাইকেলটা নিয়ে যাব আমি?'

'কুইক, রানা!'

সাইকেলে চড়ল রানা, কিন্তু সীটে বসল না। প্যাডেলের উপর পা দুটো রেখে রিকশার কায়দায় বন বন করে ঘোরাতে লাগল সে দুটো। গভীর গর্তগুলোকে পাশ কাটিয়ে সাঁ সাঁ করে এগিয়ে যাচ্ছে ও। করডাইটের তীব্র গন্ধ বাতাসে, বিশেষ করে গর্তগুলোর কাছে তা আরও প্রকট। ধোঁয়ার কটু গন্ধে ফুসফুস ভরাট হয়ে উঠল কিছুক্ষণের মধ্যেই। অফিসার্স মেসটার খানিকটা মাত্র দাঁড়িয়ে আছে, সেটার পাশ দিয়ে চৌরাস্তার দিকে সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে রানা। একটা মাত্র লাউডস্পীকার থেকে ঘোষণা শুনল ও। এয়ারক্রাফটের সাথে জড়িত নয় এমন সব ব্যক্তিকে চৌরাস্তায় রিপোর্ট করতে হবে আগুন নেভাবার জন্যে।

জগাখিচুড়ি অবস্থা দাঁড়িয়েছে চৌরাস্তার উপর। জায়গাটাকে তিন দিকের জ্বলন্ত বিল্ডিংগুলো ঘিরে রেখেছে। দমকলবাহিনীর সাজসরঞ্জাম এ আগুন নেভাতে পারে না। ধোঁয়ায় দেখার উপায় নেই কিছু। আস্তিন দিয়ে চোখের পানি মুছতে মুছতে সাইকেলটাকে ঠেলে নিয়ে এগোচ্ছে রানা। স্ত্রী-পুরুষ দিশেহারার মত ছুটোছুটি করছে। আহতদের আর্তচিৎকারে বাতাস ভারি। প্রলম্বিত আরবী বিলাপের সুর চারদিকে। নেমে পড়েছিল, আবার সাইকেলে উঠল রানা। একটা ডাগ-আউট শেলটারের পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখল আহতদের টেনে হিঁচড়ে বের করা হচ্ছে নিহতদের ভিতর থেকে। রক্তের বন্যা বয়ে যাচ্ছে জায়গাটায়।

ভাঙা কাঁচের টুকরোয় লেগে সাইকেলের পিছনের চাকাটা ফেটে গেল। তবু সেটাকে চালিয়ে নিয়ে চলল রানা। অ্যাম্বুলেন্স আর A. F. S. ফায়ার-পাম্প আসতে শুরু করেছে আশপাশের শহরগুলো থেকে। রাস্তা দিয়ে তীরবেগে ছুটছে গাড়িগুলো। কোনটার সাথে ধাক্কা না খেয়ে শিক্ষা-ভবন পর্যন্ত পৌঁছুল রানা। চিহ্ন পর্যন্ত নেই ভবনটার। জামাল আরসালানের মুখটা ভেসে উঠল চোখের সামনে। কোথায় ছিল সে আক্রমণের সময়?

অকস্মাৎ একটা সন্দেহ দেখা দিল রানার মনে। প্রিজন ভ্যানে করে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে আতাসীকে? আন্ডারগ্রাউন্ড সেলে নিরাপদেই ছিল সে, ঠিক আক্রমণ শুরু হবার আগে ওখান থেকে তাকে সরানো হল কেন? এ ব্যাপারে জামাল

আরসালানের হাত নেই তো?

কেন যেন মনে হল ওর, আতাসীকে স্টেশনের বাইরে কোথাও নিয়ে যাওয়া হয়নি। এই স্টেশনেরই কোথাও স্থানান্তরিত করা হয়েছে তাকে, এমন এক জায়গায় যেখানে বোমা পড়বে বলে আগে থেকেই জানত না অনুমান করেছিল জামাল আরসালান।

আক্রমণের সময় আতাসী কোথায় ছিল, সে বেঁচে আছে কিনা জানার জন্যে ছটফট করতে লাগল মনটা। কাউকে যে জিজ্ঞেস করবে সে উপায় নেই। এই সময় ইফফাতের কথা মনে পড়ল ওর। বেঁচে আছে তো?'

শিক্ষা ভবনের পাশে লিভিং কোয়ার্টার প্রায় পুরোটাই ধুলোর সাথে মিশে গেছে। স্টেশন হসপিটালের একই পরিণতি হয়েছে। ইট, বালি, কংক্রিট আর লোহার প্রকাণ্ড একটা স্তূপ সেটা এখন, অক্ষত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে শুধু সামনের পাঁচিল মাঝখানে প্রকাণ্ড গেটটাসহ। আধ খোলা রয়েছে সেটা, একটা মেয়েকে বেরিয়ে আসতে দেখল রানা। ভীত-চঞ্চল দৃষ্টিতে চারদিকে তাকাল সে। রানাকেও দেখল কিন্তু ও যে একটা জলজ্যান্ত মানুষ, সম্ভবত তা উপলব্ধি করতে পারল না। মেয়েটার মানসিক ভারসাম্য ঠিক নেই বলে সন্দেহ হল রানার। অত্যন্ত সাবধানে গেটটা বন্ধ করল সে। দেখে হাসি পেলেও পরমুহূর্তে বিষাদে ছেয়ে গেল রানার মন। গেটটা যে এখন আর বন্ধ করার দরকার নেই তা বোঝার মত চেতনা হারিয়ে ফেলেছে বেচারী।

হ্যাঙ্গারগুলোর সামনে দিয়ে যাবার সময় নতুন করে উপলব্ধি করল রানা শত্রুপক্ষের উদ্দেশ্যটা। হ্যাঙ্গারের কাছে পিঠে একটা বোমাও ফেলেনি তারা।

সাইকেল থেকে নামতে হল ওকে। রাস্তার ওপর ইট-বালি কাঠের স্তূপ জমে উঠেছে। সর্বশেষ হ্যাঙ্গারটার কাছে চলে এসেছে ও। ওদের কামানের শেল লেগে এখানেই পড়েছিল প্লেনটা। রাস্তার অবস্থা দেখে এই প্রথম বুঝল রানা, প্লেনটা শেষ হ্যাঙ্গারটার উপরই পড়েছে।

গোটা হ্যাঙ্গারটাই ভেঙে পড়েছে তাসের ঘরের মত। ধসে পড়া ছাদের ধ্বংসাবশেষের ভিতর দিয়ে থাণ্ডারচীফের লেজটা বেরিয়ে আছে বাইরে। কাঠের ছাদটা মাত্র অর্ধেক পুড়েছে আগুনে। আগুন নিভিয়ে ফোম-স্কোয়ার্ড আর ফায়ার-ফাইটাররা চলে গেছে ইতিমধ্যে। এখন শুধু ধোঁয়া উঠছে প্লেনটাকে ঘিরে। আরও একশো গজ হাঁটতে হবে রানাকে। আবার একসার হ্যাঙ্গার শুরু হয়েছে ওদিকে। ওগুলোর একটার থেকেই দড়ি সংগ্রহ করবে ও।

ধোঁয়ায় ভাল দেখতে পাচ্ছে না ও। কারও সাথে দেখা হয়নি এখনও, তাই ধরে নিল এদিকটায় লোকজন নেই। ধ্বংস্তূপের কাছে কি যেন নড়ে উঠল সেদিকে মনোযোগ না দিয়ে সাইকেল ঠেলে এগিয়ে চলল রানা। চোখের কোণে আবার ধরা পড়ল নড়াচড়া। এবার তাকাল রানা। একজন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। চিনতে পারল না। কালো একটা ধোঁয়ার মেঘ ওদের মাঝখান দিয়ে উড়ে যেতে শুরু করল। আবার

এগোল রানা। পাঁচ গজ এগিয়ে হঠাৎ থামল। ভুরু কুঁচকে উঠল ওর। লোকটা কে? চেনা কেউ?

ঘাড় ফেরাল রানা ডান দিকে। সরে গেছে ধোঁয়াটা, লোকটাকে দেখে চমকে উঠল ও। এমন চেহারা হয়েছে চেনার কোন উপায়ই নেই। পরনের কাপড় অমন শতেক জায়গায় ছেঁড়া। কালিঝুলি আর ধুলোয় মুখ-হাত-পা ঢাকা পড়ে গেছে। কাঁচাপাকা কোঁকড়ানো চুল উসকোখুসকো হয়ে রয়েছে। মুখের চেহারায় ব্যথা এবং তিক্ততার অদ্ভুত একটা মিশ্রণ দেখল রানা। চোখের সেই তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টি, মুখের সেই বুদ্ধিমত্তার ছাপ কিছুই নেই। ঝুলে পড়েছে মুখটা। রানার দিকে তাকাল, কিন্তু ওকে চিনতে পারল না জামাল আরসালান।

ওর দিকে পা বাড়াতে গিয়েও থমকে গেল রানা। লোকটার পায়ের সামনে পড়ে থাকা জিনিসটা এতক্ষণে চিনতে পারল ও। একটা লাশ।

দুমড়ে মুচড়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে রক্তাক্ত দেহটা। মাথার ক্ষতটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রানা। বেঁচে আছে তা মনে করার কোন কারণই নেই। হঠাৎ রানা বুঝল, লাশটা শাফার।

হ্যাঙ্গারের দিকে এগোতে শুরু করল আবার রানা। জামাল আরসালানের ঝুলে পড়া মুখটা ভুলতে পারছে না ও। প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। শাফার ছবিটার কথা মনে পড়ল ওর। জামাল আরসালানের সাথে শাফাও ছিল তেলআবিবে। কিন্তু ছবিটা এত বছর ধরে কেন নিজের কাছে রেখে দিয়েছে জামাল আরসালান? বিদ্যুৎ চমকের মত একটা সন্দেহ জাগল রানার মনেঃ জামাল আরসালানের স্ত্রী নয়ত মেয়েটা?

পানির মত সব যেন পরিষ্কার হয়ে গেল চোখের সামনে। ইসরায়েলি পাইলটরা এরোড্রোমের অফিশিয়াল প্রতিষ্ঠান এবং লোকজনের আস্তানায় আঘাত করেছে, একটা বোমাও ফেলেনি তারা হ্যাঙ্গারে। আক্রমণটা যে এরকমই হবে তা জামাল আরসালানের আগে থেকেই জানা ছিল। তাই শাফাকে নিয়ে শেলটারে না গিয়ে তারা আশ্রয় নেয় হ্যাঙ্গারে। এ ব্যাপারে শাফার আপত্তি ছিল, তাই সে ঘুমের মধ্যে প্রতিবাদ জানায়। কিন্তু আজ সকালে শাফার ভয় তাড়াতে সমর্থ হয় জামাল আরসালান এবং তাকে নিয়ে আশ্রয় নেয় হ্যাঙ্গারে।

কোন সন্দেহ নেই, গোটা এরোড্রোমে হ্যাঙ্গারগুলোই ছিল সবচেয়ে নিরাপদ। শাফা সহ বেঁচে থাকারই কথা ছিল জামাল আরসালানের। কিন্তু ওদের একটা শেলের আঘাতে প্লেনটা এত জায়গা থাকতে ওরা যে হ্যাঙ্গারটার ভিতর আশ্রয় নিয়েছিল সেটার উপর পড়েই সব ভণ্ডুল করে দিয়েছে। স্রেফ, রানার মনে হল, ভাগ্যের ফেরে শাফার লাশ সামনে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে জামাল আরসালান। নিরাপদতম জায়গা জেনে আশ্রয় নেয়ার পর এই দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ায় তার মানসিক অবস্থা কি দাঁড়িয়েছে ভাবতে গিয়ে লোকটার জন্যে দুঃখ বোধ করল রানা। সে জানে না, ভাবল ও, এখন যেমন শাফার জন্যে কষ্ট হচ্ছে তার, অচিরেই নিজের জন্যেও

এমনিই কষ্ট পেতে হবে তাকে।

হ্যাঙ্গার থেকে দড়ির একটা কয়েল কাঁধে নিয়ে সেই রাস্তা দিয়েই ফিরছে খানিকপর রানা। জামাল আরসালানকে দূর থেকেই দেখল ও। ঠিক সেইভাবে, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। এবার মুখ তুলে বেশ কিছুক্ষণ চেয়ে রইল সে রানার দিকে। চোখের দৃষ্টি দেখে মনে হল রানার, তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ চিনতে পারল ওকে জামাল আরসালান। আপাদমস্তক চমকে উঠল তার। অবাক বিস্ময় ফুটে উঠল তার মুখে। ব্যাপারটা একেবারেই বুঝল না রানা।

স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে আছে কিন্তু কথা বলার চেষ্টা করছে না দেখে সাইকেল ঠেলে এগোতে শুরু করল রানা। ভাবল, পিছু ডাকবে। কিন্তু ডাকল না। ষড়যন্ত্রের চেয়ে অন্তত এই মুহূর্তে মেয়েটি তার কাছে অধিক প্রিয় বলে মনে হল রানার।

চৌরাস্তার চেহারা বদলে গেছে এরই মধ্যে। যন্ত্রপাতি আর ফায়ার ইঞ্জিন নিয়ে গোটা ফায়ার ব্রিগেড পৌঁছে গেছে। সুশৃংখলভাবে চলছে আগুন নেভাবার কাজ। আরও অনেকগুলো অ্যাম্বুলেন্স আর A. F. S. ফায়ারপাম্প দেখল রানা। প্রাইভেট মোটরগাড়ির লাইনটা দীর্ঘ হচ্ছে এখনও। বেশিরভাগই ডাক্তারদের গাড়ি। চৌরাস্তার পাশে ঘাসের উপর নিহত আর আহতদের শোয়ানো হচ্ছে। খোলা মাঠটাই এখন হাসপাতাল।

চৌরাস্তা ছাড়িয়ে খানিকদূর এগোতে একটা আর্মি কার দেখল রানা। ইঞ্জিন চালু সাইকেলটা গাড়ির দরজার সামনে থামিয়ে নেমে পড়ল ও। কোনদিকে না তাকিয়ে সাইকেলটাকে শুইয়ে দিয়েই গাড়ির দরজা খুলে ঢুকে পড়ল ভিতরে।

ছাউনির সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে নেমে রানা দেখল গওহর জুমলাত তাইয়েব সায়ানীর মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধার কাজে ব্যস্ত। কাঁধ থেকে কয়েলটা নামিয়ে দড়ির একটা প্রান্ত ধরে ছুটল ও গানপিটের দিকে।

'রানা!' পিছন থেকে চিৎকার করে উঠল জাফরী।

বোমাটার কাছে প্রায় পৌঁছে গেছে তখন রানা। পিছন ফিরতে দেখল গওহর জুমলাত উঠে দাঁড়িয়েছে তাইয়েব সায়ানীকে ছেড়ে। তার দু'পাশে ডিটাচমেন্টের সবাই জড় হয়েছে। স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে আছে সবাই।

হঠাৎ চিৎকার করে বলল গওহর জুমলাত, 'ফিরে এসো, রানা! কুইক!'

'বোমাটাকে বাঁধতে হবে না?' জায়গা ছেড়ে নড়ল না রানা।

'ঝুঁকিটা আমাকে নিতে হবে,' বলল গওহর জুমলাত। 'আমি থাকতে আমার ডিটাচমেন্টের কাউকে আমি তা নিতে দিতে পারি না। ফিরে এসো তুমি।'

'আমি ফিরে যাব, তারপর তুমি আসবে, এতে অনেক সময় নষ্ট হবে। ফাটার সময় বোধহয় হয়ে এসেছে ওটার। এসেই যখন পড়েছি...।' কথা শেষ না করে ছুটতে শুরু করল রানা। গানপিটে ঢুকে বোমাটার সামনে দাঁড়াল ও। যে-কোন মুহূর্তে ফাটতে পারে, মনে হতেই গলা শুকিয়ে গেল ওর। দড়ির প্রান্তটা হাতে নিয়ে পিঠ বাঁকা করল ও, ঝুঁকে পড়ল বোমাটার উপর। বোমার দাড়াগুলোকে বিপজ্জনক

আর কুৎসিত বলে মনে হল ওর। ওগুলোর চারধারে দড়ি জড়াতে শুরু করল ও। দাঁতে দাঁত চেপে আছে। দেখতে দেখতে বিন্দু বিন্দু ঘামে ভর্তি হয়ে উঠল কপালটা। শেষ হয়ে এসেছে কাজটা। সিধে হয়ে দাঁড়াল রানা। পিছু হটতে গিয়ে হঠাৎ কি যে হল, পা উঠল না। বোমাটা যেন সম্মোহিত করেছে ওকে।

ঘাড় ফেরাল রানা। গওহর জুমলাত ছুটতে শুরু করেই ওকে ঘাড় ফেরাতে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল, নিঃসাড় পাথরের মত স্থির হয়ে গেল সে। চিৎকার করার জন্য মুখ খুলছে দেখে হাত তুলে তাকে থামবার ইঙ্গিত করল রানা, সেই সাথে অভয় দিয়ে হাসল একটু। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুটল ছাউনির দিকে। বিশ সেকেন্ডের মধ্যে নিরাপদ দূরত্বে সরে এল ও।

ছুটে এসে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরল গওহর জুমলাত রানাকে।

'একটা প্রশংসনীয় কাজের জন্যে যাবতীয় নিন্দা প্রাপ্য তোমার,' রানাকে ছেড়ে দিয়ে বলল গওহর জুমলাত। 'এরকম আর যেন কখনও না হয়, রানা। বোমাটা যদি ফাটত, তুমি বাঁচতে না। নিজে ঝুঁকিটা না নেয়ায় জবাবদিহি যা করার তা তো করতেই হত, নিজের কাছে কতটা অপরাধী হয়ে থাকতাম চিরটা কাল, ভাবতে পারো?'

মৃদু হাসল রানা। 'প্রশংসা পাবার লোভটা সামলাতে পারিনি।'

'এমন কিছু প্রশংসার কাজ কারোনি তুমি,' বলল সাইয়িদ হাকাম গওহর জুমলাতের পিছন থেকে। 'ফাটবে না জানলে দিনে অমন পঞ্চাশবার বোমাটার কাছে যেতে পারি আমি।'

'ফাটবে না জানলে—মানে?' ঝট্ করে পিছন ফিরে সাইয়িদ হাকামের দিকে তাকাল গওহর জুমলাত।

'মানে? মানে রানাকেই জিজ্ঞেস করো।'

'আমি তোমাকে প্রশ্ন করছি, তুমিই আমাকে জবাব দাও, বম্বারডিয়ার সাইয়িদ হাকাম,' কঠোর শোনাল গওহর জুমলাতের কণ্ঠস্বর। 'তোমার কথার অর্থ কি?'

'সরল। বোমাটা ফাটবে না এ-কথা রানা জানত।'

'কিভাবে জানত? কিভাবে জানা সম্ভব?'

'ঠিক যেভাবে ও জানত আজ শুক্রবার দিন আক্রমণ হবে, সেভাবেই জানত।' বুক টান করে দাঁড়িয়ে আছে সাইয়িদ হাকাম। প্রকাণ্ড মুখটা লাল হয়ে উঠেছে। তার দু'চোখে ঘৃণা দেখল রানা।

'আহ্! তোমরা ব্যাপারটাকে এত গুরুত্ব দিচ্ছো কেন বলো দিকি!' সকলের সাথে কাফাও এসে দাঁড়িয়েছে সাইয়িদ হাকামের পাশে। 'তুমি কিছু মনে কোরো না, রানা, দোস্ত আমার। আসলে কি হয়েছে, আমার কাছ থেকে শোনো। রানা, দোস্ত, তুমি যে তখন সাইয়িদ হাকামের নাভির নিচে অত জোরে লাথিটা মারলে, সে-ই ব্যথাটা এখনও কমেনি বেচারার। তাই একটু ঝাল ঝাড়ার চেষ্টা করছে আর কি!'

হেসে ফেলল কাফা নিজেই, লাফ দিয়ে সরে গেল সাইয়িদ হাকামের হাতের নাগাল থেকে।

'ঘটনাটা আমরা কেউ ভুলিনি, রানা,' সাইয়িদ হাকাম রক্তচক্ষু মেলে চেয়ে আছে রানার দিকে। 'প্রিজন ভ্যানে করে ইসরায়েলি গুপ্তচর লেফটেন্যান্ট আতাসীকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তার সাথে তুমি কথা বলেছ—আমরা সবাই দেখেছি। মি. ফারুকীর কাছে এ বিষয়ে রিপোর্ট করব আমি।'

গওহর জুমলাত রানার দিকে ফিরল।

'কিছুই বলার নেই আমার। কেউ রিপোর্ট করলে আমার করার কিছু নেই।'

'কি কথা হয়েছে তোমার ইসরায়েলি গুপ্তচরের সাথে?' জানতে চাইল গওহর জুমলাত।

'ওকেই জিজ্ঞেস করো।'

সাইয়িদ হাকাম বলল, 'কি কথা হয়েছে তা আমি ঠিক বুঝতে পারিনি।'

'কেউ শুনেছ এদের কথাবার্তা?'

কেউ কিছু বলল না।

হেসে ফেলল রানা। তারপর গওহর জুমলাতকে ও স্মরণ করিয়ে দিল, 'কামানটা কি হারাতে চাই আমরা?'

'মাই গড!' আঁতকে উঠল গওহর জুমলাত 'রানা, কুইক! গাড়িতে গিয়ে ওঠো তুমি। ভাল কথা, হেজাজী আর সায়ানীকে তুলে নাও গাড়িতে, ওদের চিকিৎসা দরকার…।'

দুই

'অ্যাটেনশন, প্লীজ! অ্যাটেনশন, প্লীজ! প্রিলিমিনারি এয়াররেইড ওয়ার্নিং। জরুরী কাজে নিযুক্ত নয় এমন সব ব্যক্তিকে নিরাপদ আশ্রয় নিতে হবে। প্রিলিমিনারি এয়াররেইড ওয়ার্নিং।'

ওই একটাই লাউডস্পীকার অক্ষত আছে। ঘোষণাটা শেষ হবার আগেই লোকে-লোকারণ্য চৌরাস্তাটা প্রায় ফাঁকা হয়ে গেল। সবচেয়ে কাছের অ্যাম্বুলেন্সটার পাশে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে হেজাজী আর তাইয়েব সায়ানীকে ঘাসের উপর নামাল রানা। ডান পা উড়ে গেছে এক লোকের, তার পায়ে ব্যান্ডেজ বাঁধছে নার্সটা। অজ্ঞান দেহ দুটো রেখে দাঁড়িয়ে রইল রানা কিছুক্ষণ। আহতদের সংখ্যা গুণে শেষ করা অসম্ভব, অনবরত আসছে আরও। নার্সকে কিছু বলবে ভেবেও কিছু বলতে পারল না রানা। হেজাজী বা তাইয়েব সায়ানীর চেয়ে মারাত্মকভাবে আহতদের সংখ্যাই বেশি। নিয়ম অনুযায়ী আগে তাদেরই চিকিৎসা করবে নার্স। বিশেষ অনুরোধ করাটা এক্ষেত্রে অন্যায়। গানপিটে ফিরে যাবার একটা তাড়া অনুভব করল রানা। বোমাটা গাড়ির সাহায্যে টেনে ল্যান্ডিং ফিল্ডের কাছ থেকে সরিয়ে দিয়ে এসেছে ও, গানপিট এখন সম্পূর্ণ নিরাপদ। তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে ওকে। কামানের

কাছে প্রতিটি লোকের উপস্থিত থাকা জরুরী।

গাড়ির কাছে ফিরে এসে চড়তে যাবে রানা, এমন সময় একটা লোকের উপর চোখ পড়ল ওর। আকাশের দিকে চেয়ে আছে বিস্ফারিত নেত্রে। ঠোঁটজোড়া নড়ছে। গোটা বাঁ কাঁধটা গুঁড়ো হয়ে গেছে তার। সারা মুখে রক্তের প্রলেপ। চিনতে পারার কথা নয় রানার, কিন্তু পায়ের বুটজোড়া যেন ওর চোখে আঙুল দিয়ে লোকটা পরিচয় জানিয়ে দিল ওকে।

ওই বুটজোড়া মিস্ত্রী এরাফিনের পায়েই দেখেছিল রানা। লোকটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল ও। বিড় বিড় করে কি বলছে শোনার জন্যে হাঁটু গেড়ে তার মুখের কাছে বসল ও, কানটা নামাল ঠোঁট জোড়ার কাছে। পরমুহূর্তে চমকে উঠল ও।

আরবী নয় হিব্রু ভাষায় কথা বলছে মিস্ত্রী এরাফিন। মুখ তুলে অবিশ্বাসভরা চোখে লোকটাকে ক'সেকেন্ড দেখল রানা। তারপর তার কানের কাছে মুখ নামিয়ে বলল, 'বিজয়ের দিন আমাদের মধ্যে তুমি থাকবে না সে জন্যে আমি দুঃখিত এরাফিন।' হিব্রু ভাষায় কথাটা বলল রানা। কিন্তু ওর কথা এরাফিন শুনতে পেয়েছে বলে মনে হলো না। হাত দিয়ে ধরে ঝাঁকি দিল তাকে রানা। আবার বলল কথাটা।

চোখ চেয়ে আছে, কিন্তু কোন ভাব নেই দৃষ্টিতে। কিছু দেখতে পাচ্ছে বলে মনে হল না রানার। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিড় বিড় করে জবাব দিল সে, 'কিছুই হয়নি আমার। তুমি দেখো, ঠিক সেরে উঠব আমি। দেখো, সেরে উঠব আমি।'

'হয়ত। কিন্তু বিজয় লাভের দিন তারিখ তোমার মনে থাকবে না।'

'কেন থাকবে না? থাকবে।' তার ঠোঁটে কান ঠেকিয়ে শুনতে পেল রানা।

'মনে হয় না আমার,' তার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল ও। 'ইতিমধ্যেই তুমি ভুলে গেছ কবে সেই বিজয় আসবে আমাদের।'

'না, ভুলিনি,' প্রায় শোনা যায় না এমন অস্পষ্ট তার কণ্ঠস্বর। 'তারিখটা হল…তারিখটা…' মনে করার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছে লোকটা, 'তারিখটা…আল মাকারদানায় গিয়ে জেনে এসেছি আমি…।'

অকস্মাৎ চোখের মণি দুটো স্থির হয়ে গেল এরাফিনের। মাথাটা একপাশে কাত হয়ে পড়ল। পুরো জ্ঞান হারাল সে এতক্ষণে।

আল মাকারদানা! আল মাকারদানা! ভাবছে রানা। ঘুমের মধ্যে শাফা উচ্চারণ করেছিল এই নামটা। মিস্ত্রী এরাফিনের মুখেও এই নাম। ব্যাপার কি!

গাড়িটা যেখান থেকে নিয়েছিল ঠিক সেখানেই গিয়ে থামল রানা। গওহর জুমলাতের সাইকেলটা সেইভাবেই পড়ে আছে একধারে। গাড়ি থেকে নেমে সেটাকে ধরে দাঁড় করাচ্ছে ও, এমন সময় একজন ল্যান্স করপোরাল ছুটে এসে ওর কনুইয়ের উপর হাতটা খামচে ধরল। 'পেয়েছি! এবার চলো, কার হুকুমে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল গাড়িটাকে?'

জরুরী প্রয়োজনের কথাটা ব্যাখ্যা করে বলতে শুরু করেছে রানা, এমন সময় হাঁপাতে হাঁপাতে একজন অফিসার ছুটে এল। ইউনিফর্মের সর্বত্র মেডেল আর ব্যাজ

আটকানো রয়েছে তার। 'এসব কি?' রক্তচক্ষু মেলে দেখল সে রানাকে। 'আমার গাড়ি। তুমি আমার গাড়ি চুরি করেছিলে। কেন?'

কারণটা বলল রানা।

'ওটা কোন কারণ নয়, অজুহাত। অজুহাত শুনে সন্তুষ্ট হবার বান্দা আমি নই। নাম? ইউনিট? নোট করো, করপোরাল।' একটা হাঁচি দিয়ে গাড়ির ভিতর ঢুকল সে।

গানপিটে ফিরে এসে সবাইকে দেখল রানা। কেউ কথা বলল না। চেয়ে আছে আকাশের দিকে। ভূতের মত চেহারা হয়েছে এক একজনের। প্রচণ্ড রোদ মগজ গলিয়ে দেবে বলে মনে হচ্ছে। রুমাল দিয়ে ঘাম মোছার জন্যে মাথা থেকে স্টীলের হেলমেটটা নামাল রানা। 'কাফাকে দেখছি না যে?' জিজ্ঞেস করল ও।

'বেচারা অসুস্থ বোধ করছে,' বলল গওহর জুমলাত। 'ওই ডিসপারসাল পয়েন্টের ওদিকে একটা শেলটারে বিশ্রাম নিতে গেছে।'

'অসুস্থ না কচু,' বলল নঈম যাকের। 'ভয়ে পিলে চমকে গেছে তার।'

'খোঁজ নিয়ে দেখো গে যাও, ও ব্যাটাও হয়ত একজন ইসরায়েলি গুপ্তচর। কে যে কি, বোঝা মুশকিল। নাফাসের কথাই ধরো, ঠিক শুক্রবার দিন ছুটি চাইবার কি তাৎপর্য? জাতভাই হলে কি হবে, ওকেও আমি একবিন্দু বিশ্বাস করি না। ব্যাটা নির্ঘাত ফালাঞ্জিস্ট।'

সাইয়িদ হাকাম লেবাননী খ্রীস্টান, এই প্রথম জানল রানা।

সাইকেলে চড়ে হঠাৎ এল আলী কায়সার। টেলিফোন লাইন অচল হয়ে যাওয়ায় সেই এখন অপারেশন কন্ট্রোলরুমের সাথে একমাত্র যোগাযোগ। গওহর জুমলাতকে সতর্ক সংকেত জানিয়ে চলে গেল সে। ঠিক কি জানাল, বলতে পারবে না রানা। ও তখন ওর স্টীল হেলমেটের দিকে চেয়ে আছে একদৃষ্টিতে। হেলমেটটার পিছনে গভীর একটা দাগ দেখা যাচ্ছে। বিদ্যুৎবেগে ঘষা খেয়ে চলে গেছে একটা বুলেট, গভীর দাগটার মাঝখানে ফুটো হয়ে গেছে সিকি ইঞ্চি। কিন্তু পিছনে! ভাবল রানা। পিছনে কেন?

পরিষ্কার মনে করতে পারল রানা, তখন কোথায় কি ভঙ্গিতে, কোন্ দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে ছিল ও। বুলেটটা ওর হেলমেটের ছাল তুলে নেয়ার সাথে সাথে প্রচণ্ড একটা ঝাঁকি খেয়েছিল ওর মাথাটা সামনের দিকে। পরিষ্কার মনে আছে—হঠাৎ শিউরে উঠল রানা। ল্যান্ডিং ফিল্ডের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে ছিল ও, এবং প্রতিটি প্লেন হয় ওর সামনে দিয়ে নয়ত মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেছে। একটাও ওর পিছন দিয়ে উড়ে যায়নি। অথচ, বুলেটটা লেগেছে হেলমেটের পিছনে।

মনে পড়ল, এই প্রথমবার মাথা থেকে নামিয়েছে ও হেলমেটটা। তার মানে, সামনের অংশটা পিছনে যেতে পারে না কোনভাবেই।

কোন সন্দেহ নেই, পিছন থেকে কেউ গুলি করেছে ওকে লক্ষ্য করে। চোখের সামনে জামাল আরসালানের চমকে ওঠা মুখটা ভেসে উঠল। অবাক বিস্ময়ে কি দেখছিল সে ওর দিকে তাকিয়ে?

রানা বুঝল, ও বেঁচে আছে দেখতে পেয়েই ভূত দেখার মত চমকে উঠেছিল জামাল আরসালান। বেঁচে থাকার কথা নয় ওর।

ঝড়ো কাকের মত ক্ষতবিক্ষত চেহারা হয়েছে প্লেনগুলোর। একটা দুটো করে ফিরে এসে নামছে রানওয়েতে। রোদের তাপে সামনের দৃশ্য ঝাপসা লাগছে চোখে। সময় যেন নিঃসাড় লাশের মত পড়ে আছে নাবাতিয়া ফাইটার স্টেশনে। খোলা গানপিটে দাঁড়িয়ে থাকলেও একটু বাতাস লাগছে না গায়ে। মাটিতে খালি পা পড়লেই ছ্যাঁকা লাগছে যেন আগুনের। দুশ্চিন্তা আর অসহিষ্ণুতা ভয়ের সাথে জট পাকিয়ে মনটাকে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে রানার।

আতাসীর জন্যে দুশ্চিন্তার সীমা-পরিসীমা নেই ওর। কোথায় তাকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, জানা সম্ভব হয়নি। জানার কোন উপায়ও চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে না ও। বর্তমানের এই বিপদ না কাটলে জামাল আরসালান সম্পর্কেও করা যাচ্ছে না কিছুই।

টেক-পোস্টের সংকেত সেই যে দেয়া হয়েছে, তা আর প্রত্যাহার করার নামটি নেই। ইফফাতের কথা ভেবে উদ্বিগ্ন বোধ করছে রানা। কি অবস্থায় কোথায় আছে সে, আদৌ আছে কি না···তারপর, এদিকে ইউনুস মেহেরেরও দেখা নেই। তার প্লেন এখনও ল্যান্ড করেনি রানওয়েতে।

শেষ পর্যন্ত লাউডস্পীকারে অল ক্লিয়ার ঘোষণা করা হল। কিন্তু গানপিট ছেড়ে বেরুবার নির্দেশ এল না।

'অবস্থা সুবিধের নয়,' মন্তব্য করল গওহর জুমলাত। 'বাতাসে বিপদের গন্ধ পাচ্ছেন অফিসাররা।'

চকলেট, সিগারেট আর কয়েক ফ্লাস্ক ভর্তি গরম চা এল, সাথে এল কালো মোষ ইয়াসির ফারুকী। তার সেই বদমেজাজী স্বভাবের কিছুই অবশিষ্ট দেখল না রানা। মুখে নরম হাসি লেগে রয়েছে। গানপিট থেকে বেরুবার অনুমতি দেয়া হয়নি শুনে অপারেশন কন্ট্রোলরুমের পক্ষ থেকে নিজেই ক্ষমা চেয়ে নিল। এগিয়ে এসে পিঠ চাপড়ে দিল রানার। 'তোমার বীরত্বের কথা শুনে খুব খুশি হয়েছি আমি, রানা,' হঠাৎ গলার স্বর খাদে নামিয়ে ফেলল সে। 'শুনলাম আতাসীর সাথে কথা বলেছ তুমি? থাক, থাক—এ ব্যাপারে পরে তোমাকে প্রশ্ন করে সব কথা জেনে নেব আমি।'

'না,' গোয়ার্তুমি ফুটিয়ে তুলল রানা কণ্ঠে। 'যা বলার এখুনি তা আমি আপনাকে বলতে চাই।' সাইয়িদ হাকামের তৎপরতা অনুমান করতে পেরে অবাক হয়ে গেছে রানা। এর মধ্যে সময় পেল কখন সে রিপোর্ট করার? 'ব্যাপারটা হল এই যে প্রিজন ভ্যানটাকে যেতে দেখে আমি ভাবলাম বন্দীকে স্টেশনের বাইরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তাকে আমি দেখেছি, কিন্তু লোকটা আমার পরিচিত নয়, তাকে চেনার কোন প্রশ্নই ওঠে না।'

'কিন্তু অচেনা একজন বন্দীর সাথে কথা বলার কি মানে?'

'কথা বলিনি,' রানা বলল, 'তাকে দেখে আমার মনে হল স্টেশন থেকে যখন চলে যাচ্ছে, ওকে কিছু মধুর কথা শুনিয়ে উৎসাহ দেয়া দরকার আমার···।'

'মানে?' ধীরে ধীরে কপালে উঠছে ইয়াসির ফারুকীর চোখ।

'আগে শুনুন আমার কথা। তারপর যা বলার বলবেন,' বলল রানা। 'একজন বন্দী, তাকে স্টেশন থেকে নিয়ে চলে যাওয়া হচ্ছে, আর হয়ত তাকে দেখার সুযোগ পাব না···।'

'ভুল ভেবেছ তুমি। বন্দীকে স্টেশনের বাইরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল না। উইং কমান্ডার তারেক হামেদীর আজ ওকে জেরা করার কথা ছিল, তাই···।'

যা জানতে চেয়েছিল, জানা হল রানার। 'সে যাই হোক। আমি জানব কিভাবে যে ওকে স্টেশন থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে না?'

'কি বলেছ তাকে তুমি?' কঠোর শোনাল ইয়াসির ফারুকীর কণ্ঠ।

'শুয়োরের বাচ্চা, মড়াখেকো বেঈমান, রেজন্মা খচ্চরের বাচ্চা, পচা ঘা, বিষাক্ত সাপ, শয়তানের লেজ···।'

হি হি, হি-হি-হি—চেপে রাখতে না পেরে পাশ থেকে মুক্ত করে নিল কাফা তার হাসিটা। রানা দেখল, ওর দিকে চেয়ে দাঁতে দাঁত ঘষছে সাইয়িদ হাকাম। চোখাচোখি হতেই তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে ঝট্ করে মুখ ফিরিয়ে নিল অন্যদিকে।

রানার দিকে একদৃষ্টে ক'সেকেন্ড চেয়ে রইল ইয়াসির ফারুকী। আর একটা কথাও বলল না সে। নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল গানপিট থেকে।

বিকেলের দিকে অনেক করে বুঝিয়ে দশ মিনিটের ছুটি আদায় করল রানা। গওহর জুমলাত বলল, 'কিন্তু কাছের ডিসপারসাল পয়েন্ট ছাড়া আর কোথাও যেতে পারবে না তুমি।'

তাই গেল রানা। কিন্তু পাইলটরা তাদের স্কোয়াড্রন লিডার সম্পর্কে কিছু বলতে পারল না ওকে। তার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না, এর বেশি কিছুই জানে না কেউ।

শেষ পর্যন্ত তিনটে পঁয়তাল্লিশ মিনিটে স্ট্যান্ড-ডাউনের অনুমতি মিলল ওদের। কিন্তু গওহর জুমলাত ওর দিকে তাকাতেই কথাটা মনে পড়ে গেল রানারঃ রুটিন অনুযায়ী এয়ার সেন্ট্রির দায়িত্ব পালন করার পালা এখন ওর।

মেজাজ সপ্তমে চড়ে গেলেও টুঁ-শব্দ করার উপায় নেই। অফিসার হিসেবে নয়, একজন সামান্য গানার হিসেবে আসতে হয়েছে ওকে এখানে, সুতরাং অসুবিধেগুলো মেনে না নিয়ে উপায় কি!

পাহারা দেয়ার সময়টা বসা তো চলেই না, তিন মিনিট একনাগাড়ে দাঁড়িয়ে থাকাও নিষেধ।

ছাউনি থেকে বিশেষ কাউকে বেরুতে দেখল না রানা। সবাই মড়ার মত ঘুমাচ্ছে, বুঝতে অসুবিধে হয় না। পাঁচটার সময় দু'মিনিটের জন্যে নিঃসঙ্গতা কাটল। চা খেয়ে আবার শুরু হল পায়চারি। দু'ঘণ্টার মত কেটে গেছে ইতিমধ্যে।

বাতাস নেই, কিন্তু রোদের ঝাঁঝ অনেক কম এখন।

ধসে পড়া নাবাতিয়াকে অন্যমনস্কভাবে দেখছে রানা। আগুনকে আয়ত্তে নিয়ে আসা হয়েছে ইতিমধ্যে। ধ্বংসস্তূপের ভিতর থেকে ধোঁয়ার সাথে কদাচ জিভ বেরুচ্ছে তার এখানে সেখানে দু'এক জায়গায়। প্রচণ্ড আক্রমণের ভয়াবহ স্বাক্ষর গানপিট থেকে পুরোটা দেখতে পাচ্ছে না ও। অক্ষত অবস্থায় প্রকাণ্ড হ্যাঙ্গারগুলো আড়াল করে রেখেছে চৌরাস্তাটা। রাস্তা দিয়ে ছুটোছুটি করছে অসংখ্য গাড়ি। রানওয়েতে কাজ করছে ইঞ্জিনিয়াররা। D. A. বোমা সরিয়ে ফেলা হয়েছে ইতিমধ্যে সব জায়গা থেকে। গানপিটের পিছন দিকে একটা গাড়ি থামল। কেউ নামল সম্ভবত, মনে হল রানার। সেদিকে তাকাল না রানা। মুখ তুলে একটা মিগকে দেখছে ও। মিগের লেজটা তুবড়ে গেছে। কাজ করছে না আন্ডারক্যারেজ। খুব ধীর গতিতে আসছে সেটা। প্যানকেক ল্যান্ডিং ছাড়া উপায় নেই তার।

'মাফ করবেন, আপনি কি বলতে পারবেন গানার মাসুদ রানাকে কোন হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে?'

শুধু কণ্ঠস্বরটাই কানে ঢুকল রানার। মাথাটা ঘোরাল সেদিকে, কিন্তু তখনও প্লেনটাকে দেখছে ও। 'কিছু বলবেন?'

'রানা!'

মনোযোগ হারিয়ে ফেলল রানা মিগটার উপর থেকে। ইফফাতের কণ্ঠস্বর! সূর্যের দিকে তাকিয়ে ছিল, ইফফাতকে দেখেও চিনতে পারল না ও। কিন্তু চুলের কাটিংটা অত্যন্ত পরিচিত চেনার জন্যে ওটাই যথেষ্ট। 'তোমার জন্যে দুশ্চিন্তায় ছিলাম।'

'রানা! সত্যি তুমি...,' হঠাৎ ছুটে এল ইফফাত। রানার সামনে এসে দাঁড়াল সে, একটা হাত ধরে ফেলল ওর। 'ইস্! যখন শুনলাম মারাত্মক ভাবে আহত হয়ে হাসপাতালে গেছ তুমি...।'

'কে বলল?'

'আমাদের ওখানেরই একটা মেয়ে। বলল, কি. ক. মাসুদ লেখা একটা আইডেন্টিটি ডিস্কসহ একজন লোককে হাসপাতালে পাঠানো হচ্ছে, দেখে এসেছে সে।'

'তার মানে এই নামে আরও একজন লোক স্টেশনে আছে।' মৃদু হাসল রানা। 'তুমি ছিলে কোথায়?'

'যেখানে থাকতে বলে দিয়েছিলে—শেলটারে।' চোখ বড় বড় করল ইফফাত। 'জানো, একটা বিল্ডিংও অক্ষত নেই। স্টেশন হেডকোয়ার্টারের পশ্চিম অংশের কাছেই ছিলাম আমরা। একটা বোমা গোটা অংশের ছাদ গুঁড়িয়ে দিয়েছে। পাঁচিলটা সটান আমাদের শেলটারের সামনে পড়েছে। আর একটু হলেই সবাই চিঁড়ে-চ্যাপ্টা হয়ে যেতাম আমরা। যেদিকে তাকাচ্ছি, ধ্বংস ছাড়া কিছুই দেখছি না। গ্যাস, পানি, ইলেকট্রিসিটি—কিছুই নেই।' একটু ইতস্তত করল সে, তারপর জিজ্ঞেস করল,

'আক্রমণটা এই রকম ভয়ঙ্কর হবে তা নিশ্চয়ই তুমি আগে থেকে জানতে?'

হেসে ফেলল রানা। বলল, 'আক্রমণের পরে অবস্থা দেখে বুঝেছি এরোড্রোমকে ধ্বংস করা নয়, এর লোকজন আর বিল্ডিংগুলোকে ধ্বংস করাই উদ্দেশ্য ছিল ওদের। দেখছ না, রানওয়েতে মাত্র দুই কি তিনটে বোমা পড়েছে।'

'তার মানে, তুমি বলতে চাইছ, রানওয়েটাকে ওরা নিজেদের কাজে লাগাবার জন্যে নষ্ট করেনি। ছত্রীবাহিনী নামাবে?'

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকল ওরা একসময় রানা বলল, 'এসব কথা থাক। তুমি কি এখন অপারেশন কন্ট্রোলরুমে যাচ্ছ?'

'না। কোয়ার্টারে ফিরে গিয়ে ইট বালি সরিয়ে বাসযোগ্য করতে হবে জায়গাটাকে। অবশ্য, আমাদের কেবিনটা অক্ষতই আছে দেখে এসেছি।'

পায়ের শব্দে ঘাড় ফেরাল রানা। পালাবদলের সময় হয়েছে ইতিমধ্যে। ওকে নিষ্কৃতি দেয়ার জন্যে আসছে কেউ।

'চলো, ইফফাত, মেইন গেট পর্যন্ত পৌঁছে দিই তোমাকে।'

গার্ডের দায়িত্ব হস্তান্তর করল রানা। ইফফাতের হাত ধরে বেরিয়ে এল গানপিট থেকে। 'শাফার কথা জানো কিছু?'

মাথা নাড়ল ইফফাত। 'কোথাও দেখছি না ওকে।'

সংক্ষেপে ঘটনাটা বলল রানা। তারপর হঠাৎ ইফফাতকে প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, জন্মদিন সম্পর্কে ঠিক কি বলেছিল তোমাকে শাফা?'

'এখন আর পরিষ্কার মনে নেই আমার,' বলল ইফফাত। 'এরকম একটা বিপদ গেল, মনে থাকবেই বা কিভাবে! শাফা ওর জন্মদিনের প্রসঙ্গটা উচ্চারণ করেছিল, এটুকু মনে আছে। জন্মদিনের সাথে আর কোন প্রসঙ্গে কথা বলেনি সম্ভবত...ও, হ্যাঁ, আল মাকারদানা প্রসঙ্গেও কি যেন বলেছিল—মনে নেই সবটা। বোধহয় ওই নামটাই উচ্চারণ করতে শুনেছিলাম আমি। ঘুমের মধ্যে বলছি তো, কোন কথাই পুরোটা উচ্চারণ করেনি। কিন্তু মিস্ত্রীটার মুখেও আল মাকারদানা—এর মানে কি, রানা?'

'লোকটা বেঁচে থাকলে তার সাথে আমার একটা বোঝাপড়া আছে। ইফফাত, চেষ্টা করলে তুমি কি শাফার জন্মদিনের তারিখটা জেনে নিতে পারো কারও কাছ থেকে?'

'কেউ না কেউ জানে—হ্যাঁ, তা পারব। কিন্তু তুমি কি সত্যিই ভাবছ...' হঠাৎ রানার মুখের দিকে চেয়ে চুপ করে গেল ইফফাত।

'যে-কোন মুহূর্তে আবার আক্রান্ত হতে পারি আমি, ইফফাত,' বলল রানা। 'হেলমেট ফুটো করে ক্ষান্ত হবে না জামাল আরসালান, সে আমার অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায়। যা করার দ্রুত করতে হবে। আল মাকারদানা জায়গাটা কোথায়, এ-ও জানার চেষ্টা করবে তুমি। শাফার জন্ম তারিখ যদি আগামী কয়েক দিনের মধ্যে হয় তাহলে জামাল আরসালানের ষড়যন্ত্রের সাথে তারিখটার কোন না কোন যোগাযোগ আছে বলে বিশ্বাস করতে হয়।'

হঠাৎ রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে পড়ল ইফফাত। রানার একটা কাঁধ আঁকড়ে ধরল সে। 'বোকার মত কিছু করতে যেয়ো না, রানা। বিশ্বাস করো, তোমার জন্যে ভয়ে বুকটা কাঁপছে আমার। কেন যেন মনে হচ্ছে বিরাট একটা শক্তির বিরুদ্ধে তুমি একা লড়তে গিয়ে নিজের সর্বনাশই করতে যাচ্ছ।'

রানা হাসল। 'আমি একা নই, ইফফাত। অস্বীকার করো, তুমিও আমার সাথে নেই? ইউনুস মেহেরও রয়েছে আমাদের সাথে, আশা করি। তাছাড়া দেশপ্রেমিক সবাই রয়েছে আমাদের দলে। দলে আমরাই ভারি, ইফফাত। অসুবিধে হল এই যে, আমরা যে সঠিক পথে যাচ্ছি তা এই মুহূর্তে কাউকে বিশ্বাস করানো সম্ভব নয়। সময় আসুক, তখন দেখবে...'

অফিসার্স মেসের পাশে ফেলা তাঁবুতে লোকজন ঢুকছে, বেরুচ্ছে। সেদিকে চোখ পড়তে একজনকে দেখে চিনতে পারল রানা। ইউনুস মেহের। বেঁচে আছে!

রানাকে দেখে হাসিমুখে কাছে এসে দাঁড়াল ইউনুস মেহের। নিখুঁত ভঙ্গিতে স্যালুট করল রানা। 'খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না তোমার। ঘটনাটা কি?'

'পঙ্খীরাজটা হারিয়েছি,' গম্ভীর হয়ে বলল ইউনুস। 'অবশ্য একটার বদলে সাতটা নামিয়েছি আমি। ষাট মাইল পর্যন্ত তাড়া করে গিয়েছিলাম ওদেরকে। ঠিক বর্ডারের ওপর জখম করেছি আরও দুটোকে, পরিণতি কি হল দেখার সুযোগ পাইনি অবশ্য, তার আগেই মেশিনগানের গুলি ঝাঁঝরা করে দেয় কন্ট্রোল প্যানেল। ভাগ্য ভাল যে বর্ডারের এপারে নামতে পারি প্যারাসুট নিয়ে। গাড়ি পাঠিয়ে এই মাত্র নিয়ে আসা হয়েছে আমাকে।'

'ক'টা হারিয়েছে ওরা মোট?' জানতে চাইল ইফফাত।

রানা পরিচয় করিয়ে দিল ওদেরকে। হাত তুলে সালাম করল ইফফাত। প্রত্যুত্তরে মুচকি হেসে বলল ইউনুস, 'কার সাথে বন্ধুত্ব পাতিয়েছেন তা যদি জানতেন!'

'জানি, ও একজন গানার,' ইফফাত বলল। 'কিন্তু সেটাই ওর বড় পরিচয় নয়। এক কালে সাংবাদিক ছিল, যুদ্ধ শেষে আবার ও সাংবাদিকতায় ফিরে যাবে—তাই না, রানা?'

'সাংবাদিকতাও একটা যুদ্ধ,' বলল রানা। 'হ্যাঁ, সাংবাদিকতায় ফিরে যেতে পারি। কিংবা, আরও বড় কোন যুদ্ধে, যদি সুযোগ এবং প্রয়োজন হয়।'

'পঞ্চাশটার ওপর প্লেন বর্ডারের এপারে রেখে গেছে ওরা,' বলল ইউনুস মেহের। 'আমার স্কোয়াড্রন চারটে হারিয়েছে। বলে একত্রিশটা নামিয়েছে। প্রথম ঝাঁকটাকে তো তোমরা দেখোইনি কেউ। উপকূলরেখা পেরোতেই আমরা বাধা দিই। ওখানেই ওরা হারিয়েছে পঁচিশটার ওপর। ভাল কথা, রানা, গত রাতে শহর থেকে তোমার বন্ধু দায়রা দাউদের সাথে টেলিফোনে কথা বলার সুযোগ পেয়েছিলাম আমি। আমাকে বলল, তোমার একটা মেসেজ নাকি ইতিমধ্যেই পেয়েছে সে।'

প্রশ্ন করে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল রানা, 'আজ আর কোন ফাইটার স্টেশন

আক্রান্ত হয়েছে কিনা জানো?'

'আরও দুটো,' বলল ইউনুস মেহের। 'দুটোই বন্দর এলাকায়।'

'আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য কি ছিল তা জানো? রানওয়ে, হ্যাঙ্গার—নাকি, গ্রাউন্ড ডিফেন্স, লিভিং কোয়ার্টার আর ব্যারাক?'

'পরিষ্কার কিছু শুনিনি। তবে, কে যেন বলছিল আক্রমণের ধরনটা হুবহু এখানকারই মত প্রচুর লোকজন মারা গেছে দু'জায়গাতেই। কয়েক হাজার লোক আহত হয়েছে। খাবার, পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস-সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেছে পুরোপুরি।'

'ইউনুস!' বলল রানা। 'বিশেষ একটা কাজ করতে হবে তোমাকে। গোটা লেবাননের অরডিন্যান্স সার্ভে ম্যাপ চাই আমি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।'

অবাক হয়ে চেয়ে রইল ইউনুস মেহের রানার দিকে। কি যেন ভাবল সে। তারপর একটু হাসল। 'ঠিক আছে, কোন প্রশ্ন করব না আমি। যা ভাল বোঝো, করো। L. A. F ম্যাপ আছে আমার কাছে, কিন্তু...।'

'ওদিকে কাজ পড়ে আছে আমার,' বলল ইফফাত। 'কাল সকালে তোমার সাথে দেখা করতে চেষ্টা করব।'

ইফফাত বিদায় নিয়ে চলে যেতে রানা বলল, 'ইউনুস, তুমি জানার জন্যে কৌতূহল না দেখালেও তোমাকে সব কথা জানানো উচিত বলে মনে করছি আমি।'

জামাল আরসালান এবং গোটা লেবাননের ফাইটার স্টেশনগুলোকে অচল করে দেয়া সংক্রান্ত তার ষড়যন্ত্রের ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে বলল রানা। সবশেষে বলল, 'আতাসীকে তুমি তো চেন তার মুখ থেকে নিজের কানে শুনেছি জামাল আরসালানের নাম। সন্দেহের কোন অবকাশই নেই আর। কিন্তু, ব্যাপারটা কঠিন বাস্তব হলেও আমার হাতে লোকটার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ নেই। কিন্তু প্রমাণ থাক বা না থাক, আতাসীকে উদ্ধার আমি করবই। ওকে উদ্ধার করার একমাত্র উপায় জামাল আরসালানের মুখোশ উন্মোচন করা। তাই করতে যাচ্ছি আমি। তোমাকে সব কথা জানাচ্ছি, তার কারণ কি বুঝতে পারছ তো, ইউনুস? তোমাকে বলার আগে আমার যদি কিছু হত, তাহলে আমার সাথেই শেষ হয়ে যেত ব্যাপারটা। আতাসীকে বাঁচাবার চেষ্টা করত না কেউ, জামাল আরসালানের ষড়যন্ত্রও সফল হত। কিন্তু তুমি জানার পর আমার কিছু যদি হয়ও, ব্যাপারটা শেষ হয়ে যাবে না, ঠিক?'

মাথা ঝাঁকিয়ে রানার বক্তব্য সমর্থন করল ইউনুস মেহের। 'কতটুকু কি করতে পারব জানি না, তবে চেষ্টা অবশ্যই করব। কিন্তু তোমার কিছু হবে একথা আমি ভাবতে চাই না। রানা, অত্যন্ত সতর্ক থাকা উচিত তোমার...।'

'সতর্কই আছি,' বলল রানা, 'কিন্তু পেছন থেকে বা চোখের আড়াল থেকে কিছু করা হলে সতর্কতায় খুব লাভ হবে না। সে যাক, L. A. F. ম্যাপ আছে বলছ, কিন্তু ওটা বিশেষ কোন কাজে লাগবে বলে মনে হয় না। তুমি চেষ্টা করে দেখো অরডিন্যান্স সার্ভে ম্যাপ পাও কিনা।'

'দেখব,' ইউনুস বলল। 'তোমাকে দেখেই কিন্তু ধারণা করেছিলাম, মারাত্মক

কিছু একটা ঘাপলা আছে স্টেশনে। কিন্তু তা যে এতটা ভয়ঙ্কর, কল্পনা করতে পারিনি। আল মাকারদানার কথা বলছ···যতদূর জানি, এ নামে বেশ কয়েকটা মরুদ্যান আছে লেবাননে। এতগুলোর মধ্যে ঠিক কোনটা বেছে নেবে তুমি? নির্দিষ্ট মরুদ্যানটা যদি বেছে নিতেও পারো, তারপর কি করবে বলে ভাবছ?'

'কি করব তা এখনও আমি জানি না।'

'কর্তৃপক্ষকে হয়ত রাজি করাতে পারো মরুদ্যানটা ঘেরাও করার জন্যে। কিন্তু যখন সত্যি সত্যি ঘেরাও করা হবে তখন হয়ত দেখা যাবে সেখানে কেউ নেই, কিছু নেই।'

'অফিসের মাধ্যমে কিছু করব না আমি,' বলল রানা। 'যা করার একা আমাকেই করতে হবে। আচ্ছা, পরের কথা পরে ভাবা যাবে'খন। তোমাকে অনেকক্ষণ আটকে রেখেছি···।'

ছাউনিতে ফিরে আসতেই গওহর জুমলাত জানাল, হেডকোয়ার্টার থেকে নির্দেশ এসেছে ছয়জন লোক পাঠাতে হবে ধ্বংসস্তূপ সরাবার কাজে সেনাবাহিনীকে সাহায্য করার জন্যে। ছয়জনের মধ্যে রানার নামও পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে অফিসে।

'ঘটনাটা হলো,' ফোড়ন কাটল কাফা, 'সাইয়িদ হাকাম নিজের নাম কেটে তোমার নাম বসিয়েছে তালিকায়। ফিউজ সেট করার কাজটা টেলিফোন কল রিসিভ করার চেয়ে জরুরী, এই হল তার বক্তব্য। দুঃখ কোরো না, দোস্ত। আমরা মুক্তিযোদ্ধা, দেশ বিপদমুক্ত হবার পর সমাজে ফিরে গিয়ে সম্মান আর মর্যাদার আসন পাব। কিন্তু ওরা যারা নিয়মিত বাহিনীর লোক, এই নরকেই চিরটা কাল কাটাতে হবে ওদের। এটা আমাদের কম সান্ত্বনা নয়।'

সর্বশরীর জ্বালা করে উঠল রানার। ব্যাখ্যা চাইবার জন্যে মুখ খুলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল ও। ছাউনি থেকে দূরে কোথাও যাবার সুযোগটা যখন পাওয়াই গেছে, সেটা হাত ছাড়া করা উচিত হবে না, ভাবল ও।

আটটার সময় অফিসে গিয়ে হাজিরা দিল রানা বাকি পাঁচজনের সাথে। ওখান থেকে স্টেশন হেডকোয়ার্টারে পাঠানো হল ওদের।

পাঁচটা ঘণ্টা একনাগাড়ে অমানুষিক পরিশ্রম করল রানা, দম ফেলবার ফুরসত মিলল না। স্টেশন হেডকোয়ার্টারটাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। একশো ট্রাক আর পাঁচশো সেনা আট ঘণ্টা খেটেও অর্ধেক জঞ্জাল পরিষ্কার করতে পারল না। হ্যাজাক লাইট জ্বেলে সারারাত কাজ চলবে। সেনাদের পালা বদলের সময় ওদের ছয় জনেরও ছুটি হলো। ছাউনিতে ফিরে রানা দেখল, সবাই গভীর ঘুমে অচেতন। শুধু নিজের বিছানায় একা বসে বসে দুলছে কাফা। ওর সাড়া পেয়ে চোখ মেলল সে। 'তোমার জন্যে বসে আছি, দোস্ত। খাবার পাহারা দিচ্ছি।'

'পাহারা দিচ্ছ কেন?'

'না দিলে খেয়ে নেবে হাভাতের দল, তাই।'

চেয়ে রইল রানা কাফার দিকে। গত আটচল্লিশ ঘণ্টা···না, ঘণ্টা নয়, আটচল্লিশ

দিন, কিংবা তারও উপর ভাল মত ঘুম হয়নি যার, পেট ভরে খেতে পায়নি যে, সে কিনা রাত জেগে পাহারা দিচ্ছে ওর খাবার! অথচ, রানার কাছ থেকে ভাল ব্যবহার বিশেষ পায় না সে। মানুষ কে কেমন বোঝা সহজ নয়, ভাবল ও।

'নাও, এবার তুমি ঘুমাও, কাফা.' রানা বলল।

'কিন্তু চোখ বুজলেই যে আমার কচি বাচ্চাটার মুখ দেখতে পাচ্ছি!' অসহায়ভাবে রানার দিকে চেয়ে রইল কাফা।

পোশাক না পাল্টেই নিজের বিছানায় পা ঝুলিয়ে বসল রানা। প্যাকেট থেকে বের করে একটা সিগারেট ছুঁড়ে দিল কাফার দিকে। 'কত বয়স ওর?'

'সাত। কিন্তু এখনই বলে, আব্বা, যুদ্ধ থেকে তুমি ফিরে না এলে আমি কিন্তু দু'পকেটে পাথর ভরে নিয়ে বেরিয়ে পড়ব ইসরায়েলের খোঁজে।'

'তাই নাকি!' শুকনো রুটিতে কামড় দিয়ে চিবুতে শুরু করল রানা। 'তোমার ছেলেও যোদ্ধা হবে বোঝা যাচ্ছে।'

'কিন্তু এয়ারফোর্সে দেব না ওকে, দোস্ত। এর মধ্যে যুদ্ধ নেই। পাথরের কথা বলতে ওকে আমি একটা বেয়োনেট উপহার দিয়ে এসেছি...'

'বলো কি! অতটুকু বাচ্চাকে...'

প্রাণ খুলে হাসতে শুরু করল কাফা। 'ওকে তো তুমি দেখোনি, দোস্ত। এমন কায়দা করে বেয়োনেট ধরে দেখলে তুমি তাজ্জব হয়ে যাবে। আমিই শিখিয়েছি কিনা।'

কিছু বলতে যাচ্ছিল রানা, ছুটন্ত পদশব্দ এগিয়ে আসছে শুনে কান খাড়া করল ও। 'ওই আসছে, টেক-পোস্ট!'

রাত দুটোয় অল ক্লিয়ার সংকেত পেয়ে আবার সবাই ফিরল ছাউনিতে। শুধু রানা বাদে। আবার ওর ডিউটির সময় হয়ে গেছে ইতিমধ্যে এয়ার-সেনট্রি হিসেবে।

বাকি রাতটা গানপিটে একা কাটাল রানা। সময়টা অত্যন্ত অস্বস্তির মধ্যে কাটল নিকষ কালো অন্ধকারে খুট্ করে একটা শব্দ হতেই পেশীগুলো টান টান হয়ে উঠল প্রতিবার। কোথাও কেউ নেই, তবু কেন যেন মনে হতে লাগল, আশপাশ থেকে লক্ষ করছে কেউ ওকে। কাছাকাছি সেন্ট্রিবক্সে বা রাস্তার উপর থেকে শব্দ এলেই ঝট্ করে রাইফেলটা কাঁধ থেকে নামিয়ে তৈরি হয়ে গেছে ও।

কিন্তু ঘটল না কিছুই। ভোরের দিকে দায়িত্ব আরেকজনকে বুঝিয়ে দিয়ে ছাউনিতে ফিরে শুয়ে পড়ল। সেকেন্ডের কাঁটা পুরো একপাক ঘোরার আগেই তলিয়ে গেল ও গভীর ঘুমের মধ্যে।

পরদিন শনিবার। সকালবেলার রোদটাকেই আগের দিনের দুপুরের চেয়ে বেশি তপ্ত লাগল রানার। সাড়ে আটটার দিকে ব্যাটারি থেকে একটা ট্রাক ওদের জন্যে শুকনো খাবার আর প্রকাণ্ড এক ট্যাঙ্ক ভর্তি পানি নিয়ে এল। দাড়ি কামানো সম্ভব হলেও ধোয়াধুয়ির কাজের জন্যে পানির বরাদ্দ মিলল না। এক থলে খুচরো পিয়াস্ত্রা হাতে নিয়ে সাইয়্যিদ হাকাম রানার পাশে দাঁড়াল, জাফরীর দিকে চেয়ে আছে সে।

'নিজের ভাগের এক বদনা পানি কেউ বিক্রি করবে?'

জাফরীর পিছনে ছিল কাফা। 'কত দেবে তুমি?'

'থলেতে যা আছে সব।'

'কত আছে?'

'দশ পিয়াস্ত্রার কম নয়, অনেক বেশিও হতে পারে।'

'বিশের বেশি নয় তো?'

'না, বিশ হবে না।'

'তোমার পানিটুকু কিনতে চাই আমি,' বলল কাফা। 'পঁচিশ পিয়াস্ত্রা দেব। রাজি?'

হেসে উঠল রানা। 'কাফা, বম্বারডিয়ারকে জিজ্ঞেস করো, ওর পানি একশো পিয়াস্ত্রায় বিক্রি করবে কিনা। পঁচাত্তর পিয়াস্ত্রা আমি তোমাকে ধার দেব, বিনা সুদে।'

চরকির মত আধপাক ঘুরে রানার মুখোমুখি হল সাইয়িদ হাকাম। 'বিক্রি করার কথা বলিনি, কিনতে চেয়েছি!' দু'কোমরে লোমশ হাত রেখে মারমুখো ভঙ্গি করল সাইয়িদ হাকাম। 'যারা বিক্রি করতে চায় তাদের উদ্দেশ্যেই প্রস্তাবটা ছিল আমার। তুমি কেন নাক গলাচ্ছ?'

'ও নাক গলাচ্ছে তার কারণ,' বলল কাফা। 'ও বুঝতে পারছে তোমার তলপেটের ব্যথাটা সারাবার জন্যে আরেকটা ঠিক সেই রকম জবর কিক্ দরকার বোধ করছ তুমি।'

'কাফা!' হুঙ্কার ছাড়ল সাইয়িদ হাকাম।

'কি শুরু করেছ তোমরা শুনি?' হাত-মুখ ধুচ্ছিল গওহর জুমলাত, ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল সে। সাইয়িদ হাকামের সাথে প্রায় ধাক্কা লাগতে যাচ্ছিল তার। হাকাম পিছিয়ে যেতে গিয়ে পানি ভর্তি বদনাটা উল্টে দিল নিজের অজান্তেই।

হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল কয়েকজন। সকলের দৃষ্টি অনুসরণ করে হাসির কারণটা দেখতে পেল সাইয়িদ হাকাম। রাগে, অপমানে কাঁপতে লাগল সে।

'কিছু হয়নি,' কাফা হাত নেড়ে বলল। 'হারামিপনার খেসারত হিসেবে মাটিকে নিজের পানি চাঁদা দিতে হয়েছে, সেজন্যে বম্বারডিয়ারের মেজাজ ঠিক নেই। এরকম যে হবে তা ও আগে থেকেই জানত, তাই আমাদের পানি কিনতে চাইছিল। কিন্তু···।'

'পানি বিক্রি করার নিয়ম নেই, জানো না নাকি তোমরা?' বিরক্তির সাথে বলল গওহর জুমলাত।

'একশো পিয়াস্ত্রা দিয়ে কিনতে চেয়েছি আমরা, সেজন্যে প্রাপ্য শাস্তি মাথা পেতে নেব,' বলল কাফা। 'কিন্তু আগে কিনবার প্রস্তাব দিয়েছে সাইয়িদ হাকাম, সুতরাং, ওর প্রাপ্য শাস্তি দেয়া হোক ওকে, তারপর আমরা···।'

'এত কথা শুনতে চাই না আমি।' ধমক লাগাল গওহর জুমলাত। 'পানি কেনা-বেচার কথা আর যেন কারও মুখে না শুনি।' রেগেমেগে চলে গেল সে। লেজ গুটিয়ে

তার সাথে পালাল সাইয়িদ হাকামও। কিন্তু খানিক দূর গিয়ে পিছন ফিরে কট্‌মট্‌ করে তাকাল সে রানার দিকে।

বলল, 'ঠিক আছে, আমিও দেখে নেব!'

একগাল হেসে মাথা কাত করল রানা, বলল, 'আচ্ছা!'

হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল কয়েকজন ওর ভঙ্গীটা লক্ষ্য করে।

সকালটা কেটে গেল দু'বার সতর্ক সংকেতের মধ্য দিয়ে। কি এক অজ্ঞাত কারণে এল না ইফফাত। লাঞ্চের পর অস্থির হয়ে উঠল রানা। সময় বয়ে যাচ্ছে দ্রুত অথচ কিছুই করতে পারছে না ও। ওর শাস্তির মেয়াদ পেরিয়ে গেছে, অবশ্য গওহর জুম্লাত ওকে কখনই বাধা দেয়নি ছাউনির কাছ থেকে দূরে কোথাও যেতে। চৌরাস্তায় অপারেশন কন্ট্রোলরুমের কাউকে পেলে ইফফাতের খবর কিছু জানে কিনা জিজ্ঞেস করা যেতে পারে ভেবে ছাউনি থেকে বেরুতেই রানা দেখল সাইয়িদ হাকাম আর নঈম যাকের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিচু গলায় নিজেদের মধ্যে কি যেন আলাপ করছে। দু'জনে একযোগে ঘাড় ফিরাল ওর দিকে। রানার দিকে চোখ রেখেই যাকেরকে কি যেন বলল সাইয়িদ হাকাম। রানা ওদেরকে দেখেও না দেখার ভঙ্গিতে দৃঢ় পায়ে রাস্তার দিকে এগোল।

'রানা,' প্রায় ছুটতে ছুটতে আসছে যাকের রানার হাঁটার সঙ্গে তাল রাখার জন্যে। 'শোনো, তোমার সাথে কথা আছে।'

দাঁড়িয়ে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল রানা। 'কি কথা?'

'সার্জেন্ট ছাউনিতে নেই,' রানার কাছে এসে দাঁড়াল যাকের, 'সুতরাং বম্বারডিয়ার সাইয়িদ হাকামকেই এখন আইন শৃংখলা ঠিকমত চলছে কিনা দেখতে হবে। ও তোমাকে ছাউনির কাছ থেকে দূরে কোথাও যেতে নিষেধ করেছে।'

'কেন?'

'তোমার শাস্তির মেয়াদ এখনও পেরোয়নি, তাই।'

মুচকি হাসল রানা। 'বম্বারডিয়ারকে গিয়ে বলো,' গলা চড়াল রানা, যাতে সাইয়িদ হাকাম শুনতে পায়, 'গোসল করতে যাচ্ছি আমি।' বলে আর দাঁড়াল না, শিস দিতে দিতে দ্রুত এগিয়ে চলল রাস্তার দিকে।

পিছন ফিরে আর তাকালই না ও।

কিন্তু কপাল মন্দ, অপারেশন কন্ট্রোলরুমের কারও সাথেই চৌরাস্তায় দেখা হল না ওর। ইফফাতের খবর নিতে হলে হয় ওর কোয়ার্টারে নয়ত অপারেশন কন্ট্রোলরুমে যেতে হবে। কিন্তু কোয়ার্টারে এখন তাকে পাওয়া যাবে না, জানে ও। আর কন্ট্রোরুমে গানারদের যাওয়াই নিষেধ।

মন আরও একটা কারণে খারাপ হয়ে গেল ওর। চৌরাস্তায় অসংখ্য ট্রাক আর সিভিলিয়ান মজুর দেখল ও। সেনাবাহিনীকে সাহায্য করার জন্যে বাইরে থেকে হাজারে হাজারে ধরে আনা হয়েছে লোকজন। এদের মধ্যে বেশিরভাগই ইসরায়েলের সমর্থক, বেইমান খ্রীস্টান ফালাঞ্জিস্ট হলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই।

ছাউনিতে ফিরছে রানা। চিন্তার ভারে মাথাটা নুয়ে আছে। পুরো অন্যমনস্ক। জায়গাটা থেকে ছাউনি দেখা যায়, দুশো গজ দূরে। প্রথম ডিসপারসাল পয়েন্টটা পেরোচ্ছে ও। দুটো মিগ রয়েছে ভিতরে, ঘাড় ফেরাতেই দেখতে পেল।

হাঁটতে হাঁটতেই পকেটে হাত ভরে সিগারেটের প্যাকেটটা বের করল রানা। বুক পকেটের ক্যাপ খুলে দিয়াশলাইও বের করল। খচ্ করে জ্বালল একটা কাঠি, সেই সাথে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। ছোট্ট বারুদটা পুড়ছে, পোড়ার শব্দটা থামার আগেই ঠা-ঠা-ঠা-ঠা গর্জে উঠল একটা মেশিনগান। স্পষ্ট অনুভব করল রানা, ওর আধ হাত সামনে দিয়ে চোখের পলকে বেরিয়ে গেল এক ঝাঁক বুলেট।

পরমুহূর্তে চারদিকে নিস্তব্ধ। হঠাৎ শুরু হয়েছিল, হঠাৎ করেই থেমে গেছে মেশিনগানটা।

খোলা জায়গায় একা দাঁড়িয়ে আছে রানা। কোথায় আত্মগোপন করতে তেমন জায়গা নেই আশপাশে। স্তম্ভিত দেখাচ্ছে ওকে। আঙুলে আগুনের তাপ অসহ্য হয়ে উঠতেই সংবিত ফিরল। তাড়াতাড়ি দেশলাইয়ের কাঠিটা ফেলে দিয়ে ডিসপারসাল পয়েন্টের দিকে তাকাল ও। কয়েক সেকেন্ড আগে ঘাড় ফিরিয়ে যেমন দেখেছিল ঠিক তেমনি আছে সব। মিগ দুটো দাঁড়িয়ে আছে পাশাপাশি, একটার সাথে আরেকটার ডানা প্রায় ছুঁইছুঁই করছে। টারমাকের দিকে তাকানো যায় না, রোদ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে চোখ। কাউকে দেখল না রানা। অথচ ডিসপারসাল পয়েন্ট ছাড়া চারদিকে বহুদূর পর্যন্ত আর কোন জায়গা নেই যেখান থেকে গুলি আসতে পারে। সিগারেট ধরাবার জন্যে হঠাৎ না দাঁড়ালে এই মুহূর্তে বুলেটে ঝাঁঝরা একটা লাশ হয়ে পড়ে থাকত ও, কথাটা ভাবতেই ঠাণ্ডা স্পর্শ অনুভব করল রানা শিরদাঁড়ায়। যে-কোন মুহূর্তে আবার গুলি হতে পারে। এবার স্থির দাঁড়ানো একটা লক্ষ্যকে ভেদ করতে হবে, পানির মতই সহজ কাজ একজন মেশিনগানারের পক্ষে।

ঢোক গিলল রানা। অনিচ্ছাসত্ত্বেও এগোতে শুরু করল ডিসপারসাল পয়েন্টটার দিকে। প্রতিটি পদক্ষেপ নিতে যেন একটা করে যুগ পেরিয়ে যাচ্ছে। এখনও বেঁচে আছে—ভাবতে আশ্চর্য লাগছে ওর।

জায়গাটা নির্জন। কেউ নেই। দু'পায়ের আঙুলের উপর দাঁড়িয়ে মিগ দুটোর ককপিটেও কাউকে দেখল না। অবাক হয়ে গেছে ও। যত গরমই হয়ে থাকুক, মেশিনগান থেকে আপনাআপনি গুলি বেরুতে পারে না।

হঠাৎ একজনকে দেখল রানা। কাঠির মাথায় তুলো পেঁচিয়ে কান খুঁটতে খুঁটতে ডিসপারসাল পয়েন্টের পিছনের দরজায় এসে দাঁড়াল সে। উদ্বেগহীন, ঠাণ্ডা চেহারা। মাথাটা একদিকে কাত হয়ে আছে। 'কিসের যেন একটা শব্দ শুনলাম,' প্রশ্ন নয়, মন্তব্যের সুরে বলল সে।

কি ঘটেছে শুনেও বিশেষ প্রতিক্রিয়া হল না তার। কাঠিটা কান থেকে বের করে তুলো পেঁচানো মাথাটা চোখের সামনে তুলে দেখল সে। তারপর নাকের কাছে নিয়ে গন্ধ শুঁকলো। 'রিপোর্ট করা দরকার তোমার তাহলে।' কাঠিটা ফেলে দিয়ে রানার

পাশ ঘেঁষে এগিয়ে গেল সে। কাছের মিগটার সামনে দাঁড়াল। ডানা দুটোর লিডিং এজ পরীক্ষা করতে করতে বলল, 'হুঁ, বুঝেও কিছু বুঝছি না। এদিকে এসো, দেখে যাও।'

লোকটার পাশে গিয়ে দাঁড়াল রানা। মেশিনগানের কালো হয়ে ওঠা জায়গাটা দেখাল সে। 'গুলি যে হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই...সাবধান, ছুঁলেই ফোস্কা পড়ে যাবে হাতে। কিন্তু গুলি ছুটল কিভাবে—খোদা মালুম! আমি ছাড়া দ্বিতীয় কেউ নেই-ও যে...।'

'হয় আর কেউ ছিল, নয়ত গুলি তুমিই করেছ,' শান্তভাবে বলল রানা। 'যেই করে থাকুক, কার নির্দেশে কাজটা সে করেছে তা আমি জানি।'

বিস্ময় আর মুহূর্তের জন্যে তার সাথে একটা ভীতির ভাব ফুটে উঠতে দেখল রানা লোকটার চোখেমুখে। তারপরই ভুরু কুঁচকে গম্ভীর হবার চেষ্টা করল সে। 'কি বলছ তা তুমি নিজেই জানো না, গানার।'

'আমি গানার তা তুমি জানলে কিভাবে?'

'অ্যাঁ? জানলাম কিভাবে...কেন, গানপিটে তোমাকে দেখিনি বলতে চাও?'

সামান্য একটু বেঁকে গেল রানার ঠোঁট জোড়া। হাসিটা দেখে ঢোক গিলল লোকটা। রানা বলল, 'তোমার নামে আমি রিপোর্ট করছি না। কারণ রিপোর্ট করে অফিস থেকে আমি বেরিয়ে আসার পরপরই তুমি খুন হয়ে যাবে। কে খুন করবে বা করাবে তা পরিষ্কার জানা আছে তোমার। আমি বলতে চাইছি, রিপোর্ট করে আমার কোন লাভ হবে না। কিন্তু একটা কথা, তোমার মনিবকে জানিয়ে দিয়ো, দিন ফুরিয়ে এসেছে তার।'

হন হন করে বেরিয়ে এল রানা বাইরে। রাস্তায় উঠে পিছন ফিরে একবার তাকিয়ে দেখল স্তম্ভিত হয়ে সেই জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। অবাক বিস্ময়ে চেয়ে আছে ওর দিকে।

'দোস্ত! হয়েছে কি তোমার? ভূত দেখেছ নাকি?' ছাউনিতে ঢুকতেই কাফার সামনে পড়ে গেল রানা।

'না। কেন?'

চারদিকে চোখ ঘোরাল কাফা। 'ওহে, ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করো ওকে কেউ!'

'সাদা কাগজের মত চেহারা হয়েছে তোমার, রানা,' বলল জাফরী।

রানা দেখল, সাইয়িদ হাকাম মাথা নিচু করে বসে আছে নিজের বিছানায়। ব্লেড দিয়ে পায়ের নখ কাটছে। নঈম যাকের তার পাশে বসে পা নাচাচ্ছে দ্রুত তালে।

'কি, কিছু বলছ না যে, দোস্ত?'

'দেখছি।'

'কি দেখছ?' একযোগে অবাক হয়ে জানতে চাইল কাফা আর জাফরী। ওদের পাশে দাঁড়াল কুতুব দীন।

'দেখছি আমাকে ফিরে আসতে দেখে বিস্ময়ের ভাবটা লুকোবার জন্যে কেউ অস্বাভাবিক আচরণ করছে কিনা,' বলল রানা। তারপর সংক্ষেপে বলল ও মেশিনগানের গুলি ছোটার ঘটনাটা।

'বলো কি, দোস্ত!'

'তুমি বলতে চাইছ কেউ তোমাকে মেরে ফেলতে চাইছে? দূর, এ আমি কক্ষনো বিশ্বাস করি না।' জাফরীর ফোলা মাংসল মুখে অবিশ্বাসের ছায়া পড়ল। এদিক ওদিক মাথা দোলাচ্ছে সে।

সাইয়িদ হাকাম এখনও মাথা নিচু করে আছে। কিন্তু পা নাচানো বন্ধ হয়ে গেছে যাকেরের। দু'জনেই ওরা খ্রীস্টান, ভাবল রানা, সেজন্যেই কি এত ঘনিষ্ঠতা?

'আমি এখন ঘুমাব,' প্রসঙ্গটাকে আর বাড়তে না দিয়ে নিজের বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল রানা। ইফফাতের কথাটা ভুলতে পারছে না ও। কোন বিপদে পড়েনি তো সে? হঠাৎ একটা আতঙ্কের স্পর্শ অনুভব করল রানা হৃৎপিণ্ডের কাছাকাছি। শত্রুপক্ষের লোক চারদিকে ছড়িয়ে আছে, তাদের দৃষ্টি ইফফাতের উপর না পড়ার কোন কারণই নেই। নিজের উপর প্রচণ্ড রাগ হল ওর। এসবের সাথে ইফফাতকে জড়িয়ে মারাত্মক একটা ভুল করে ফেলেছে বলে মনে হল। হঠাৎ চমকে উঠল রানা একটা চিৎকারে।

'টেক পোস্ট!'

হুড়মুড় করে বাইরে বেরিয়ে ওরা দেখল টাইগার স্কোয়াড্রন ডিসপারসাল পয়েন্ট ছেড়ে রানওয়ের দিকে ছুটতে শুরু করেছে ইতিমধ্যেই।

তিন

ঠায় দাঁড়ানো অবস্থায় দু'ঘণ্টা কাটল। সেই যে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে উড়ে গেছে টাইগার স্কোয়াড্রন, ফেরার কোন লক্ষণই নেই। এমন সময় ঈগল স্কোয়াড্রনকে বেরিয়ে আসতে দেখল রানা ডিসপারসাল পয়েন্ট থেকে। ইউনুস মেহের রানওয়েতে মিগ তুলে ককপিট থেকে হাত নাড়ল। একটু অন্যমনস্কতার সাথে স্যালুট করল রানা। ভাবল, ইউনুস ম্যাপগুলোর খোঁজ করেছে, নাকি ভুলেই গেছে কথাটা?

দক্ষিণ-পশ্চিম দিকেই অদৃশ্য হয়ে গেল ঈগল স্কোয়াড্রন। তার মানে, এম নাকুরা রেইড করেছে ইসরায়েলি এয়ারফোর্স। টাইগার স্কোয়াড্রন ধ্বংস হয়ে গেছে নাকি? দু'ঘণ্টা তার কোন খবর নেই, এদিকে ঈগল স্কোয়াড্রনও গেল...একটা দুশ্চিন্তায় পড়ল রানা।

কিন্তু দুশ্চিন্তাটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না। দক্ষিণের ডিসপারসাল পয়েন্ট আর গানপিটের মাঝখানে টেলিফোন লাইন মেরামতের কাজ চলছে। ব্যাপারটা আগেই লক্ষ করেছে রানা। তিনজন মিস্ত্রী কাজ করছে। হঠাৎ সেদিকে নজর পড়তে দেখল, সবচেয়ে অল্প বয়স্ক মিস্ত্রীটা একদৃষ্টে চেয়ে আছে ওর দিকে।

একটু সচেতন হল রানা। চোখ ফিরিয়ে নিয়ে অন্যমনস্ক হবার ভান করল। অনেকক্ষণ পর কাফা একটা সুযোগ করে দিল ওদিকে তাকাবার। 'ওটা কি উইং কমান্ডারের গাড়ি?' কাফা হাত লম্বা করতেই সেদিকে ঘাড় ফিরিয়ে চোখ বুলিয়ে নিল রানা দ্রুত। হ্যাঁ, যা ভেবেছিল তাই—স্টীল রিমের চশমা পরা ছোকরা মিস্ত্রীটা চেয়ে আছে ওর দিকে।

পনেরো মিনিট পর আবার একবার চোখাচোখি হল ওদের। ইতিমধ্যে রানা লক্ষ করেছে, ছোকরা কাজ থামিয়ে মুখ তুলেছে বেশ কয়েকবার। এদিকেই তার নজর।

চোখাচোখি হবার পর এদিকে আর তাকাল না। দূর থেকেও রানা যেন বুঝতে পারল তাকাবার ইচ্ছাটা দমন করার জন্যে নিজের সাথে রীতিমত যুদ্ধ করছে সে।

'অ্যাটেনশন, প্লীজ!' সব লাউডস্পীকার কাজ করছে এখন আবার। 'প্রিলিমিনারি এয়ার-রেইড ওয়ার্নিং···।'

টেলিফোন লাইনের খুঁটি থেকে নেমে পড়ল মিস্ত্রীরা। টারমাকের উপর দিয়ে হেঁটে আসছে তিনজন। না দেখার ভান করে চোরা চোখে স্টীল রিমের দিকে তাকাল ক'বার রানা। ওদের গ্যানপিটের পাশ ঘেঁষে রানওয়ের উপর দিয়ে সকলের আগে আগে হাঁটছে সে, দ্রুত। রানার দিকে তাকালই না।

একটা শত্রু বিমান দেখল গওহর জুমলাত। সবাই সেটা নিয়ে মহা হৈ-চৈ শুরু করে দিতে মিস্ত্রীটার কথা ভুলে গেল রানা। খালি চোখে প্লেনটাকে কাফা ছাড়া কেউ দেখতেই পেল না।

যাকের বলল, 'কচু!'

'তার মানে? কি বলতে চাও? দেখতে পাচ্ছি না আমি?' মারমুখো হয়ে উঠল কাফা।

'লুকোবার জন্যে ছুটোছুটি শুরু করোনি, তাই ভাবছি···।'

হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল কুতুব দীন।

এমন সময় হঠাৎ গানপিট আর ব্যারাকের মাঝখানে ডিসপারসাল পয়েন্টের সামনে স্টীল রিমটাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল রানা। ভাগ্যের জোরে প্রাণটা বেঁচে গেছে ওর ওই জায়গাতেই। ওখানে মিস্ত্রীটাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কেন যেন ছ্যাঁত করে উঠল বুক। এতদূর থেকে কিভাবে তাকে চিনতে পারছে ভেবে নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেল রানা। এদিকেই চেয়ে আছে সে।

হঠাৎ সংবিত ফিরল গওহর জুমলাতের মুখে ওর নাম শুনে। ঘাড় ফেরাতেই দেখল গ্লাস জোড়া বাড়িয়ে ধরেছে সার্জেন্ট ওর দিকে। 'দেখো দেখি, তোমার চোখে কিছু ধরা পড়ে কিনা। সেই কখন থেকে আর একটাও দেখছি না।'

দু'মিনিট পর চোখ থেকে বিনকিউলার নামিয়ে ফেরত দিল রানা। 'নাহ্।' তারপর ঘাড় ফেরাল ডিসপারসাল পয়েন্টের দিকে।

কোথায় স্টীল রিম! তার ছায়া পর্যন্ত দেখল না রানা। কিন্তু দেখতে না পেলে

হবে কি, রানার মনে হল, আশপাশেই কোথাও সে লুকিয়ে আছে। ওর উপর নজর রাখতে একা এসেছে তা না-ও হতে পারে। ভাবছে রানা। শুধু নজর রাখতেই এসেছে কিনা তাই বা কে জানে!

একটা অস্বস্তি। একজন লোক আত্মগোপন করে থাকতে পারে এমন জায়গার অভাব নেই আশেপাশে। চারদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলে দেখে নিল রানা একবার। তারপর আরেকবার। অস্বস্তি কাটিয়ে উঠতে পারছে না ও। গানপিটটা উঁচু জায়গায়, যে-কোন দিক থেকে গুলি করে লক্ষ্যভেদ করা পানির মতই সহজ কাজ।

যুদ্ধ নয়, ভাবছে রানা, এটা ব্যক্তিগত আক্রোশ। হাজারটা শত্রু বিমান মাথার উপর উড়ে এলেও এরকম অস্বস্তিবোধ করার কারণ ঘটে না। যুদ্ধটা সকলের বিরুদ্ধে পরিচালিত, নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে নয়। কিন্তু স্টেশনে ওর বিরুদ্ধে যেটা ঘটছে সেটা যুদ্ধের চেয়ে অনেক ভয়ঙ্কর—হত্যাকাণ্ডের ষড়যন্ত্র। নির্দিষ্টভাবে ওকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ার সুযোগ খুঁজছে কয়েকজন লোক।

টাইগার স্কোয়াড্রন আর ঈগল স্কোয়াড্রন পঁচিশ মিনিটের ব্যবধানে রানওয়েতে নামল। মোট তিনটে মিগ কম, গুণে দেখল রানা। ফাঁকা হয়ে গেল বুকটা পাইলটদের দেখে। ইউনুস মেহের নেই তাদের মধ্যে।

দীর্ঘক্ষণ ভালমন্দ কোন খবরই পাওয়া গেল না। সতর্কসংকেত প্রত্যাহার করা হয়নি, তাই খোঁজ নেয়ার জন্যে ডিসপারসাল পয়েন্টে যেতে চাইলে অনুমতি দেবে না গওহর জুমলাত। অস্থিরতার সাথে অপেক্ষা করে আছে রানা।

'আহা! আমাদের স্কোয়াড্রন লিডার বেচারা বোধহয়...।'

সাইয়িদ হাকামের অসমাপ্ত কথাটা উপযুক্ত চামচার মত পূরণ করল নঈম যাকের, 'পটল তুলেছে!'

'যাকের!' এই প্রথম রাগতে দেখল রানা গওহর জুমলাতকে। 'এরপর এরকম অলক্ষুণে কথা ফের যদি তোমার মুখে শুনি, রিপোর্ট করব আমি মি. ইয়াসির ফারুকীর কাছে। তোমাদের দেশপ্রেমের নমুনা দেখে লজ্জায় মাটির সাথে মিশে যেতে ইচ্ছে করে আমার। ছিঃ!'

সাইয়িদ হাকাম মুখ খুলল না দেখে যাকেরও চুপ।

একজন পাইলট এল একটা চিঠি নিয়ে। গওহর জুমলাতের চাচাত ভাই সে। চিঠি পড়ে সার্জেন্ট গম্ভীর। 'মায়ের কাণ্ড! বিয়ে দেবে বলে মেয়ে ঠিক করে ফেলেছে। এদিকে যে আমি যুদ্ধের সাথে বিয়ে করে বসে আছি...'

এন নাকুরায় তিনটে মিগ হারিয়েছে ওরা। ইউনুস মেহের একাই চারটে থান্ডারচীফকে নামিয়েছে। সম্ভবত বেঁচে আছে সে। শেষবার তাকে দেখা গেছে একটা থান্ডারচীফের দিকে জ্বলন্ত মিগটাকে ছুটিয়ে দিয়ে প্যারাসুট নিয়ে শূন্যে লাফিয়ে পড়তে।

শুধু এন নাকুরা নয়, আরও চারটে ফাইটার স্টেশন আক্রান্ত হয়েছে আজ।

গওহর জুমলাতের চাচাত ভাই বিদায় নিয়ে চলে যাবার পরও খানিকক্ষণ

খবরগুলো নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করল রানা। তারপর শান্তভাবে সিদ্ধান্ত নিলঃ গোপনে স্টেশন ত্যাগ করতে হবে ওকে।

আজ আরও চারটে ফাইটার স্টেশন রেইড করা হয়েছে। এই ঘটনার তাৎপর্য কি তা একমাত্র ও-ই জানে, রানা ভাবছে। গোটা লেবানন কজা করার প্রস্তুতি নিচ্ছে ইসরায়েল, রেইডগুলো তারই আলামত। ছত্রীবাহিনী নামিয়ে দখল করে নেবে তারা প্রতিটি ফাইটার স্টেশন। প্রতিরোধের সম্মুখীন যাতে না হতে হয় তার জন্যে এই ব্যাপক রেইডের পরিকল্পনা করেছে তারা, আঘাত দিয়ে যথাসম্ভব দুর্বল করে নিচ্ছে স্টেশনগুলোকে।

জামাল আরসালানের নিশ্চয়ই একটা হেডকোয়ার্টার আছে কোথাও, ভাবছে রানা। সেটা স্টেশনের বাইরেই কোথাও, সন্দেহ নেই। আল মাকারদানা মরুদ্যানটাই কি সেই হেডকোয়ার্টার? শাফা এবং এরাফিন দু'জনেই নিজেদের অজ্ঞাতে জায়গাটার নাম উচ্চারণ করেছে। নিশ্চয়ই একটা তাৎপর্য বহন করে আল মাকারদানা।

এদিকে লক্ষণ কোনটাই ভাল ঠেকছে না রানার। কিছু একটা হয়েছে ইফফাতের, তা না হলে দেখা করছে না কেন সে? ইউনুস মেহের প্যারাসুটের সাহায্যে কোথায় নেমেছে, বেঁচে আছে কিনা কিছুই জানা যাচ্ছে না। স্টেশনে যদি ফিরেও আসে, ম্যাপটা যোগাড় করে দিতে পারবে কিনা কে জানে।

পালাতে হবে স্টেশন ছেড়ে, যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি। সম্ভব হলে আজ রাতেই। দুটো কারণে সময় নষ্ট করতে রাজি নয় ও। এক, তৃতীয়বার শত্রুপক্ষ ওকে খুন করার চেষ্টা করবে, এবং এবার তারা ব্যর্থ না-ও হতে পারে। যে-কোন দিক থেকে যে-কোন মুহূর্তে আসতে পারে ওর উপর চূড়ান্ত আক্রমণটা। দুই, জামাল আরসালানের হেডকোয়ার্টার আবিষ্কার করা না গেলে তার পরিকল্পনা সম্পর্কে কিছুই জানতে পারবে না ও। কিছু না জেনে কিছু করা সম্ভব নয়। এখানে বসে বসে কামান দাগলে লাভ হবে না।

গোটা ব্যাপারটা জুয়া খেলার মত, অনুভব করছে রানা। স্টেশনের বাইরে জামাল আরসালানের হেডকোয়ার্টার থাকতে পারে, না-ও থাকতে পারে। তবু, সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে ও, ঝুঁকিটা যত বড়ই হোক, স্টেশনের বাইরে যেতেই হবে একবার।

সেনাবাহিনী থেকে পালাবার শাস্তি ভয়ঙ্কর। বাইরে লুকিয়ে থাকা বেশিদিন সম্ভব নয়, ধরা ওকে পড়তেই হবে। কাজ সেরে আবার ফিরে আসতে চাইলেও দুর্লঙ্ঘ্য বাধা আছে। ফিরে আসতে পারলেও দাঁড়াতে হবে কোর্টমার্শালের সামনে।

কিন্তু কি হবে না হবে এসব চিন্তা বাতিল করে দিয়ে বর্তমান সমস্যা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা শুরু করল রানা।

স্টেশন থেকে পালানো কি আদৌ সম্ভব? পালাবার উপায়টা কি? মেইন গেট দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া অসম্ভব, প্রশ্নই ওঠে না। গোটা স্টেশনটাকে ঘিরে রেখেছে

কাঁটাতারের উঁচু বেড়া, গার্ডবাহিনী রাতদিন চব্বিশ ঘণ্টা কড়া পাহারা দিচ্ছে বেড়াটাকে। রোজ রাতেই ঠুস-ঠাস গুলির আওয়াজ শুনতে পায় রানা। ক'দিন আগে জেনেছে ঝোপ-জঙ্গলে ইঁদুর চরতে দেখলেও গুলি করে সেন্ট্রিরা, বেড়ার এপারে ঢুকতে দেয় না একটাকেও। অথচ এই বেড়া টপকানো ছাড়া পালাবার আর কোন উপায় নেই। রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে ঝুঁকিটা নেবে ও। ছাউনির পিছন দিকে ঢালু জায়গাটার কাছে টপকাতে হবে বেড়া। বেড়ার দু'পাশেই প্রায় গভীর জঙ্গল থাকায় গা ঢাকা দেয়া কিছুটা সহজ হবে বলে মনে হল ওর।

পাঁচটার সময় স্ট্যান্ড-ডাউনের অনুমতি এল। ছাউনিতে ফিরে পোশাক খুলল না রানা, বিছানায় সটান শুয়ে মাথা পর্যন্ত টেনে নিল চাদরটা।

'হেঃ হেঃ, দোস্ত!'

পিত্তি জ্বলে গেল রানার। 'কাফা, ঘুমাতে দাও আমাকে, বিরক্ত কোরো না!' চিন্তায় কেউ ব্যাঘাত সৃষ্টি করুক এই মুহূর্তে তা চাইছে না রানা।

'হেঃ হেঃ, মানে আমাদের ভাইপোর হবু মা···।'

চাদর সরিয়ে ফেলল মুখ থেকে রানা! 'কি বললে?'

'তোমার বাচ্চার মা হবে যে, তার কথা বলছি, দোস্ত। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গানপিটের চারদিকে ফুল ছড়াচ্ছে দেখে এলাম।'

বিছানা থেকে নেমে পড়ল রানা। বাঁ হাতের ঘুসিটা কাফার নাক বরাবর ছুঁড়ল ও, কাফা একপাশে সরে যাবার চেষ্টা করতেই ডান হাত দিয়ে তার মাথায় একটা গাঁট্টা মেরে ছুটল দরজার দিকে।

মিথ্যে বলেনি কাফা। ইফফাতকে দেখে রানারও মনে হলো তার হাসিটা ফুলের মতই তাজা। কিন্তু মুগ্ধ ভাবটা উড়ে গেল কাছে পৌঁছুবার আগেই। সামনে দাঁড়িয়ে প্রথমেই কাজের কথা পাড়ল ও। 'শাফার জন্মদিন···?'

'জেনেছি। আগামী রোববার।'

শিরশির করে উঠল রানার শরীর। 'রোববার? বলো কি! তার মানে আগামীকাল?'

উপর-নিচে মাথা ঝাঁকাল ইফফাত।

আগামীকাল মানে, আগামীকাল সকালেই ঘটবে যা কিছু, যদি ঘটে—ভাবছে রানা। প্যারাট্রুপার নামাবার জন্যে সবচেয়ে উপযুক্ত সময় ভোরের আবছা অন্ধকার, সন্দেহ কি! তারমানে হাতে সময় নেই বললেই চলে, মাত্র বারো ঘণ্টা বাকি···।

'ব্যাপার কি, রানা?'

'ব্যাপার হলো হাতে সময়ও নেই, কি করতে হবে তা-ও পরিষ্কার জানি না, অথচ কিছু না করতে পারলে গোটা লেবাননকে রক্ষা করা সম্ভব নয়, পরিষ্কার বুঝতে পারছি।'

রানার অস্থিরতা দৃষ্টি এড়াল না ইফফাতের। 'উইং কমান্ডার বা কর্তৃপক্ষের আর কাউকে যা জানো খুলে বললে কি হয়?'

'আমার ধারণা আর বিশ্বাসগুলোর কি মূল্য আছে তাদের কাছে? অকাট্য প্রমাণ চাইবে তারা।'

'কিন্তু একা তুমি করবেই বা কি?'

'আজ রাতে আল মাকারদানায় যেতে চাই আমি।'

'কিন্তু কিভাবে? ছুটি তো পেতেই পারো না।'

'না। পালাতে হবে আমাকে।'

'পাগল হয়েছ তুমি!' চোখ বড় বড় করল ইফফাত। 'নির্ঘাৎ গুলি করবে তোমাকে।'

'নতুন কিছু নয়,' হাসল রানা। 'ইতিমধ্যেই দু'বার গুলি করা হয়েছে আমাকে লক্ষ্য করে।'

'রানা!' রানার হাত ধরে ফেলল ইফফাত। 'কি বলছ তুমি?'

ঘটনা দুটো সংক্ষেপে বলল রানা।

'তোমার অফিসারকে এসব জানাচ্ছ না কেন?'

'প্রমাণ করতে পারব না, তাই। সার্জেন্টকে বললে সাথে সাথে রিপোর্ট করবে সে ইয়াসির ফারুকীর কাছে। বিরক্ত হয়ে সে হয়ত অন্য কোথাও বদলি করবে আমাকে, সব যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে আমার।' ইফফাতের কাঁধে একটা হাত রাখল রানা। 'আমার জন্যে কোন রকম দুশ্চিন্তা করো তুমি তা আমি চাই না, ইফফাত। আজ রাতেই চেষ্টা করব আমি বেরিয়ে যেতে। ইউনুসের এখনও কোন খবর নেই, সম্ভবত অরডিন্যান্স ম্যাপ তার কাছ থেকে পাব না আমি। অথচ ম্যাপ ছাড়া বাইরে বেরিয়ে লাভও হবে না কিছু। তোমাদের অপারেশন কন্ট্রোলরুমে ম্যাপ আছে কিনা জানো?'

'আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু বের করা সম্ভব নয়।'

'আছে কিনা জানার চেষ্টা করো আগে। যদি সম্ভব হয়, বের করে নিয়ে এসো। ম্যাপটা আমার সবচেয়ে বেশি দরকার, ইফফাত।'

ইতস্তত করতে দেখল রানা ইফফাতকে। তারপর বলল, 'কিন্তু আল মাকারদানার সাথে শাফার জন্মদিনের বা আল মাকরদানার সাথে ফাইটার স্টেশন দখল করে নেয়ার সম্পর্ক কোথায় বুঝতে পারছি না আমি, রানা।'

'সম্পর্ক আছে এই বিশ্বাসটুকু নিয়েই কাজ করছি আমি।'

'ঠিক আছে, তোমাকে আমি সাহায্য করব,' বলল ইফফাত। 'এক্ষুণি ফিরে গিয়ে খোঁজ শুরু করব আমি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে এসে জানাব কি হলো।'

'খুব সাবধানে, ইফফাত,' বলল রানা, 'হয়ত তোমার ওপরও নজর রেখেছে ওরা।'

'হয়ত নয়, সত্যি রেখেছে। এখানে আসার সময় ওই ডিসপারসাল পয়েন্ট পর্যন্ত অনুসরণ করে এসেছে আমাকে একজন লোক। তোমার কাছেই আসছি বুঝতে পেরে ফিরে গেল।'

'এখনও ভেবে দেখতে পারো, আমার সাথে যোগাযোগ রাখতে চাও কিনা। যদি মনে করো…।'

'আমার কাছে ব্যাপারটা যুদ্ধের একটা অংশ বলে মনে হচ্ছে, রানা। দেশকে আমি কারও চেয়ে কম ভালবাসি না। নিয়ম ভাঙছি, কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু তা ভাঙছি নিয়মের মাধ্যমে ষড়যন্ত্রটা উদঘাটন করা সম্ভব নয় বলেই। ধরা পড়ে যদি শাস্তি পেতে হয়, তবু ভাল। ষড়যন্ত্র একটা চলছে একথা বুঝতে পেরেও চুপ করে থাকার অপরাধবোধ থেকে তো অন্তত রেহাই পাব।'

'চমৎকার যুক্তি,' বলল রানা। 'ম্যাপটা যদি বের করে আনতে না-ও পারো, ক্ষতি নেই। আল মাকারদানা মরুদ্যানটা কোথায় তা দেখে এলেই চলবে। শুনেছি, ওই নামে অনেকগুলো মরুদ্যান আছে। তুমি বিশেষ করে দেখবে ফাইটার এরোড্রোমের কাছাকাছিরগুলো।'

'ঠিক আছে।'

ইফফাতকে ফেরত পাঠিয়ে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ছাউনির পিছন দিকে চলে এল রানা। কেউ পিছু পিছু আসছে কিনা দেখে নিয়ে ঢালু জমি বেয়ে নামতে শুরু করল নিচে। বিশ গজ নেমে কাঁটাতারের বেড়ার মুখোমুখি হলো ও। ঝোপজঙ্গলের উপর মাথা বের করে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দশ গজ পর পর একটা করে লোহার থাম। প্রতিটি থামের গায়ে আটটা করে লোহার বালা। বালাগুলোর ভিতর দিয়ে গেছে কাঁটাতার। ওপারে যাওয়া কঠিন বলে মনে হলো না। আসল ভয় গার্ডদের নিয়ে। গার্ডদের তাঁবুর দিকে এগোল ও।

সেন্ট্রিবক্সে দু'জনকে দেখল রানা। কুশল বিনিময় করল না থেমেই। গার্ডদের তাঁবুটা চল্লিশ গজ দূরে আরও। করপোরালকে সিগারেট খাইয়ে গল্প জমিয়ে তুলল ও। কোন প্রশ্ন না করেই কথা প্রসঙ্গে জেনে নিল প্রতি একশো গজ দূরে একটা করে সেন্ট্রি-বক্স আছে, প্রতি সেন্ট্রি-বক্সে দু'জন করে গার্ড থাকে সাধারণত। এছাড়াও, সরাসরি তাঁবু থেকে একটা নিয়ম ধরে জঙ্গলে টহল দেয়ার জন্যে পাঠানো হয় কয়েকজন গার্ডকে। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে এঁকেবেঁকে গেছে একটা রাস্তা, সেটার উপরই প্রহরীদের কড়া নজর। কেননা, গত মাসে ওই পথ দিয়েই তিনজন পালিয়ে গেছে। এই ঘটনার পর হেডকোয়ার্টার থেকে অর্ডার দেয়া হয়েছে, নিশ্চিতভাবে যদি বোঝা যায় যে কেউ পালাচ্ছে তাহলে তাকে গুলি করা যাবে।

রাত দশটা বেজে যেতেও ইফফাতকে আসতে না দেখে মনটা দমে গেল রানার। ম্যাপ দেখতে গিয়ে ধরা পড়ে গেল নাকি? স্ট্যান্ড-টু এর পালা শেষ হবে এগারোটার দিকে। কিন্তু তখন ইফফাতের খোঁজে ছাউনি থেকে বেরুনো অসম্ভব। এগারোটার পর বাইরে ঘুরঘুর করা নিষেধ।

'দোস্ত, কি দেখছ বলো দিকি বারবার ঘাড় ফিরিয়ে?' কাফা হাত পাতল রানার সামনে। 'দাও, এক শলা বিড়ি দাও।'

প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করল রানা। কাফাকে দিল একটা। 'এখন নয়,

ছাউনিতে ফিরে ধরিয়ো।'

'আমাকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে না। তা উপকারের বদলে তোমার জন্যে কি করতে পারি বলো দিকি? একটা গান শুনবে? দুঃখের?'

মৃদু হেসে রানা বলল, 'না।'

'তোমার সাথে আমার অনেক মিল আছে, বুঝলে দোস্ত। যেমন ধরো, এখানকার যুদ্ধটা তোমার পছন্দ হচ্ছে না, এ আমি বেশ বুঝতে পারি, ঠিক কিনা?'

রানা চুপ করে থাকল।

'তুমি খুব ভাল মানুষ, আমারই মত, তাই ভয়-ডর একটু বেশি। আসলে কামানের কাজে জয়েন করে ভুল করেছ, তাই না? পদাতিকই আমাদের জন্যে সবদিক থেকে ভাল ছিল, কি বলো?'

রানাকে ভাল করে লক্ষ করল কাফা। তারপর কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে বলল আবার, 'কি, চুপ করে আছো কেন? আমার কাছে লজ্জা কি! ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে টুপটুপ করে বোমা ফেলে যাবে—ভয় পাবে না তো কি! তোমার দোষ আর যেই দিক, আমি দিতে পারি না।' হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার চোখমুখ। 'উপকারের বদলে তোমাকে একটা যাদু দেখাতে চাই, দোস্ত। খুব ভাল হয়ে যাবে মনটা। মনে মনে তিন পর্যন্ত গুণে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাও, মনের মানুষকে অবশ্যই দেখতে পাবে!' বলে হো হো করে হেসে উঠল সে।

নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল রানা ইফফাতকে রাস্তা ধরে গানপিটের দিকে এগিয়ে আসতে দেখে।

'হুঁহ্!' সাইয়িদ হাকাম তাচ্ছিল্যের সাথে একটা শব্দ করল।

থমকে দাঁড়াল রানা। তারপর ধীরে ধীরে ফিরে তাকাল। ঘাড় শক্ত করে অন্য দিকে চেয়ে বসে আছে হাকাম। ওর দিকে তাকাবার সাহস তার নেই, বোঝা যায় পরিষ্কার। ধীরে ধীরে গানপিট থেকে বেরিয়ে রাস্তায় গিয়ে উঠল রানা।

'আনতে পারিনি, আসলে আনা সম্ভব নয়,' মুখোমুখি হতেই বলল ইফফাত। 'তবে দেখে এসেছি! সত্তর মাইলের মধ্যে দুটো মরুদ্যান আছে ওই নামের। আর একটা আছে বৈরুত ছাড়িয়ে।'

'সবচেয়ে কাছেরটা কতদূর?'

'নাবাতিয়া থেকে পঁচিশ মাইল, একটা উপত্যকার উপর। রানা, ওখানে তুমি যেতে পারবে না। অসম্ভব দুর্গম একটা উপত্যকা। গভীর জঙ্গল সেটা, মানুষ বাস করে না। যারা যায় পাহাড়ী নেকড়েগুলো তাদেরকে আর ফিরতে দেয় না।'

'কিভাবে যেতে হবে জানতে পেরেছ কিছু?'

'নাবাতিয়া থেকে রুবাদানা রোড ধরে দশ মাইল, তারপর ডানদিকে বাঁক নিয়ে পড়বে দাহরুল মরুভূমিতে। চিহ্ন দেয়া কোন পথ নেই। দক্ষিণ-পুব দিকে যেতে হবে।'

'ধন্যবাদ, ইফফাত। আর কিছু জানার দরকার নেই।'

'কখন যাচ্ছ তুমি?'

'আজ রাতে যখনই সুযোগ পাব,' বলল রানা। 'আমাদের ডিটাচমেন্ট একটার সময় আবার গানপিটে আসবে, তার আগেই চেষ্টা করব।'

'পারবে তো, রানা?'

'এসব কথা ভেবে কোন লাভ নেই, ইফফাত। যেতে আমাকে হবেই।'

চুপ করে রইল ইফফাত। আবছা অন্ধকারে ইফফাতের চোখ দুটো চিক চিক করে উঠতে দেখল রানা।

'তোমার যদি কিছু হয়...সকালের মধ্যে যদি না ফেরো, রানা, উইং কমান্ডারের সাথে কথা বলব আমি।'

'একটু বেলা পর্যন্ত অপেক্ষা কোরো।'

রানার হাতটা ধরে একটু চাপ দিল ইফফাত। 'গুডলাক!'

'তুমি সাবধানে থেকো,' বলল রানা।

ঘুরে দাঁড়াতে গিয়েও ঘুরল না ইফফাত। 'ভাল কথা, জামাল আরসালান তার গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেছে স্টেশন থেকে। তার ক্লাসের এক ছেলে বলল, আজ রাতে নাকি ফিরবে না।'

'তাই নাকি? দারুণ একটা খবর, সন্দেহ নেই।'

গানপিটে ফিরতেই ওকে লক্ষ করে নঈম যাকের বলল, 'তোমার আর কাফার ব্যাপারটা বোঝা মুশকিল। তোমাদের দু'জনকেই চিন্তিত আর অস্থির দেখাচ্ছে। ব্যাপার কি?'

'বাজে কথা বললে খুনোখুনি হয়ে যাবে বলে দিচ্ছি!' রাগে ফেটে পড়ল কাফা। গায়ে যেন তার আগুন ধরিয়ে দিয়েছে যাকের।

কাফাকে অমন খেপে উঠতে দেখে মুহূর্তের জন্যে রানার মনে হলো, কি যেন একটা তাৎপর্য আছে এই চিৎকারটার মধ্যে। কিন্তু মাথা ঘামাবার সময় পেল না ও। চূড়ান্ত আক্রমণের মুহূর্তটি ঝড়ের বেগে ছুটে আসছে...আতাসীকে বাঁচাতে হবে...আর মাত্র বারো ঘণ্টা পর...এইসব চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে ওর মাথায়। সময় নেই...সময় নেই...।

চার

নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বাধিয়ে দিয়েছে যেন ভারি নিঃশ্বাস পতনের আওয়াজগুলো। ঘুমাচ্ছে সবাই। আর কোন শব্দ নেই কোথাও।

একটু একটু করে চাদরটা মুখ থেকে সরিয়ে মাথা বের করল রানা। পিট পিট করে জ্বলছে ছাউনির মাঝখানে কেরোসিন ল্যাম্পটা। আবছা আলোয় ছাউনির ভিতরটা নিঃসাড়। বালিশ থেকে মাথা তুলে একে একে কাছ থেকে দূরের প্রতিটি বিছানার উপর এক সেকেন্ড করে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল ও। নড়ছে না কেউ। নিঃশব্দে বিছানা থেকে পা দুটো ঝুলিয়ে দিল নিচে। ছ্যাঁত্ করে উঠল বুক নরম মত কিসের

উপর পা পড়তে। সাবধান হবার আগেই বেশ চাপ পড়ে গেল জিনিসটার উপর। তীব্র গলায় চেঁচিয়ে উঠল জানোয়ারটা, ম্যাঁও···ম্যাঁও···।

এত ধৈর্য আর সাবধানতা সব বুঝি ভেস্তে গেল। এমন আচরণ করবে জানলে পা-টা তুলে না নিয়ে চাপ দিয়ে ঘাড়টা মটকে দিলেই হত, ভাবল রানা। এই আওয়াজে কারও ঘুম ভেঙে গেল কিনা বোঝা যাচ্ছে না। ছাউনির পুব কোণে ছুটে গিয়ে দুঃখের গান গাইছে বিড়ালটা। দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে যওয়া এখন চূড়ান্ত বোকামি হবে। বিশ গজ এগিয়ে ঘাড় ফেরালেই দেখতে পাবে পিছনে একটা লম্বা মিছিল।

দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে একটা সিগারেট ধরাল রানা। জ্বলন্ত কাঠিটা উঁচু করে ধরে সকলকে দেখে নিতে চাইল আর একবার তীক্ষ্ণ চোখে। কারও তরফ থেকে প্রশ্ন এল না। কাউকে একচুল নড়তেও দেখল না। নিঃশ্বাস পতনের ফোঁস ফোঁস আওয়াজগুলো আগের মতই পরস্পরের সাথে পাল্লা দিচ্ছে। চুক চুক করে পানি খাওয়ার শব্দ পেল রানা। হঠাৎ বিড়ালটার চুপ করে যাবার কারণ বুঝতে পারল ও। নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল এবার। হাত বাড়িয়ে দেয়ালের র‍্যাক থেকে ব্যাটল ব্লাউজটা নামিয়ে পরে নিল দ্রুত। শুধু এটাই খুলে রেখেছিল গানপিট থেকে ফিরে শোবার সময়। মেঝেতে বসল রানা। ক্যানভাসের জুতো জোড়া পরল। আবার দাঁড়াবার আগে জুতোর তলায় ফেলে চাপ দিয়ে নেভাল সিগারেট।

দাঁড়াল রানা। বিছানার উপর জ্যাকেট আর লেদার ব্যাগটা লম্বা করে রেখে চাদর দিয়ে ঢেকে দিল নিখুঁতভাবে। ও বেরিয়ে যাবার পর কেউ যদি বিছানার দিকে তাকায়, মনে করবে শুয়েই আছে।

পিছনের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা। খিলটা খুলতে গিয়েও হাত দুটো নামিয়ে পিছন ফিরে তাকাল। আধো অন্ধকারে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না কিছু, কিন্তু কেউ বিছানার উপর উঠে বসলে দেখতে পাওয়া যাবে তাকে। হঠাৎ মাত্র দু'হাত দূরে গাঢ় এক টুকরো অন্ধকার নড়ে উঠতে দাঁতে দাঁত ঘষল সে।

দরজা খুলে আরেকবার পিছন ফিরল রানা। সেই একই জায়গায় স্থির হয়ে আছে গাঢ় অন্ধকারটা। বাইরে বেরিয়ে দ্রুত হাতে দরজাটা ভিড়িয়ে দিল ও। ভিতর থেকে প্রতিবাদ জানাল জানোয়ারটা। মিঁউ।

ভিতর থেকে আর কোন আওয়াজ আসছে না। দক্ষিণ দিকে তাকাল রানা। তারা জ্বলা আকাশের গাঁয়ে আঁকা ছবির মত খাড়া হয়ে আছে কামানের মাজলটা। এত দূর থেকেও স্টীল হেলমেটটা দেখতে পেল রানা। গানপিটে পায়চারি করছে গার্ড।

আরও মিনিট খানেক অপেক্ষা করল রানা। বিড়ালটার আর কোন সাড়া নেই ভিতরে। অন্ধকার চোখে সয়ে এসেছে ইতিমধ্যে। কয়েক হাত সামনের জিনিসের কালো কাঠামো এখন অনুমান করতে পারছে ও। ঢালু জমিটা বেয়ে নামল, তারপর ডানদিকে ঘুরে এক পা এক পা করে এগোল সে উত্তর দিকে। ঝোপঝাড়গুলোকে

এড়িয়ে যাচ্ছে রানা। নিচের বেড়ার কাছে গার্ড থাকলে আওয়াজ শুনে সতর্ক হয়ে যাবে সে। চল্লিশ গজের মত এগিয়ে থামল। ছাউনিটা উঁচু গাছপালার আড়ালে পড়ে গেছে। কেউ অনুসরণ করে আসছে না। অন্তত, কোন লক্ষণ চোখে পড়েনি এখনও ওর। কিন্তু সাইয়িদ হাকাম কি এতই কাঁচা? খুঁতখুঁতে ভাবটা দূর করতে পারছে না ও মন থেকে।

থেমে আধমিনিট অপেক্ষা করল রানা। ফেলে আসা পথটার দিকে চেয়ে আছে। জমাট অন্ধকারে কিছুই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। আবার নামতে শুরু করল। শুকিয়ে পাঁপড়ভাজা হয়ে আছে ঝোপের পাতাগুলো। এগোতে গিয়ে প্রতি পদক্ষেপে দাঁড়িয়ে পড়তে হচ্ছে ওকে। কাঁটাগাছ এড়িয়ে যাবার জন্যে কয়েকবার পিছিয়ে আসতে হলো। কতটা নেমেছে আন্দাজ হারিয়ে ফেলল একসময়। হঠাৎ, অপ্রত্যাশিত ভাবে পাঁচ গজ সামনে কাঁটাতারের উঁচু বেড়াটা দেখতে পেল ও। আকাশের গায়ে স্পষ্ট ফুটে আছে বেড়ার উপর দিকটা। সন্তর্পণে আরও দু'গজ এগিয়ে থামল রানা। গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে বেড়ার ওদিকটা। গাছপালায় ঢাকা। পাহাড়ের ঢালু গা নেমে গেছে ক্রমশ নিচের দিকে। বেড়ার দিকে এগোল না রানা। বসে পড়ল নিঃশব্দে। গার্ডের চলাফেরা সম্পর্কে একটা ধারণা পেতে চায় ও।

শেষ পর্যন্ত পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। বেড়া ঘেঁষে ধীর পায়ে এগোচ্ছে সে। প্রতি পদক্ষেপে বেয়োনেটের সঙ্গে রাইফেল সকেটের ঠোকাঠুকি লাগছে, ধাতব শব্দ পাচ্ছে রানা। একেবারে কাছে এসে পড়ল পায়ের আওয়াজ। আপনা থেকেই দম বন্ধ হয়ে গেল রানার। দুই কি আড়াই গজ সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। মাথা তুলে উঁকি দিলেই দেখা যাবে। কিন্তু ঝুঁকিটা নিল না রানা। পায়ের শব্দ দূরে মিলিয়ে যাবার পর দাঁড়াতে গেল ও, ঠিক তখন শব্দটা এল।

ঝট্ করে পিছন দিকে তাকাল রানা। কাছাকাছি কোথাও থেকে নয়, শব্দটা এসেছে ছাউনির দিক থেকে। মনে হলো, দরজার দুটো কবাট পরস্পরের সাথে বাড়ি খেল যেন। হাওয়ায়?

ধীরে ধীরে দাঁড়াল রানা। ঘাড় ফেরাতেই দেখল ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠে যাওয়া পাহাড়ের শেষ মাথাটা যেখানে আকাশের গায়ে ঠেকেছে তার পিছনে চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল একটা খসে পড়া তারা। কেউ নেই কোথাও। আর কোন শব্দও ভেসে আসছে না।

সাবধানে সামনে এগোল রানা। ছ্যাঁত্ করে উঠল বুকটা ওয়াঁ ওয়াঁ করে সাইরেন বেজে উঠতে। মুহূর্তের জন্যে ইতস্তত করল ও। সাইরেনের শব্দে আর সব শব্দ চাপা পড়ে যাবে, কথাটা মনে হতেই এক লাফে বেড়ার সামনের সরু পথটার উপর গিয়ে পড়ল।

গার্ডদের নিয়মিত টহলের ফলে ঢালু জমির ওপর সমতল পথটা তৈরি হয়েছে। কাঁটাতারের বেড়ার গা ঘেঁষে সোজা চলে গেছে দু'দিকে। দ্রুত এদিক ওদিক দেখে

নিল রানা। গার্ডের কোন চিহ্ন নেই। তার কাটার প্ল্যায়ার্সটা পকেট থেকে বের করল ও। আর একবার দেখে নিল দুটো দিক। ষাট গজ দূরের সেন্ট্রিবক্সে গিয়ে আবার ফিরে আসবে গার্ড। এতক্ষণ হয়ত ফিরে আসতে শুরু করেছে সে। প্ল্যায়ার্স ধরা হাতটা বেড়ার দিকে বাড়াতে গিয়ে চমকে উঠল ও। সাইরেনের শব্দ থামতেই ধুপ করে কি যেন পড়ল পিছন দিকে। লাফ দিয়ে পিছিয়ে এসে ঝোপের ভিতর বসে পড়ল রানা। ধক ধক করছে বুকের ভিতরটা। কেউ অনুসরণ করে আসছে, সন্দেহ নেই। শব্দটা পরিষ্কার শুনেছে ও। পা ফসকে পড়ে গেছে কেউ ট্রেঞ্চের ভিতর।

গার্ড? না, তা হতে পারে না। কোথায় ট্রেঞ্চ আছে তা না জানার কথা নয় তার। কেউ অনুসরণ করে আসছে ওকে।

দূর থেকে লাউডস্পীকারের যান্ত্রিক আওয়াজ ভেসে এল। ঘোষণাটা পরিষ্কার শুনতে পেল রানা। 'অ্যাটেনশন, প্লীজ! অ্যাটেনশন, প্লীজ! প্রিলিমিনারি এয়ার-রেইড ওয়ার্নিং…।' পরমুহূর্তে ছুটন্ত পদশব্দ শুনল রানা। দ্রুত এগিয়ে আসছে ওর দিকেই।

ধরা পড়ার সব রকম লক্ষণ দেখতে পেয়ে মরিয়া হয়ে উঠল রানা। ধরা দেয়া চলবে না। প্রয়োজন হলে মওকা মত ঝাঁপিয়ে পড়ে কেড়ে নিতে হবে গার্ডের কাছ থেকে রাইফেলটা।

খানিক আগে যেদিকে গেছে গার্ড সেদিক থেকেই আসছে ছুটন্ত পায়ের শব্দ। আছাড় খেয়ে পড়ার পর আর কোন শব্দ নেই পিছনে। পিছনের লোকটা সাইয়িদ হাকাম বা নঈম যাকের, ধরে নিল ও।

হঠাৎ দমে গেল মনটা। গার্ড একা নয়, সাথে আরও একজন কেউ আছে। পরিষ্কার দুটো পায়ের শব্দ পাচ্ছে ও।

ঝোপ সরিয়ে সরু পথটার দিকে উঁকি দিল রানা। অন্ধকারে সাইয়িদ হাকামের কাঠামোটা স্পষ্ট চিনতে পারল ও। গার্ডের সাথে ছুটে আসছে। নিচু গলায় কথা বলছে দু'জন।

'গিয়ে দেখো, গানার এতক্ষণে গানপিটে পজিশন নিয়েছে।'

'কিন্তু পালাবার চেষ্টা সে করবেই,' সাইয়িদ হাকামের কণ্ঠস্বর। রানার আড়াই হাত সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে ওরা। 'আজ হোক বা কাল। আগামীকালও যেন ইলেকট্রিফায়েড থাকে বেড়া।'

ওকে খুন করার ষড়যন্ত্র…চমকে উঠল রানা। ও পালাতে চেষ্টা করবে সন্দেহ করে সেন্ট্রিদের করপোরালের যোগ সাজশে কাঁটাতারের বেড়ায় বিদ্যুৎ দিয়ে রেখেছে, সাইয়িদ হাকাম।

ভাগ্যের জোরে বেঁচে গেছে প্রাণটা। পিছনে শব্দটা যেই করে থাকুক, লোকটার প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করল রানা। করপোরাল লোকটা আশ্চর্য চতুর, স্বীকার না করে পারল না ও। ঘণ্টা কয়েক আগে গল্প করেছে ও তার সাথে। প্রহরা সম্পর্কে সব কথা গড় গড় করে বলে ফেলেছে, কিন্তু তারগুলোকে ইলেকট্রিফায়েড করার ব্যবস্থা আছে

একথা ওকে জানতেই দেয়নি।

পিছন থেকে আর কোন শব্দ নেই। ছাউনিতে নিশ্চয়ই ওর খোঁজ পড়ে গেছে ইতিমধ্যে, ভাবল রানা। যা করার এখুনি করতে হবে। এখনও ফিরে যাবার সময় আছে ওর। যে কোন একটা যুক্তি দেখিয়ে দেরির কারণটা ব্যাখ্যা করা কঠিন নয়।

কিন্তু ফিরে যেতে রাজি নয় ও।

বেড়াটা টপকাবার এটাই শেষ সুযোগ। কিন্তু কিভাবে তা সম্ভব? বেড়া ঘেঁষে উঁচু কোন গাছ আছে কিনা দেখতে হবে। পা বাড়াতে যাবে রানা, খসখস করে কি যেন নড়ে উঠল ওর ডান দিকের কোণে।

বিস্ময়ে পাথর হয়ে গেল রানা। মাত্র সাত-আট হাত দূরে ঝোপের উপর জেগে রয়েছে মানুষের একটা মাথা। কুঁজো হয়ে বেড়ার দিকে এগোচ্ছে লোকটা। মাথায় সাদা একটা কাপড় বা পাগড়ির মত জড়ানো, ঠিক বুঝতে পারল না ও। বেড়ার সামনে গিয়ে দাঁড়াল লোকটা। সাবধান করে দেয়ার জন্যে মুখ খুলল রানা, পরমুহূর্তে লোকটাকে নঈম যাকের মনে হতে সামলে নিল নিজেকে। নড়তে গিয়ে অনুভব করল, গাছের কাঁটায় আটকে গেছে ট্রাউজারটা।

চারদিক নিস্তব্ধ। কট্ করে তার কাটার শব্দ হলো।

বেড়ায় বিদ্যুৎ চলছে, লোকটা জানে। বিড় বিড় করে উঠল সে। কাকে যেন অভিশাপ দিচ্ছে। দাঁতে দাঁতে বাড়ি খাবার শব্দও পেল রানা। ব্যাপার কি? লোকটা ওকে অনুসরণ করছে তা মনে করার কোন কারণ পেল না রানা। অনুসরণ করলে এতরকম শব্দ করতেই পারে না সে।

কটকট করে শব্দ হলো পনেরো সেকেন্ডের ব্যবধানে আরও দু'বার। 'শালা বানচোত!' পরিষ্কার শুনতে পেল রানা লোকটার কাঁপা গলা। কাঁপা বলেই ঠিক চিনতে পারল না।

আশপাশে কেউ আছে তা বুঝতেই পারেনি লোকটা। একবারও এদিক ওদিক তাকায়নি সে। অন্ধকারে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে না রানা, কিন্তু একটা মানুষ চলবার মত ফাঁক সে করে ফেলেছে তার কেটে। স্পষ্ট দেখল, মাথা নিচু করে তারের ওপারে নিয়ে যাচ্ছে শরীরটা। ডান পা-টা ফাঁকের ভিতর দিয়ে চালিয়ে ওপারের মাটিতে রাখল প্রথমে। মাথা, কোমর, আর পিঠ সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ লোকটা স্থির পাথর হয়ে গেল সেই অবস্থায়। ধড়াস করে উঠল রানার বুক। বিদ্যুৎ! সন্দেহ নেই। উপর আর নিচের ইলেকট্রিফায়েড তারের মাঝখানে আটকে আছে শরীরটা।

পরমুহূর্তে ছোট্ট একটা লাফ দিয়ে লোকটাকে বেড়ার ওপারে চলে যেতে দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল রানা। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে তাকে ও। ধুলো ঝেড়ে ফেলার ভঙ্গিতে দু'হাত ঘষছে। দাঁড়িয়ে আছে রানার দিকে মুখ করে। আরও চমক অপেক্ষা করছিল ওর জন্যে। মৃদু কণ্ঠে লোকটা আবার ফিসফিস করে উঠল, 'আর লুকিয়ে থাকতে হবে না। তাড়াতাড়ি ফাঁকটা গলে এপারে চলে এসো, দোস্ত!'

পাঁচ সেকেন্ড নড়তে পারল না রানা। তারপরই দুই লাফে বেড়ার ফাঁকটার

সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দ্রুত দেখে নিল ফাঁকের দৈর্ঘ্য আর প্রস্থ।

ফাঁক গলে ওপারে পৌঁছে কাফাকে দেখতে পেল না রানা। তার পায়ের শব্দ দ্রুত নেমে যাচ্ছে নিচের দিকে। ঝোপঝাড় দুলছে দেখে তাকে অনুসরণ করল রানা।

বিশ গজ নিচে নেমে কাফাকে দেখল রানা। দিশেহারার মত এঁকেবেঁকে নামছে সে ঢালু জমি বেয়ে।

'দাঁড়াও!' চাপা কণ্ঠে ডাকল রানা।

দাঁড়াল কাফা। কিন্তু পিছন দিকে তাকাল না। ঝুপ করে বসে পড়ল, অদৃশ্য হয়ে গেল একটা ঝোপের আড়ালে। 'কেন?' কণ্ঠস্বরে আতঙ্ক অনুভব করে হাসি পেল রানার।

ঝোপটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল ও। হাত বাড়িয়ে হাতড়াতে শুরু করল ও। তারপর কান ধরে টান দিয়ে দাঁড় করাল কাফাকে। 'ব্যাপার কি?' গম্ভীর হয়ে জানতে চাইল রানা।

'উঃ উঃ—মরে গেলাম!'

কানটা ছেড়ে দিল রানা। 'এসব কি হচ্ছে, কাফা?'

'মহড়া দিচ্ছি, তোমার মত। কখনও যদি বন্দী হই শালাদের হাতে, কাজে লাগবে। যাই বলো, দোস্ত, তুমি যে এতটা ভীতু তা কিন্তু জানতাম না।'

'তার মানে পালাচ্ছ তুমি?'

'কে বলল পালাচ্ছি?' গলা চড়ে গেল কাফার। 'পালাব কেন, শুনি? আমি বদলি হচ্ছি। পদাতিকে যোগ দেয়ার শখ আমার অনেক দিনের, সবাই জানে। বেয়োনেট হাতে সামনাসামনি যুদ্ধ করতে চাই আমি।'

'কিন্তু ধরা পড়লে কি শাস্তি হবে জানো?'

'জানি। একই শাস্তি তোমারও হবে, দোস্ত। একই যাত্রার পরিণতি দু'রকম হতে পারে না। কিন্তু, ওসব কথা থাক, কারণ, ধরা আমি পড়ছি না।'

'বোকার মত কথা বলছ তুমি। ধরা তোমাকে পড়তেই হবে। যেখানেই লুকাও, ওরা তোমাকে খুঁজে ঠিকই বের করবে। কাফা?'

সাড়া না দিয়ে চুপ করে রইল কাফা। তারপর গম্ভীরভাবে বলল, 'কি?'

'এখনও সময় আছে তোমার ফিরে যাবার। আমার কথা শোনো···।'

'তুমি এতবড় স্বার্থপর এ আমার জানা ছিল না, দোস্ত! আর একটু হলে জানটা খোয়াতে, বেঁচে গেলে শুধু আমি এসে পড়ায়—সেজন্যে একটু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ থাকুক, ভাগাবার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে। এ অন্যায়।' অভিমানে রুদ্ধকণ্ঠ কাফা।

'তুমি জানলে কিভাবে বেড়ায় বিদ্যুৎ আছে?'

সব ভুলে গিয়ে চাপা স্বরে খিক খিক করে হাসতে শুরু করল কাফা। 'গোসলখানার দরজা বন্ধ করে দিয়ে ওরা দু'জন যা করেছে সে কি বলব তোমাকে···তওবা! তওবা! তওবা! এমন নোংরামি বাপের কালে শুনিনি! ছেলেতে মেয়েতেই প্রেম হয় শুনেছি···।'

কাদের কথা বলছ তুমি?'

'সাইয়িদ হাকাম আর নঈম যাকের। ওরা দু'জন গোসলখানার দরজা বন্ধ করে...আমি যে ভিতরের ল্যাট্রিনে আগে থেকেই বসে আছি তা তো আর জানে না ওরা।'

'বুঝেছি। কিন্তু আমার প্রশ্ন ছিল...।'

'ওই কুকর্ম করার সময় ওরা কথা বলছিল। সাইয়িদ হাকাম বলল, "করপোরালের বিশ্বাস রানা আজ রাতেই পালাবে।" যাকের বলল, "তারে কারেন্ট চালাবে তো আজ?" হাকাম হাঁপাচ্ছিল। বলল, 'তা কি আর বলার অপেক্ষা রাখে!'

'হুঁ। আর কি কথা হলো ওদের মধ্যে?'

হাত জোড় করল কাফা। 'মাফ চাই, দোস্ত! সে-সব কুৎসিত প্রেমের কথা আমি উচ্চারণ করতে পারব না।'

'ঠিক আছে,' বলল রানা। 'তুমি সত্যি অনেক উপকার করেছ আমার, সেজন্যে তোমার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। এখন, কাফা, তোমাকে ছাউনিতে ফিরে যেতে হবে।'

'কেন?' ফোঁস করে উঠল কাফা। 'কেন ফিরে যেতে বলছ তুমি আমাকে? আমার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকার তোমার নেই।' হঠাৎ তীক্ষ্ণ হলো তার কণ্ঠস্বর। 'তোমার ব্যাপারটা কি, জানাবে দয়া করে?'

'আমি পালাচ্ছি না, কাফা।'

'আমারও তাই বিশ্বাস,' সবজান্তার মত মাথা নেড়ে বলল কাফা। 'আমার ধারণা, তুমি অবসর গ্রহণ করছ। আমি বদলি হচ্ছি, তুমি অবসর গ্রহণ করছ। উদ্দেশ্য দু'জনের দু'রকম হলেও, পথ আমাদের একটাই। দু'জনেই দৌড়চ্ছি। এসো, আবার শুরু করি। তা নাহলে ধরা পড়ে যাব, দোস্ত!' চঞ্চল ভাবে ঘাড় ফিরিয়ে তারের ওপারে তাকাল সে। তারপর হঠাৎ লাফ দিয়ে তীরবেগে নিচের দিকে নামতে শুরু করে দিল। অগত্যা নামতে শুরু করল রানাও। মূল্যবান দুটো মিনিট পেরিয়ে গেছে এর মধ্যে। ওদের দু'জনকে দেখতে না পেয়ে গওহর জুমলাত কি পদক্ষেপ নেবে অনুমান করার চেষ্টা করল ও। যাতে রোড ব্লক করার ব্যবস্থা করা হয়, তার জন্যে চেষ্টার কোন ত্রুটি করবে না হাকাম।

রাস্তার কাছাকাছি গিয়ে কাফাকে থামাল রানা। 'রাস্তার ডানদিকে একটা গ্যারেজ আছে। ওখান থেকে গাড়ি নিতে হবে একটা।'

কিন্তু ভাগ্য ভাল ওদের, রাস্তায় উঠতেই একটা গাড়ি ছুটে আসার শব্দ পেল ওরা। স্টেশনের গাড়ি হওয়াও বিচিত্র নয়, কিন্তু ঝুঁকিটা না নিয়ে উপায় দেখল না রানা। গ্যারেজে গাড়ি পাওয়া যাবে তার কোন নিশ্চয়তাও নেই। 'গাড়িটা থামলেই পিছনের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াবে তুমি।'

গাড়িটা বাঁক নিতেই হেডলাইটের উজ্জ্বল আলো পড়ল ওদের গায়ে। তিন পা এগিয়ে রাস্তার মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল রানা, হাত তুলে থামতে নির্দেশ দিল

ড্রাইভারকে।

তীক্ষ্ণ শব্দে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল বেডফোর্ড ট্রাকটা। সামনে থেকে পাশে চলে এল রানা। লম্বা একটা মুখ জানালা দিয়ে মাথা বের করে জানতে চাইল, 'ব্যাপার কি, স্যার?'

'কথা নয়, তাড়াতাড়ি নিচে নামো। নষ্ট করার মত সময় নেই আমাদের। অন্ধ নাকি, চেকপোস্ট চিনতে পারো না?' ধমকের সুরে বলল রানা।

'ঠিক আছে, স্যার। নামছি, স্যার। আগে কখনও এখানে চেকপোস্ট দেখিনি কিনা। কিছু নিশ্চয়ই ঘটেছে...।' বলতে বলতে দরজা খুলে রাস্তায় নামল ড্রাইভার।

দু'কোমরে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে রানা। গম্ভীর ভাবে কাফাকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'পিছনটা সার্চ করো, লেফটেন্যান্ট।' ড্রাইভারের দিকে ফিরল ও। 'লাইসেন্স আছে?'

'আছে, স্যার,' পকেট থেকে লাইসেন্সটা বের করে রানার হাতে দিল লোকটা। একবার চোখ বুলিয়ে ছুঁড়ে সেটা দূরে ফেলে দিল রানা। 'সবগুলোই একরকম দেখতে—কিভাবে বুঝব ফালাঞ্জিস্টদের হয়ে গোলাবারুদ বয়ে নিয়ে যাচ্ছ কিনা? দাঁড়াও এখানে, একচুল নড়লে ফুটো করে দেব মাথা। আমি নিজে সার্চ করব সামনেটা।'

বোকার মত দাঁড়িয়ে রইল ড্রাইভার।

ট্রাকে চড়ল রানা। ড্রাইভিং সীটে বসে মাথা নিচু করে খোঁজাখুঁজির ভঙ্গি করল তিন সেকেন্ড। ফুট কন্ট্রোল আর গিয়ারটা দেখে নিল এই ফাঁকে। মাথা তুলতে দেখল ড্রাইভার রাস্তার উপর পড়ে থাকা লাইসেন্সটার দিকে হাঁটছে।

গিয়ার দিয়ে ট্রাক ছেড়ে দিল রানা। ড্রাইভার চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল আধপাক। পাশ ঘেঁষে যাবার সময় তাকে শূন্যে ঘুসি ছুঁড়তে দেখে হাসি পেল রানার। ডান দিকের দরজায় নখ আঁচড়াবার শব্দ পেয়ে সেটা খুলে দিল ও। পাশের সীটে এসে বসল কাফা। 'একটা অ্যাডভেঞ্চারের মধ্যে আছি, কি বলো, দোস্ত?'

কথা না বলে রিয়ার ভিউ মিররে চোখ রেখে পিছন দিকে তাকাল রানা। কালো অন্ধকারে ঢাকা পড়ে আছে রাস্তাটা। আলোর চিহ্ন নেই কোথাও।

স্পীডমিটারের দিকে তাকিয়ে কাফা ঢোক গিলল। 'দোস্ত, দক্ষিণে যাচ্ছি, না উত্তরে? ঠিক পাচ্ছি না কেন?'

রিস্টওয়াচ দেখল রানা। সাড়ে বারোটা। এতক্ষণে রিপোর্ট চলে গেছে হেডকোয়ার্টারে, ভাবল ও। দু' দু'জন গানার পলাতক, খুব হালকা ভাবে নেবে না ব্যাপারটাকে উইং কমান্ডার তারেক হামেদী।

'দোস্ত,' কাফার গলায় সন্দেহ আর আতঙ্ক, 'সত্যি সত্যি কোথায় যাচ্ছি আমরা বলো তো? ইসরায়েলি বর্ডারের দিকে নয় তো?'

কি সন্দেহ করছে বুঝতে পেরে হাসিটা চেপে রাখল রানা।

'ওদের সকলের ধারণা, তুমি নাকি...' কথাটা শেষ না করে রানার মুখের দিকে

ঝুঁকে কি যেন দেখতে শুরু করল কাফা। 'দোস্ত, আর যাই করো, ইহুদীদের কাছে নিয়ে যেয়ো না আমাকে। বরং নামিয়ে দিয়ো কোথাও।'

ডান দিকে বাঁক নিল ট্রাক। রাস্তাটা খানিক দূর গিয়েই শেষ হয়েছে। তারপরই খাঁ খাঁ মরুভূমি। কোন আড়াল না থাকায় দিগন্তরেখা পর্যন্ত পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তারা জ্বলা আকাশ। 'তোমাকে নামতে হবে, কাফা। এখানেই আমরা পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নেবো।'

'তার মানে, দোস্ত? এ আবার তোমার নতুন কোন খেলা?'

'সময় নষ্ট করো না, কাফা। এখান থেকে যেদিকে ইচ্ছা দৌড়ে পালাও। মনে রেখো, তোমার খোঁজে লোক বেরিয়ে পড়েছে ইতিমধ্যে। দেরি করলে ধরা পড়ে পচতে হবে জেলখানায়। নাও, নামো।'

'আর তুমি? লুকাবার জায়গা আছে তোমার, কিন্তু সেখানে আমাকে নিয়ে যেতে চাও না, এই তো?'

'না, তা নয়। লুকাবার কোন জায়গা নেই আমার।' বলল রানা, 'আসলে পালাচ্ছি না আমি। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে স্টেশনে ফিরে যাচ্ছি আবার।'

'জেল তাহলে তোমাকেই খাটতে হবে, আমাকে নয়। কিন্তু রহস্যটা কি, দোস্ত? ফিরেই যদি যাবে, বেরুলে কেন?'

সংক্ষেপে সবটা ব্যাপার বলল রানা কাফাকে। সবশেষে বলল, 'লেবাননের ফাইটার স্টেশনগুলো রাতারাতি অচল করে দেবে তারা। আমি একা চেষ্টা করছি ওদেরকে ব্যর্থ করতে। আল মাকারদানা নামে একটা মরূদ্যানে যাচ্ছি এখন, সম্ভবত ওটাই ওদের হেডকোয়ার্টার।'

কপালে উঠে গেল কাফার চোখ জোড়া। 'ঠাট্টা করছ?'

মাথা দোলাল রানা। 'না।'

'সত্যি? খোদার কসম?'

'সত্যি।'

চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল কাফার। 'কি বলে যে ধন্যবাদ দেব তোমাকে, দোস্ত, ভেবে পাচ্ছি না। এ ধরনের রোমাঞ্চকর ঘটনা গল্পের বইতেই ঘটে বলে শুনেছি। কে জানত আমি নিজেই জড়িয়ে পড়ব! ওদের কাছে অস্ত্র আছে নিশ্চয়ই?'

'তুমি জড়িয়ে পড়োনি, কাফা। তোমাকে আমি সঙ্গে নিচ্ছি না।'

'বললেই হলো! সত্যিকার যুদ্ধ হবে যেখানে, সেখানে আমি যাব না তো যাবে কে? তোমার সাধ্য কি আমাকে ট্রাক থেকে নামাও। এই গ্যাঁট হয়ে বসলাম, নামাও দেখি কত জোর রাখো গায়ে!' শক্ত হয়ে বসল কাফা তার সীটে।

'ব্যাপাটা বোঝার চেষ্টা করো, গর্দভচন্দ্র!' বলল রানা। 'আমি যেখানে যাচ্ছি সেখান থেকে বেঁচে ফেরার আশা খুব একটা নেই। তাছাড়া, গিয়ে হয়ত দেখব কেউ কোথাও নেই—সবটাই আমার ভুল অনুমান।'

'তোমার যা হবে আমারও তাই হবে। মোট কথা, হাতাহাতি লড়াই করার

জন্যে বেরিয়ে এসেছি, ফিরে যাচ্ছি না আর আমি। চলো, দোস্ত, শত্রুরা কোথায় আছে নিয়ে চলো সেখানে আমাকে।'

ট্রাক ছেড়ে দিল রানা। 'পরে কিন্তু দোষ দিয়ো না আমাকে।'

'কি রকম সাহায্যে লাগি দেখে তাজ্জব বনে যাবে,' দোস্ত! ভাল কথা, আমাকে শুধু একটা বেয়োনেট যোগাড় করে নেয়ার সময় দিয়ো, ব্যস, আর কিছু চাই না!'

'তোমার বাড়ির ঠিকানাটা বলো আমাকে,' ব্যঙ্গ করল রানা। 'তোমার ইন্তেকালের পর চিঠি লিখে জানাব কি রকম বীরত্বের সাথে পালাতে গিয়ে মারা পড়েছ।'

'আমাকে তুমি চেনোনি, দোস্ত!' অদ্ভুত শান্ত লাগল রানার কানে কথাটা।

বাকি পনেরো মাইল রাস্তা নিঃশব্দে পাশে বসে রইল কাফা। পাহাড়টা দূর থেকে দেখতে পাওয়া গেল। আকাশের গায়ে দীর্ঘ কালো রঙের পোঁচ।

হেডলাইটের আলোয় অনেকগুলো চাকার দাগ দেখল রানা। সোজা চলে গেছে পাহাড়টার দিকে। কাছাকাছি পৌঁছে লক্ষ করল, দাগগুলো পাহাড়টার পাশ ঘেঁষে পিছন দিকে চলে গেছে।

দাগ ছেড়ে দিয়ে সোজা এগোল রানা ট্রাক নিয়ে। একটা গিরিপথের ভিতর ঢুকে দাঁড় করাল সেটাকে।

'এখান থেকে কোথায়?'

'ওপরে। রাস্তাটা খুঁজে বের করে নিতে হবে, যদি আদৌ কোন রাস্তা থাকে।'

নিচে নামল ওরা। কাফা বলল, 'সেক্ষেত্রে চাকার দাগ অনুসরণ করলেই তো হত।'

'হত,' বলল রানা। 'তাতে ওরা সাবধান হবার সুযোগ পেত।'

'ওঃ, বুঝেছি! আচমকা আক্রমণ করব আমরা। বাহ্, চমৎকার বুদ্ধি এঁটেছ, দোস্ত। কিন্তু তার আগে আমার জন্যে একটা বেয়োনেট যোগাড় করার কি হবে, ভেবেছ কিছু?'

'এখন থেকে জিজ্ঞেস না করলে আর একটাও যদি কথা বলো ঘাড় মটকে দেবো তোমার। এখন থেকে আমি লিডার।'

হাঁ করেও মুখ বন্ধ করে ফেলল কাফা নিঃশব্দে।

গিরিপথটা অস্বাভাবিক চওড়া। দুটো দিক ভাল করে দেখে নিল রানা। উপরে ওঠার কোন উপায় দেখল না। কাফা মুখ গোমড়া করে পাশে দাঁড়িয়ে আছে। মুচকি হাসল রানা। জানতে চাইল, 'গিরিপথটা পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে ওপারে বেরিয়ে গেছে কিনা অনুমান করে বলতে পারবে?'

'অনুমান করার কি দরকার,' উৎসাহিত হয়ে উঠল কাফা সাথে সাথে। 'এক ছুটে দেখে আসতে পারি তুমি হুকুম করলে।'

অবাক হয়ে চেয়ে রইল রানা। তারপর কাঁধ ঝাঁকাল ও আপন মনে। নিঃশব্দে পা বাড়াল সামনের দিকে।

গজ বিশেক এগোবার পর হঠাৎ থামল রানা। প্রথমে বিশ্বাসই হলো না ব্যাপারটা। এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল পাহাড়ের মুখোমুখি। সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। পাহাড়ের গা বেয়ে সুন্দর একটা পথ উঠে গেছে এঁকেবেঁকে উপর দিকে।

'আমি নিচে দাঁড়িয়ে থাকি, দোস্ত। তুমি উঠে গিয়ে দেখে এসো সংখ্যায় ওরা ক'জন। খুব বেশি হলে স্টেশনে ফিরে গিয়ে সবাইকে ডেকে নিয়ে আসা যাবে।'

'ফের প্রলাপ বকছো?'

'থুড়ি!' জিভ কাটল কাফা।

'তুমি আগে আগে ওঠো,' হুকুমের সুরে বলল রানা। 'কিছু যদি দেখতেও পাও, চেঁচামেচি করবে না।'

'বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছ আমাকে? কাজটা কি ভাল হচ্ছে?' বলল বটে, কিন্তু রানাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল তারপরই।

'ভয় পেয়ে পালাতে পারো, তাই এই ব্যবস্থা।'

জবাবে কিছুই বলল না কাফা। ওর পাশে চলে এল রানা। পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে শুরু করল ওরা।

নিঃশব্দে আধমাইলটাক এগোবার পর পাহাড়ের প্রায় পিছন দিকে চলে এল দু'জন। এই দীর্ঘ পথ পেরিয়ে মাত্র তিনশো ফুটের মত উপরে উঠেছে। পিছিয়ে গেছে কাফা। এমন হাঁপাচ্ছে, কথা বলার শক্তি নেই। সমতল একটা জায়গায় পথটা শেষ হয়েছে। তারপর পাহাড়ী ঝোপ-জঙ্গল, আরও দূরে পাঁচিলের মত দাঁড়িয়ে আছে কয়েক সারি গাছ। পথটার আর কোন চিহ্ন নেই সামনে।

ঝাড়া বিশ সেকেন্ড গাছগুলোর দিকে চেয়ে রইল রানা। পথটা এখানেই শেষ হয়েছে, তারমানে গাছগুলোর ওপারে মানুষজনের যাওয়া-আসা না থেকেই পারে না। সমতল জায়গায় উঠে দাঁড়াল রানা। সামনের ঝোপ-জঙ্গলের দিকে এগোল। সময়ের কথা মনে পড়ে যেতে হঠাৎ থেমে রিস্টওয়াচটা তুলল চোখের সামনে। সোয়া একটা বাজে। হাঁটার গতি আপনা থেকেই বেড়ে গেল ওর। আর মাত্র তিন ঘণ্টা বাকি চূড়ান্ত আক্রমণের।

ওকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গেছে কাফা। ঝোপের ভিতর দিয়ে হন হন করে হেঁটে যাচ্ছে। তাকে অনুসরণ করতে গিয়ে আশার আলো দেখতে পেল রানা। ঝোপের ভিতর দিয়ে পায়ে চলা পথ চলে গেছে গাছগুলোর দিকে। সে-পথ ধরেই এগোচ্ছে ওরা।

গাছগুলোর কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল কাফা। তারপর স্যাঁত করে পিছিয়ে এল রানার কাছে। 'ভূতুড়ে বাড়ি, দোস্ত! ওদের সাথে আমি লড়তে পারব না।'

কথা না বলে নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে গেল রানা। একটা গাছের নিচে গিয়ে দাঁড়াল। বাড়িটার পিছনে চাঁদ উঠেছে, কাঠামোটা পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তাই। কাফাকে দোষ দেয়া যায় না। কাঠের দোতলাটার জানালা দরজা সব বন্ধ। ছাদটা কাত হয়ে আছে একদিকে। অনেকদিনের পুরানো বাড়ি। গেটের মাথাটা

নেই, কবাট দুটোও ভাঙাচোরা। মানুষ থাকে বলে মনে হলো না রানার।

বিড়বিড় করছে শুনে পাশে তাকিয়ে রানা দেখল কাফা চোখ বুজে দোয়া-দরূদ পড়ছে আর ফুঁ দিচ্ছে নিজের বুকে।

'কোন শব্দ যেন না হয়।'

'আচ্ছা,' ঢোক গিলে বলল কাফা। 'তোমার সাথে আমার চুক্তি রইল, দোস্ত—যদি মানুষ আক্রমণ করে তোমাকে বাঁচাবার সব দায়-দায়িত্ব আমার, কিন্তু মানুষ ছাড়া অন্য কিছু...মানে, বুঝতেই পারছ ওদের নাম মুখে আনতে নেই, যদি ঘাড়ে চাপে তাহলে আমাকে বাঁচাবার দায়িত্ব তোমার।'

গাছগুলোর ভিতর দিয়ে এগোল রানা। কাফা ছায়ার মত সেঁটে আছে পিছনে। নুড়ি পাথরের মাঝখান দিয়ে ক্ষীণ একটা পথ। গেটের ভিতর দিয়ে বাড়িটার সামনের দরজার কাছে গিয়ে থেমেছে। উঠনটা বেশ বড়। পাথরের ছোটবড় টুকরো আর কাঁটাগাছে ভর্তি। দরজার দিকে এগোল না ওরা। গোটা বাড়িটাকে ঘিরে চক্কর দিল একবার। আলোর বা জনপ্রাণীর কোন চিহ্ন নেই কোথাও।

সামনের দরজাটার সামনে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করছে রানা। দমে গেছে মন। নির্জন, পরিত্যক্ত একটা বাড়ি, জামাল আরসালানের হেডকোয়ার্টার এটা হতেই পারে না। তার সাঙ্গপাঙ্গরা এই ভূতুড়ে বাড়িতে এসে তার সাথে দেখা করে, বিশ্বাস করা কঠিন। দাহরুল মরুভূমির এই পাহাড়ে লোকজন আসা-যাওয়া করলে সহজেই কারও না কারও চোখে পড়ে যাবারও ভয় আছে।

'দোস্ত, চলো ফিরে যাই,' কাফা ফিসফিস করে বলল পাশ থেকে। 'এখানে এমন কি লুকোতেও রাজি নই আমি।'

কথাটা কানে না তুলে তিন পা এগিয়ে দরজার হাতলটা ধরে টান দিল রানা। খুলল না। দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ।

কাফার দিকে তাকাল রানা। মাথা ঝাঁকিয়ে রানার সন্দেহটাকেই যেন সমর্থন করল সে।

দরজায় তালা নয়, খিল আঁটা রয়েছে ভিতর দিকে। কাফাকে একপাশে সরিয়ে দিয়ে হাতলটা ধরে হেঁচকা টান দিল রানা। মট্ করে আওয়াজের সাথে মাঝখান থেকে দু'ফাঁক হয়ে গেল কবাট দুটো।

চৌকাঠ টপকে গাঢ় অন্ধকারে প্রবেশ করল রানা। প্রাণহীন কাঠের দেয়ালের ভেতর কোথাও একটু শব্দ নেই। প্রথমে অন্তত তাই মনে হলো। বিড় বিড় করছে কাফা পাশ থেকে। কনুই চালিয়ে ওর পাঁজরে গুঁতো মারল রানা। কাফা চুপ করতেই অস্পষ্টভাবে শুনতে পেল রানা শব্দটা। টিক্-টিক্ টিক্-টিক।

দেয়াল ঘড়ি। বেশ দূর থেকে আসছে আওয়াজটা। তার মানে, মানুষ এখানে বাস করে, ভাবল রানা। কিন্তু পরক্ষণে মনে হলো, উৎসাহিত হবার মত কিছু নয় ব্যাপারটা। ঘড়ি আর মানুষ থাকলেও এই জায়গা জামাল আরসালানের গোপন আস্তানা হতে পারে না। কোন সন্দেহ নেই, ভুল জায়গায় এসে পড়েছে ওরা।

টর্চ বের করে আলো জ্বালল রানা। দেখল বড় একটা হলরুমের ভিতর দাঁড়িয়ে আছে ওরা। পুরানো আমলের ভাঙাচোরা আসবাবপত্রে কামরাটা ঠাসা। ধুলোর স্তর জমে উঠেছে চেয়ার-টেবিলের উপর। অনেকদিন যত্নের হাত পড়েনি বোঝা যায়।

বাঁ দিকের দরজাটা খুলল রানা। ছোট একটা কামরায় ঢুকল। আসবাপত্রগুলো একই রকম। এটাও অনেকদিন ধরে ব্যবহার করা হয়নি। জানালাগুলোর কবাট ভাঙা, কোনটার নেই-ই।

বড় কামরাটায় ফিরে এসে ডান দিকের দরজাটা খুলল রানা। প্রায়-খালি একটা কামরায় ঢুকল। এক কোণে সিঁড়ি দেখা যাচ্ছে। ছেঁড়া, সুতো ওঠা কার্পেট ধাপগুলোকে ঢাকার চেয়ে উন্মুক্তই করে রেখেছে বেশি। ঘড়িটা খালি একটা দেয়ালের মাঝখানে আটকানো। কাঁচে ধুলো জমেছে, দোদুল্যমান পেন্ডুলামটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। কাঁটা দুটো দেখা যাচ্ছে আবছাভাবে। রাত দেড়টা বাজে।

বড় কামরায় আবার ফিরে এল ওরা।

'এখন আমি ভাবছি, জায়গাটা ক'দিন লুকিয়ে থাকার জন্যে কিন্তু মন্দ নয়…।'

আর একটা দরজা খুলে দেখতে বাকি আছে। সেটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা। মনে পড়ে গেল আড়াই ঘণ্টা বাকি আছে ভোরের আলো ফুটতে। নৈরাশ্য আর হতাশায় মুষড়ে পড়ল ও। এখানে আর এক সেকেন্ডও সময় নষ্ট করা উচিত নয়, অনুভব করল। হাতল থেকে হাতটা ফিরিয়ে নিতে গিয়েও কি মনে করে টান দিল ও। ভেজানো দরজাটা খুলে গেল সাথে সাথে। টর্চের আলোয় দীর্ঘ একটা প্যাসেজ আলোকিত হয়ে উঠল। কিছু না ভেবেই প্যাসেজ ধরে এগোল রানা। কাফা পিছু পিছু আসছে কি আসছে না দেখার কোন প্রয়োজন বোধ করল না ও। এই ব্যর্থতা ওর নিজের ব্যর্থতা, ভাবছে ও। অকারণেই নিজেকে দায়ী বলে মনে হচ্ছে, শেষ পর্যন্ত ষড়যন্ত্রটা নস্যাৎ করা গেল না। জিতে যাচ্ছে জামাল আরসালান, মার্শিয়া হারাচ্ছে চিরকালের জন্যে আতাসীকে, লেবানন কব্জা করে নিচ্ছে ইসরায়েল।

হঠাৎ একটা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। বুঝতে না পেরে সময় মত না থামায় ওর ঘাড়ের উপর পড়ল কাফা। রানার ডানদিকে একটা চেয়ার দাঁড় করানো ছিল, কাফার পা লেগে পড়ে গেল সেটা। একটার উপর একটা পড়ে থালা বাসন ঝনঝন করে উঠল কাঠের মেঝেতে। টর্চের আলোয় ওরা দেখল বাসন পেয়ালা থেকে মেঝেতে ছিটকে পড়েছে ছেঁড়া রুটি, মধু, খেজুর আর খানিকটা দুধ।

পরস্পরের দিকে তাকাল ওরা। দু'জনেই কান পেতে কি যেন শোনার আশায় আছে। কিন্তু ওদের নিঃশ্বাসের শব্দ ছাড়া কোথাও আর কোন শব্দ নেই।

দরজা খুলে একটা কিচেনে ঢুকল রানা। স্টোভ আর কয়েকটা হাঁড়ি-পাতিল রয়েছে একধারে। অপর দিকে দরজা খুলে ছোট্ট একটা উঠান দেখল রানা। এক কোণে একটা গোয়ালঘর। পা ঠোকার আওয়াজ শুনে কাফা ফিসফিস করে বলল, 'দুম্বা!'

আর যাই হোক, ইসরায়েলি গুপ্তচরদের আস্তানা এটা হতে পারে না, ভাবতে ভাবতে কিচেনে ফিরে এল রানা। হঠাৎ পাথরের মত স্থির হয়ে গেল ও।

দরজার বাইরে প্যাসেজটা লালচে আলোয় আলোকিত হয়ে উঠেছে। পা টেনে টেনে কেউ এগিয়ে আসছে এদিকে।

'দোস্ত!' ফিসফিস করে বলল কাফা।

'চুপ!'

নড়ল না রানা। লালচে আলোটা কাঁপছে দেখে বুঝতে পারল, কুপি কিংবা হারিকেন হাতে নিয়ে এগিয়ে আসছে কেউ। ক'সেকেন্ড পর হাড়-সর্বস্ব একটা হাত দেখল ওরা। লোলচর্ম ঝুলছে। তারপর জরার প্রতিমূর্তি দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। বয়সের ভারে কুঁজো একটা বুড়ো। পাকা ভুরু, বুক পর্যন্ত লম্বা সাদা দাড়ি, মাথায় ক'গাছি চুল ল্যাম্পের আলোয় চকচক করছে। এক খণ্ড কাপড় আলখাল্লার মত জড়িয়ে রেখেছে বাঁকা শরীরটাকে। ওদেরকে দেখে একটু যেন তীক্ষ্ণ হলো চোখ দুটো। তারপর অসংখ্য বলিরেখায় বিভক্ত মুখে নির্মল হাসি ফুটে উঠল। বৃদ্ধ ধীর ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলল, 'আমাদের বীর যোদ্ধা, তাই না?' দাঁত নেই একটাও, শব্দগুলো কাঁপা শোনাল কানে।

সায় দিয়ে মাথা ঝাঁকাল রানা। 'আমরা দুঃখিত। ভেবেছিলাম বাড়িটা খালি। ছুটি পেয়ে তাড়াহুড়োর মধ্যে বাড়ি ফিরছি কিনা, পথে রাত হয়ে যেতে আশ্রয়ের জন্যে...'

ওকে থামিয়ে দিয়ে কাফা বলল, 'শুধু এক রাতের জন্যে আর কি! কাল সকালেই আমরা...।'

বৃদ্ধ হাত নেড়ে বাড়িটাকে ইঙ্গিত করল, 'আমার আর আছে কে, তোমাদেরই সম্পদ এটা। আশ্রয় দরকার, থাকবে বৈকি! কিন্তু, বাপজানেরা, তোমাদের আমি খেতে দিই কি বলো দিকি?'

ব্যস্ত হয়ে রানা বলল, 'না-না, খিদে টিদে নেই আমাদের। তাছাড়া রাতে ঠিক...মানে...,' আশ্রয় চেয়ে ভুল করে ফেলেছে বুঝতে পারল রানা, 'আপনি বুড়ো মানুষ, আপনাকে আমরা বিরক্ত করতে পারি না। ভেবেছিলাম বাড়িটা খালি। ঠিক আছে, আপনি বিশ্রাম নিন, আমরা চলে যাচ্ছি...।'

'চলে যাবে? এই রাতে?' দাঁতহীন মাড়ি বের করে হাসতে শুরু করল বৃদ্ধ। এরকম পবিত্র আর নির্মল হাসি কখনও দেখেছে বলে মনে পড়ল না রানার। 'আশ্চর্য হবার মত কিছু বলোনি অবশ্য। আমার যুবক বয়সে আমিও যুদ্ধ করেছি হে, আমিও একজন প্যালেস্টাইনী বটে। সেই বয়সে আশ্রয়, খাবার, নিরাপত্তা—এসবের ধার আমি কখনও ধারিনি। তোমাদের রক্ত গরম, তোমরা তো বিপদকে তুচ্ছ জ্ঞান করবেই। কিন্তু, আমি তো তোমাদেরকে এই রাত দুপুরে মরুভূমিতে ছেড়ে দিতে পারি না, বাপজানেরা! এসো, ওপর তলায় বোধহয় পরিষ্কার আছে একটা কামরা, দেখিয়ে দিই তোমাদের।' কাঁপতে কাঁপতে ঘুরে দাঁড়াল বৃদ্ধ।

অসহায় ভাবে কাঁধ ঝাঁকাল রানা। বুড়োর এই স্নেহ-ভালবাসা অগ্রাহ্য করে বেরিয়ে পড়া এই মুহূর্তে অসম্ভব বলেই মনে হলো।

'আপনি খুব ভাল,' বুড়োর পাশে চলে গেছে কাফা। মনের কথা গড়গড় করে সব বের করে দিচ্ছে।

দোতলায় উঠল রানা ওদের পিছু পিছু।

করিডরটা অসম্ভব নড়বড়ে। প্রতিটি পদক্ষেপে দুলছে আর ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ তুলছে।

'সিরিয়ায় যুদ্ধ করেছি আমি, আধা ডজন পদক পেয়েছিলাম,' বৃদ্ধ একটা দরজার পাশে দাঁড়াল। আলখাল্লার পকেট হাতড়ে চাবি বের করল একটা। কী-হোলে ঢোকাল সেটা। একদৃষ্টে চেয়ে আছে রানা। 'কাল সকালে সেগুলো তোমাদেরকে দেখাব, বাপজানেরা।' চাবি ঘুরিয়ে তালাটা খুলল। কবাট দুটো ধাক্কা দিয়ে ফাঁক করে দিয়ে হাত নেড়ে ভিতরে ঢুকতে ইঙ্গিত করল ওদেরকে। 'খেজুর আর মধু এনে দিচ্ছি, এই খেয়েই রাতটা কাটাও, বাপজানেরা। কাল সকালে তোমাদের আমি দুম্বা জবাই করে খাওয়াব।'

রানা সবিনয়ে জানাল রাতের খাবার খেয়েই এসেছে ওরা, অকারণ ঝঞ্ঝাট করার দরকার নেই। 'তাহলে আমি বরং বিশ্রাম করিগে যাই,' সফেদ দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে বলল বৃদ্ধ।

চোখের মণি ঘুরিয়ে কামরাটা দেখছে রানা। এমন সময় বুড়োর কথায় চোখ ফেরাল ও। 'দরজাটা তাহলে বন্ধ করে দিই?' বলল সে।

রানা দেখল ধীরে ধীরে দরজা বন্ধ করছে অশীতিপর বৃদ্ধ। অদ্ভুত পবিত্র একটা হাসি লেগে রয়েছে চোখেমুখে। 'বাপজানেরা, সকাল বেলা আবার পালিয়ে যেয়ো না যেন! অতিথি সেবার সুযোগ না পেলে এই বুড়ো বয়সে মনে খুব কষ্ট পাব।'

দরজা বন্ধ হয়ে গেল। ক্লিক করে শব্দ হলো একটা। তালা বন্ধ করে দিল বৃদ্ধ বাইরে থেকে। পাঁচ সেকেন্ড কী-হোলের দিকে চেয়ে রইল রানা। কাফা লক্ষ করল কোন একটা ব্যাপারে বেশ একটু অবাক হয়েছে রানা।

'ব্যাপার কি, দোস্ত? বুড়ো...মানুষ তো?'

রানা তখন চেয়ে আছে জানালাটার দিকে।

'মানুষ, কিন্তু অতিমানুষ কিনা সন্দেহ হচ্ছে,' বলল রানা। দেয়ালের গায়ে লাগানো আয়নাটার দিকে চোখ পড়ল ওর। 'বুড়ো আমাদেরকে সন্দেহ করেছে, কাফা।'

'দোস্ত!'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'দরজায় তালা লাগাবার ওটাই কারণ। ওর চোখকে আমরা ফাঁকি দিতে পারিনি।'

'তার মানে এয়ারফোর্স থেকে পালাচ্ছি বুঝতে পেরেছে বলছ?'

'হ্যাঁ।'

কাফার মুখ বিকৃত হয়ে উঠছে দেখে রানা চোখ গরম করে সাবধান করে দিল, 'কেঁদো না!' একটা ঘুসি পাকিয়ে তার নাকের সামনে তুলল ও, 'আওয়াজ বেরুলেই মুখের ম্যাপটা বদলে দেব।'

'কি হবে এখন!' ভীত-চকিত চোখে চারদিকে তাকাল কাফা। একটা লাফ দিল সে ক্যাঙ্গারুর মত। কামরার একটিমাত্র জানালার সামনে দাঁড়াল গিয়ে। দু'সেকেন্ড চেয়ে রইল বাইরের দিকে। তারপরই প্রচণ্ড এক ঘুসি মেরে ভেঙে ফেলল আর্শির কাঁচটা।

ঝনঝন শব্দে চমকে উঠল নিস্তব্ধ রাত।

'উফ্, গেছি রে···দোস্ত, ডাক্তার! ডাক্তার ডাকো! তা নাহলে,' বাঁ হাতটা কয়েক জায়গায় কেটে গেছে কাফার, ঝরঝর করে রক্ত ঝরছে। হাউ মাউ করে কেঁদে ফেলল সে। '···আমি বাঁচব না!'

সময় নিয়ে লক্ষ্যস্থির করল রানা। তারপর প্রচণ্ড একটা চড় মারল কাফার বাম গালে। পরক্ষণে পতনোন্মুখ শরীরটা ধরে ধীরে ধীরে কাঠের মেঝেতে শুইয়ে দিল ও। নিঃসাড় পড়ে রইল কাফা।

সিধে হয়ে দাঁড়াল রানা। কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে রইল ঝাড়া পনেরো সেকেন্ড। বাড়িটার কোথাও কোন শব্দ নেই।

দ্রুত আর একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নিল রানা কামরাটা। বাড়িটার ভগ্নদশার সাথে এই কামরার সাদৃশ্য নেই কোথাও। দেয়ালের কাঠগুলো তেল চিটচিটে হলেও এগুলো যে অত্যন্ত মজবুত তা একটু মনোযোগ দিয়ে দেখলেই বোঝা যায়। পেরেক, স্ক্রু আর ক্ল্যাম্পগুলো ঝকঝক করছে ল্যাম্পের আলোয়। সবগুলো আনকোরা নতুন। কামরাটাই সদ্য নির্মিত। আর দরজার তালাটা, আগেই লক্ষ করেছে রানা, ইয়েল লক। অস্বাভাবিক? নিজেকে প্রশ্ন করল সে।

সম্পূর্ণ। নিজেই উত্তর দিল রানা।

জানালার আধ হাত বাইরে লোহার গ্রিল। দু'দিকে দেয়ালের ভিতর কিনারাগুলো ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। তার মানে গ্রিলের ফ্রেম খুলতে হলে দেয়ালের তক্তা ভাঙতে হবে। যন্ত্রপাতি থাকলে ভাঙা সম্ভব, কিন্তু কামরার ভিতর থেকে নয়। বাইরে থেকে মই লাগিয়ে উঠতে হবে জানালার কাছে, তারপর।

দরজাটাও পরীক্ষা করল রানা। আরও গম্ভীর হয়ে উঠল ও। কোন সন্দেহ নেই এখন আর, বুড়ো আপন মনে হাসছে কোথাও বসে। এই কামরা থেকে বেরুনো এক কথায় অসম্ভব।

দরজাটা কাঠেরই, কিন্তু ফ্রেমটা লোহার। কাঠের উপর কালো রঙের ইস্পাতের পাত নিখুঁতভাবে মোড়া হয়েছে। ভাঙা যে অসম্ভব, স্বীকার করল রানা মনে মনে। যতই লক্ষ করছে ততই বিস্মিত হচ্ছে সে।

মেঝেটা পরীক্ষা করেও আশার কোন আলো দেখল না রানা। আধ হাত পর পর লোহার ফিতে দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে লম্বা তক্তাগুলোকে। ছয় ইঞ্চি লম্বা

লোহার গজাল পুঁতে নিচের কড়িকাঠের সাথে আটকে রাখা হয়েছে ওগুলোকে।

উবু হয়ে বসে অচেতন কাফার বাঁ হাতটা পরীক্ষা করল রানা। ক্ষত কোনটাই গভীর নয়, রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই। পালস দেখল। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে জ্ঞান ফিরে আসবে বলে অনুমান করল। দাঁড়াতে যাবে, হঠাৎ ঝট্ করে জানালার দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে গেল সেই অবস্থায়। মনে হলো, কানের ভুল। কিন্তু পরমুহূর্তে শব্দটা পরিষ্কার শুনতে পেল ও। গাড়ির শব্দ। ক্রমশ যেন বাড়ছে। এদিকে আসছে নাকি?

বুড়োর কাছ থেকে খবর পেয়ে স্টেশন থেকে মিলিটারি পুলিস আসছে ওদেরকে গ্রেফতার করতে? এই প্রশ্নটাই প্রথম উদয় হলো রানার মনে।

সিধে হয়ে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল ও। গ্রিলের ফাঁক দিয়ে অন্ধকার ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ল না প্রথমে। চাঁদের আলো এদিকটায় না পড়ার কারণটা আবিষ্কার করতে দেরি হলো না ওর। পাহাড়ের একটা উঁচু প্রাচীর আড়াল করে রেখেছে উপত্যকাটাকে। চাঁদ এখন পাঁচিলের ওপারে।

ইঞ্জিনের শব্দটা ক্রমশ বাড়ছে। পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে ও। দশ সেকেন্ড পর বুঝতে পারল, কার নয়, ট্রাক। ট্রাক? ট্রাক কেন? পাহাড়ের উপর কেন উঠছে?

অন্ধকার সয়ে এসেছে চোখে। শব্দটা এখন ভরাট হয়ে উঠেছে বাতাসে। বাড়িটার খুব কাছ দিয়ে আসছে ট্রাকটা। ইঞ্জিনের শব্দ ছাড়াও আরও একটা শব্দ যেন কানে ঢুকছে ওর। পরিষ্কার নয়।

পাহাড়ের প্রাচীরটা দেখতে পাচ্ছে রানা। ভাঙা কাঁচের ফাঁক দিয়ে মাথাটা বের করে দিল ও ধীরে ধীরে। গ্রিলে ঠেকল বাম গাল। ট্রাকটা কাছে চলে এসেছে। কিন্তু কোন আলোর চিহ্ন মাত্র নেই কোথাও। হঠাৎ ঠিক প্রাচীরের গা ঘেঁষে এগোতে দেখল রানা ট্রাকটাকে। পথটা সঙ্কীর্ণ বলেই কিনা বুঝতে পারল না, ট্রাকটা মন্থর গতিতে এগোচ্ছে। পরিষ্কার না হলেও, কাঠামোটা পুরোই দেখল রানা। দক্ষিণ দিকে এগোচ্ছে সেটা। বাঁক নিয়ে আড়াল হয়ে গেল খানিক পরই। সেই সাথে দ্বিতীয় শব্দটা পরিষ্কার কানে ঢুকল ওর।

আরও একটা ট্রাক আসছে।

পরপর তিনটে ট্রাক চলে গেল, একই গতিতে। সম্ভবত ভারি কিছু বয়ে নিয়ে যাচ্ছে ওগুলো, ভাবল রানা। রিস্টওয়াচ দেখল। দুটো বাজে।

আর মাত্র দু'ঘন্টা পর ভোরের আলো ফুটবে।

মিলিটারির ট্রাক? ভাবছে রানা। উঁহুঁ, মিলিটারি ট্রাক পাহাড়ে কি করতে আসবে? এদিকে অ্যান্টি-এয়ারক্র্যাফট গান থাকলে ট্রাকের আনাগোনা অস্বাভাবিক কোন ব্যাপার নয়। কিন্তু আছে বলে শোনেনি কখনও ও। থাকলে শুনতোই।

তাহলে? তবে কি সঠিক আল মাকারদানা মরুদ্যানের কাছেই চলে এসেছে ও, প্রাচীরের ওপারেই কি সেই মরুদ্যান? ট্রাকগুলো কি জামাল আরসালানের আস্তানা থেকে বেরিয়ে আসছে? কিংবা আস্তানায় যাচ্ছে? কি আছে আল মাকারদানায়?

অ্যামুনিশন ডিপো? প্রশ্নগুলো ভিড় করে এল মনে।

ধীরে ধীরে মাথাটা ভাঙা কাঁচের ফাঁক থেকে বের করে নিল রানা। কামরা থেকে বেরুতে হবে, যেভাবেই হোক। বুড়োটা বোধহয় বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে…ঘুরতেই দেখল ও, কাফা উঠে বসে আছে মেঝেতে। হাতে একটা ছুরি, নিজের গলার কাছে ধরা। কি যেন বলছে সে। ঠোঁট দুটো নড়ছে শুধু, শব্দ বেরুচ্ছে না। দু'চোখ থেকে অনর্গল ধারায় বেরিয়ে আসছে পানি।

ক্যাম্বিসের জুতো পায়ে থাকায় কোন শব্দ হলো না। কাছে গিয়ে ছোঁ মেরে ছুরিটা কেড়ে নিল রানা।

'দোস্ত! বেইমানি করো না আমার সাথে।' উঠে দাঁড়াল কাফা।

ঠক ঠক করে কাঁপছে সে। 'গাড়ির শব্দ পেয়েছি আমিও। ওরা আসছে!' উন্মাদের মত নিজের বিশাল বুকে দমাদম ঘুসি মারল সে। 'কিন্তু কেউ আমাকে স্টেশনে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। তার আগেই আমি…'

শুনেও না শোনার ভান করে ছুরিটা চোখের সামনে তুলে সেটাকে দেখছে রানা। হঠাৎ কি মনে করে উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর মুখ। ছুরির ফলাটা ভাঁজ করে প্লাস্টিকের লম্বা গর্তে ঢুকিয়ে দিল। দরজার তলার দিকে তাকাল ও। কী-হোলে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে ছুরির খোপটা থেকে বের করল আড়াই ইঞ্চি লম্বা সরু কাঁটাটা। তারপর এগোল সেদিকেই। দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল ও।

ঘুরে তাকাল রানা কাফার দিকে। 'ছুরিটা তোমাকে এই মুহূর্তে দিতে পারছি না বলে দুঃখিত, কাফা। আত্মহত্যা যদি করতে চাও করো, আমি একাই শত্রুদেরকে বাধা দেব।'

'শত্রু! কোথায় শত্রু? কি পাগলের মত যা তা বকছ, দোস্ত?' শার্টের আস্তিন দিয়ে চোখের পানি মুছল কাফা।

জবাব দিল না রানা। কী-হোলে চোখ রেখে কিছুই দেখল না ও। প্যাসেজে আলো নেই, দেখতে না পাবার সেটাও একটা কারণ হতে পারে। কিন্তু কারণ সেটা নয়, খানিকপরই বুঝতে পারল ও।

'কি করছ তুমি, দোস্ত?'

এগিয়ে এসে ঘাড়ের উপর দিয়ে উঁকি দিল কাফা।

'চুপ! কথা বললে আত্মহত্যার সুযোগও তুমি পাবে না, আমিই খুন করব তোমাকে।'

সরু কাঁটাটা কী-হোলে ধীরে ধীরে প্রবেশ করাল রানা। আধ ইঞ্চি ঢুকে আটকে গেল, সামনে বাড়তে চায় না আর। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে শেষ পর্যন্ত একটা পথ বের করা গেল কাঁটাটার জন্যে, এরপর সহজেই দেড় ইঞ্চিটাক ঢুকে গেল ভিতরে। ঠক্ করে শব্দ হল দরজার ওপারে।

'চাবি ছিল তালায়, দোস্ত! ওটা প্যাসেজে পড়ল।'

কাঁটাটা আবার ভিতরে ঘোরাতে শুরু করেছে রানা ইতিমধ্যে। আটকাচ্ছে

বারবার, বারবার ছাড়িয়ে নিয়ে খোঁচা মারছে রানা, এ-কোণ ও কোণ থেকে চাপ দিচ্ছে। মিনিট তিনেক পর মনে হলো, অসম্ভব, এ তালা খোলা যাবে না। ঠিক তখনই শব্দটা হলো, ক্লিক্!

সিধে হয়ে দাঁড়াতে গিয়ে এতক্ষণে পিঠে ব্যথা অনুভব করল রানা। তাকাতে দেখল কাফা ঢোক গিলছে। 'তুমি তাহলে আত্মহত্যা করো, আমি চললাম। ভাল কথা, দেখা যদি হয়, কি বলব তোমার ছেলেটাকে? আত্মহত্যা করেছ একথা বললে সে হয়ত পকেট ভর্তি পাথর নিয়ে তোমার খোঁজেই বেরিয়ে পড়বে তোমাকে উচিত শিক্ষা দেয়ার জন্যে…।'

কথা না বলে হঠাৎ রানাকে পাশ কাটাল কাফা। দরজা খুলে প্যাসেজে বের হলো। 'কোথায় কোন্ শালা আছিস, বেরো! দেখে নেব আজ তোদেরকে!' চিৎকার করে গোটা বাড়ি মাথায় করল সে।

চৌকাঠ পেরোল রানা। টর্চের আলোয় প্যাসেজের দুটো দিক দেখে নিল। কেউ নেই।

বাড়ির বাইরে চাঁদের আলোয় বেরিয়ে এল ওরা। কেউ বাধা দিল না দেখে মনটা খুঁত খুঁত করছে রানার। ওদের বিরুদ্ধে কিছু একটা ব্যবস্থা করা হয়েছে বা হচ্ছে, অনুভব করতে পারছে রানা। একটা অস্বস্তি ঘিরে ধরল ওকে। বুড়োর উদ্দেশ্য বা কৌশল আঁচ করতে না পেরে অসহায় বোধ করছে ও।

চক্কর দিয়ে বাড়িটার পেছনে চলে এল ওরা। খাড়া উঠে গেছে পাথুরে জমি। জায়গাটা নিচু আর লোহার স্প্রিঙের মত শক্ত ঝোপঝাড়ে ঢাকা। পা আটকে গিয়ে দু'বার পড়ে যাবার উপক্রম করল রানা।

তারপর জায়গাটা সমতল হয়ে গেছে। ওখান থেকে ডান দিকে দেখতে পেল রানা পাহাড়ের প্রাচীরটা। প্রাচীরের কাছে যেতে হলে প্রথমে একটা খাদে নামতে হবে, সেখান থেকে তির্যক ভাবে উঠে যেতে হবে প্রাচীরের গা ঘেঁষে রাস্তা বাঁক নিয়েছে যেখানটায় সেখানে। খাদ থেকে রাস্তার আর কোন অংশে পৌঁছুবার কোন উপায় দেখল না রানা। দুর্গম এই দূরত্বটা তীক্ষ্ণ চোখে জরিপ করে নিতে নিতে রানা ভাবল, বাড়ি থেকে এইটাই যদি জামাল আরসালানের আস্তানায় পৌঁছুবার একমাত্র রাস্তা হয় তাহলে বুড়োটা এখনও বাড়িতেই আছে।

অন্ধকার বলে খাদটার গভীরতা আন্দাজ করতে ভুল হয়েছিল, চল্লিশ ফুটের মত নামার পরও তলাটা দেখতে পেল না ওরা। আলো জ্বেলে বিপদ ডেকে আনতে পারে ভেবে কাফার টর্চটা নিজের হাতে নিয়েছে রানা। আরও পনেরো ফুটের মত নামার পর তলা পাওয়া গেল।

কোথাও কোন শব্দ নেই। পিছনে নিকষ কালো গভীরতা, সামনে রাস্তার বাঁক, একটা অর্ধ বৃত্তের মত দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের পাঁচিলটাকে। তারার আলোয় এখন দেখা যাচ্ছে পাঁচিলের গা ঘেঁষা রাস্তাটার বেশ খানিকটা দূর পর্যন্ত। আর মাত্র তিন ফুট, এটুকু উঠলেই রাস্তায় উঠে পড়া যায়। ঠিক এমন সময় আবার ইঞ্জিনের

আওয়াজ পাওয়া গেল।

ঝট্ করে মাথা নিচু করে খাদের নিচের দিকে এক পা নেমে এল রানা। বাঁ দিকে তাকাতেই দেখল বিরাট একটা গাঢ় অন্ধকার হেলে দুলে এগিয়ে আসছে রাস্তা ধরে।

পরপর সাতটা ট্রাক ওদের পাশ ঘেঁষে, তারপর বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ইঞ্জিনের শব্দ তখনও বাতাসে মিলিয়ে যায়নি, কাফা বিমূঢ় কণ্ঠে জানতে চাইল, 'রহস্যটা কি, দোস্ত? ওগুলো L. A. F. -এর ট্রাক!'

'এই রহস্য জানতেই তো এসেছি।'

এখন আর রানার মনে কোন সন্দেহ নেই যে ঠিক জায়গাতেই পৌঁছেচে ও। জামাল আরসালান লেবানন এয়ারফোর্সের ট্রাক ব্যবহার করছে—এতে আশ্চর্য হবার মত কিছু দেখল না ও। এয়ার ল্যান্ডিংটাকে সহায়তা করার জন্যে অস্ত্র বা বিস্ফোরক দরকার তার, সেগুলো পরিবহণের জন্যে ট্রাকও দরকার। এল.এ.এফ-এর ইউনিফর্ম বা ট্রাক সংগ্রহ করা তার পক্ষে অসম্ভব কোন কাজ নয়। নিশ্চয়ই প্রয়োজনীয় গেট-পাসেরও ব্যবস্থা করেছে সে তার লোকদের জন্যে, যাতে বিনা সন্দেহে, বিনা বাধায় তারা অ্যারোড্রোমে ঢুকতে পারে। কাগজপত্রের গুণে ট্রাকগুলো সার্চ করা হবে না, বুঝতে অসুবিধে হলো না ওর।

রাস্তায় উঠে বাঁক নিতেই চাঁদের আলোয় পাহাড়ের ক্রমশ উঁচু গা দেখতে পেল রানা। রাস্তাটা খানিকদূরে গিয়ে দুটো বিশাল পাথরের মাঝখানে ঢুকে গেছে। দূর থেকে একটা গেটের দুটো স্তম্ভের মত দেখাচ্ছে ও-দুটোকে। ফাঁকা জায়গা, অনেক দূর থেকেও ওদেরকে দেখতে পাবার কথা। গা ঢাকা দিয়ে পাথর দুটোর দিকে এগোবার কোন উপায় দেখল না রানা। অবশ্য তার কোন প্রয়োজনও নেই। ভাবল ও, বুড়ো ইতিমধ্যে সম্ভবত সকল ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছে—যে কোন মুহূর্তে ফাঁদে পা দিতে পারে ওরা।

কিন্তু কিছুই ঘটল না।

দুই পাথরের মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে এঁকেবেঁকে একশো গজের মত গেছে রাস্তাটা, তারপর হঠাৎ নামতে শুরু করেছে নিচে। খানিকদূর নামার পর গা ঢাকা দেয়ার মত ঝোপ-ঝাড় দেখল ওরা দু'পাশে। আরও একশো গজ এগোবার পর রাস্তাটা গভীর একটা খাদের গা বেয়ে নেমে গেছে নিচের দিকে। পঁচিশ গজ থাকতেই রাস্তার কিনারা ত্যাগ করে ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর দিয়ে নিঃশব্দ পায়ে এগোল রানা। দু'বার কাফার হাঁচি দমন করার প্রয়াস কানে ঢুকল ওর। গজ তিনেক পিছনে আছে সে। রুমাল দিয়ে চেপে সামাল দিচ্ছে সে হাঁচিগুলোকে।

খাদের কিনারাটা চাঁদের আলোয় পরিষ্কার দেখতে পেল রানা। দাঁড়াল ও। পিছনটা তীক্ষ্ণ চোখে ভাল করে দেখে নিল একবার। কাফাকে ইঙ্গিত করে শুয়ে পড়ল পাথরের উপর। তারপর ক্রল করে এগোল সামনে।

খাদের কিনারায় গিয়ে থামল ওরা।

রানার পাশে এসে নিচের দিকে উঁকি দিয়েই আঁতকে উঠল কাফা, রুদ্ধশ্বাসে

বলল, 'দোস্ত!'

'চুপ!'

ত্রিশটার উপর ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে ওদের নিচে। প্রতিটির মাথায় এল.এ.এফ. লেখা রয়েছে বড় বড় ইংরেজি হরফে। লেবানন এয়ারফোর্সের ইউনিফর্ম পরা লোকের ভিড় দেখতে পাচ্ছে ওরা। লম্বা তারের সাথে ইলেকট্রিক বালব ঝুলছে পঞ্চাশ-ষাটটা। জায়গাটা দিনের মত আলোকিত। ট্রাকগুলোকে তেরপল দিয়ে ঢাকার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। প্রতিটি ট্রাক ভর্তি করা হয়েছে। জিনিসগুলো দেখতে বড় আকৃতির কমপ্রেসড এয়ার-সিলিন্ডারের মত। ইউনিফর্ম লক্ষ্য করে রানা দেখল সার্জেন্টের সংখ্যা কম, অধিকাংশই সাধারণ বিমান বাহিনীর কর্মী। একজন অফিসারও চোখে পড়ল না ওর।

কয়েকটা ট্রাকে মাল তোলার কাজ শেষ হয়নি এখনও। হাইড্রোজেন সিলিন্ডারগুলো খাদের দূর-প্রান্তের একটা সুড়ঙ থেকে বের করে নিয়ে এসে ট্রাকে তোলা হচ্ছে। রানা লক্ষ করল, সুড়ঙের দু'পাশে ছোট পাথরের স্তূপ জমে আছে। ওগুলো দিয়েই যে সুড়ঙের মুখটা বন্ধ রাখা হয়েছিল, বুঝতে পারল ও।

খাদের প্রবেশ পথের কাছে ড্রাইভারদের একটা জটলা দেখতে পাচ্ছে রানা। নির্দেশের জন্যে অপেক্ষা করছে যেন ওরা, এই ফাঁকে আলাপ করছে চাপা স্বরে, উত্তেজিত ভাবে। ত্রস্ত একটা ভাব সকলের চোখমুখে। প্রত্যেকের এমন কি ড্রাইভারদের কোমরেও রিভলভার ঝুলছে। প্রবেশ পথের দু'ধারে দু'জন করে চারজন অটোমেটিক রাইফেলধারী গার্ড। খাদের এদিক ওদিক ঘুর ঘুর করছে আরও কয়েকজন।

হঠাৎ একটা ট্রাকের পিছন থেকে সাত-আটজন লোক বেরিয়ে এল। একজনকে চিনতে পেরে হৃদকম্পন বেড়ে গেল রানার। সেই অতিভদ্র, সবিনয়, জ্ঞানভারে নুয়ে পড়া ভাবভঙ্গির চিহ্ন মাত্র নেই জামাল আরসালানের মধ্যে। মাথায় একটা হ্যাট পরেছে সে, চোখে গোল্ডরিমের চশমা। দৃঢ় পায়ে এগিয়ে গিয়ে খাদের মাঝামাঝি দাঁড়াল সে। দাঁড়াবার মধ্যে ঋজু একটা ভঙ্গি লক্ষ করল রানা। চারদিক থেকে এগিয়ে এসে লোকজন তাকে ঘিরে দাঁড়াল। মাথা দুলিয়ে কথা বলছে সে। ওদের কাছ থেকে অনেকটা দূরে বলে তার ঠোঁট জোড়ার নড়াচড়াই দেখা যাচ্ছে শুধু, শব্দ আসছে না কানে। এক মিনিটের বেশি কথা বলল না সে। রিস্টওয়াচ তুলল চোখের সামনে। হঠাৎ লোকগুলো জুতোর সাথে জুতো ঠুকে ঠকাস করে একযোগে স্যালুট করল তাকে। কপালে হাত তুলল সে অভিবাদন গ্রহণ করার ভঙ্গিতে। হাতটা নামাতেই সবাই দৌড়ুল। রানা লক্ষ করল প্রতিটি ট্রাকে সাতজন করে লোক চড়ল। স্টার্ট নিল ট্রাকগুলো লাইনবন্দী হয়ে এগোল এগারোটা ট্রাক।

খাদ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে ট্রাকগুলো এক এক করে। একা দাঁড়িয়ে আছে জামাল আরসালান। শেষ ট্রাকটা খাদ থেকে বেরিয়ে যাবার পর পা বাড়াল সে। সোজা এগিয়ে আসছে।

ঠিক ওদের নিচে এসে দাঁড়াল সে। চল্লিশ পঞ্চাশজন লোক তাকে ঘিরে ধরল এবার চারধার থেকে। মাথাটা আরও খানিক এগিয়ে দিয়ে নিচের দিকে ঝুঁকল রানা। একে একে লোকগুলোর দিকে নিঃশব্দে তাকাচ্ছে জামাল আরসালান। তারপর হঠাৎ তার গলার আওয়াজ পেল রানা। 'কোন প্রশ্ন?' দ্বন্দ্ব দেখা দিল ওর মনে, এমন তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর এই লোকের গলা থেকে বেরুতে পারে! পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে রানা, কিন্তু আস্তে। 'গুড! এখন সময় হলো...' রিস্টওয়াচে চোখ রেখে চুপ করে থাকল সে, সম্ভবত সেকেন্ডের কাঁটাটাকে তার চক্কর মারা পূরণ করার সময় দিচ্ছে, আট সেকেন্ড পর আবার বলল, '...ঠিক একটা বেজে আটান্ন মিনিট। পরিষ্কার মনে আছে সব? কোন ব্যাপারে কারও কোনরকম সংশয় আছে?' হিব্রু ভাষায় কথা বলছে সে। এদিক ওদিক মাথা নেড়ে সবাই জানাল কোন ব্যাপারে কোনরকম সংশয় নেই কারও। 'স্মোক কনটেইনার নিখুঁতভাবে ঢাকা আছে কিনা না দেখে অ্যারোড্রোমে ঢুকবে না কেউ। গুলি করার বদলে যুক্তি-তর্কের সাহায্যে ঝামেলা-মুক্ত হবার চেষ্টা করবে...যখন দেখবে কোন উপায় নেই কেবল তখনই গুলি করার কথা ভাববে, তার আগে নয়। আর একটা ব্যাপার। রানওয়ে যাতে পরিষ্কার চিনতে পারা যায় সেদিকে সবচেয়ে বেশি মনোযোগ দেবে। উচ্চতা হলো পঞ্চাশ ফুট। অলরাইট?' সবাই মাথা নেড়ে জানাল, ঠিক আছে। 'শুভ যাত্রায় তাহলে বেরিয়ে পড়ো তোমরা। গুড লাক টু ইউ!'

ঠিক সেই সময় পিছন দিকে তাকাতে গেল রানা।

'নড়ো না!' কঠিন একটা কণ্ঠস্বর।

স্থির হয়ে গেল রানা মুহূর্তের জন্যে, তারপর ধীরে ধীরে মাথাটা ঘুরিয়ে তাকাল। ওদের ঠিক পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছে তিনজন লোক। দুটো রাইফেল দু'জনের পিঠের উপর তাক করে ধরা। অন্যজনের পরনে সিভিল ড্রেস, হাতে একটা রিভলভার। কথা বলল আবার সে-ই, 'উঠে দাঁড়াও!'

পড়িমরি করে উঠে দাঁড়াল কাফা। বিড় বিড় করে বলল, 'কিছু ভেবো না তুমি, দোস্ত! একটা সুযোগ দিয়ে দেখুক, বেয়োনেট দুটো কেড়ে নিয়ে...!'

অত্যন্ত ধীরে ধীরে দাঁড়াল রানা। আধপাক গড়িয়ে চিৎ হলো প্রথমে, উঠে বসল। ভাঁজ করে বুকের কাছে তুলল হাঁটু দুটো। লক্ষ করল, ছুরিটা বেরিয়ে আসছে কাফার পকেট থেকে। আস্তে করে বের করে নিল সেটা। সবার অলক্ষ্যে বোতাম চেপে ফলাটা বের করে ফেলল খাপ থেকে। বাঁ হাতের ভিতর লুকিয়ে রাখল।

'কি করছ তোমরা এখানে?' কাফার দিক থেকে রানার কপালের দিকে রিভলভার তাক করল লোকটা। কালো রঙের কমপ্লিট স্যুট পরে আছে সে। ক্লিনশেভ। কণ্ঠস্বরে উত্তেজনার ভাব লক্ষ করল রানা।

'দেখছি,' নির্লিপ্ত শোনাল রানার কণ্ঠস্বর। 'কি হচ্ছে বলো তো ওখানে? ওই লোকটা জামাল আরসালান না?'

'অনধিকার চর্চা করছ,' লোকটা বলল। 'লেবানন এয়ারফোর্সের সংরক্ষিত

এলাকা এটা। তোমাদের পরিচয় না জানা পর্যন্ত···বুঝতেই পারছ!'

'না, পারছি না,' বলল রানা। 'সংরক্ষিত এলাকাই যদি হয়, কোথাও লেখা নেই কেন?'

'আছে,' লোকটা বলল। 'মেইন রোড ধরে যদি আসতে তাহলে দেখতে পেতে। তোমরা এখন বন্দী, পালাবার চেষ্টা করলে গুলি খেয়ে মরবে। চলো···।'

'ব্যাপারটা কি?' নড়ল না রানা। 'গোপনীয় কিছু হচ্ছে নাকি?'

চেয়ে থাকল লোকটা। প্রশ্নের উত্তর দিল না। 'সার্চ করো ওদের,' সঙ্গীদের উদ্দেশ্য করে বলল। 'খুব সাবধানে! মাত্র নয় মাসে নিজেদের দেশ স্বাধীন করেছে ওরা,' রিভলভারের নল দিয়ে রানাকে দেখাল সে। 'এক নম্বর বিচ্ছু।'

গার্ডদের একজন এগিয়ে এসে দাঁড়াল কাফার সামনে। কি এক উত্তেজনায় সন্ত্রস্ত হয়ে আছে লোকটা, অনুভব করল রানা। চোখের দৃষ্টি স্থির রাখতে পারছে না তিন সেকেন্ডের বেশি। মারাত্মক বিপদের গন্ধ পাচ্ছে যেন। হাতের রাইফেলটা কাঁধে ঝুলিয়ে রাখল সে।

'কাফা, উচিত হবে না,' দ্রুত বলল রানা। 'ছুরিটা ফেলে দাও

চমকে উঠে কাফার সামনে দাঁড়ানো গার্ডটা ঝট্ করে তাকাল রানার দিকে। সেই মুহূর্তে ভুলটা বুঝতে পারল সে। আবার কাফার দিকে ফেরার সময় পেল না, তার আগেই বিদ্যুৎ খেলে গেল কাফার শরীরে। বাঁ হাতের ছুরিটা সবেগে তার পেটে সেঁধিয়ে দিল কাফা, সেটা বের করে না নিয়ে হেঁচকা টান দিল উপর দিকে। নাভির নিচ থেকে বুকের পাঁজর পর্যন্ত দু'ফাঁক হয়ে গেল লোকটার পেট। ছুরিটা বের করে নিতে নিতে প্রচণ্ড একটা লাথি মারল ও দ্বিতীয় গার্ডের নিতম্বে। ছিটকে পড়ল সে তার সামনে দাঁড়ানো লোকটার উপর। আচমকা লাফ দিতে গিয়ে পিছলে গেল রানা। আহত গার্ডটা টলছিল মাতালের মত, তার বুকে কাঁধের ধাক্কা লাগায় সটান পড়ে গেল সে।

তিন থেকে চার সেকেন্ডের মধ্যে ঘটে গেল ঘটনাটা। রাতের নিস্তব্ধতা খান খান হয়ে গেল রিভলভারের শব্দে। কাফার হাতের ছুরিটা ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল বুলেটটা। খাদের নিচ থেকে ঠক্ করে আওয়াজ ভেসে এল একটা। রানা দেখল রিভলভারের নলটা লোলুপ দৃষ্টিতে কাফার কপাল তাক করে আছে।

'হ্যান্ডস আপ!'

ধীরে ধীরে মাথার উপর হাত তুলল রানা। কাফার দিকে চোখ পড়তেই এই বিপদেও হাসি চেপে রাখতে কষ্ট হলো ওর। দুই হাত মাথার উপর তুলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে, চোখ ঘষছে জামার আস্তিনে। দ্বিতীয় গার্ডটা সামলে নিয়েছে—রাইফেলটার নল ঠেকিয়ে রেখেছে সে কাফার কপালের পাশে। ট্রিগারের উপর চেপে বসে আছে আঙ্গুল।

'শেষ করে দেব, স্যার?'

'এখন এবং এখানে নয়,' রানার দিক থেকে চোখ সরাল না স্যার। 'তিন নম্বর

সেলে নিয়ে গিয়ে আটকে রাখতে হবে আপাতত।'

নাড়ি বেরিয়ে পড়েছে প্রথম গার্ডটার। জ্ঞান নেই, কোনদিন ফিরবে বলেও মনে হলো না রানার। দ্বিতীয়বার সেদিকে আর তাকাল না ও। অবশিষ্ট গার্ডটা এবার কোনরকম ঝুঁকি নিল না। ওদের পিছনে দাঁড়িয়ে সার্চ করল। 'কোন অস্ত্র নেই।'

'ঠিক আছে, আগে আগে হাঁটো তোমরা,' ক্লিনশেভ বলল, 'কোনরকম চালাকি করার চেষ্টা করো না। এবার আমি খুন করার জন্যে গুলি করব।'

দ্বিতীয় গ্রুপের ট্রাকগুলো স্টার্ট নিচ্ছে, আওয়াজ পেল রানা। নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট একটা জায়গায় গিয়ে পৌঁছুবে ওগুলো। সিলিভারগুলো দেখার পর ও এখন পরিষ্কার জানে, ফাইটার স্টেশন নাবাতিয়ায় কি ঘটতে যাচ্ছে। অ্যারোড্রোমের উপর স্মোকস্ক্রিন তৈরি করা হবে। ধোঁয়ার আড়াল থেকে টারমাকে নামবে প্যারাট্রুপ ক্যারিয়ার প্লেনগুলো। শুধু নাবাতিয়া নয়, লেবাননের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ফাইটার স্টেশনে ঘটবে এই ঘটনা। কিছু একটা করতে হবে, যেভাবেই হোক। ভাবছে রানা। করতে হবে এখুনি। 'মি. জামাল আরসালানের সাথে দেখা করতে চাই আমি,' বলল ও। 'কোথাও যদি নিয়ে যেতে চাও, আগে তার কাছে নিয়ে চলো আমাদের।'

'বুঝলাম না,' কঠোর শোনাল কমপ্লিট স্যুটের কণ্ঠস্বর।

'না বোঝার ভান করো না। সময় কম, দেরি করলে বিপদে পড়বে তোমরাই। তোমাদেরই ভুলে একজনকে ইতিমধ্যে হারিয়েছ, আমার কথা যদি না শোনো, সবাই মরবে তোমরা।'

'মি. জামাল আরসালান—কে তিনি?'

'ন্যাকা!' মুখ বাঁকাল কাফা।

'তোমার সাথে আমি তর্ক করে সময় নষ্ট করতে চাই না,' বলল রানা। 'তুমি গুলি করো আর কামান দাগো, এই আমি চললাম তার সাথে দেখা করার জন্যে।'

'দাঁড়াও!' দ্রুত বলল স্যার। 'কি দরকার মি. আরসালানের সাথে তোমার? কি সম্পর্ক তার সাথে তোমাদের?'

'কি দরকার তা তোমাকে কেন বলব? সম্পর্কটা কি, তার সামনে নিয়ে গেলেই টের পাবে।'

ইতস্তত করতে লাগল লোকটা। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'তুমি একজন গানার?'

'না,' সাথে সাথে উত্তর দিল রানা। 'গানার হতে যাব কোন্ দুঃখে? হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?'

'বস্ একজন গানার সম্পর্কে সাবধান করে দিয়েছেন আমাদেরকে। লোকটা নাকি স্পাই। বাঙাল মুলুক থেকে এসে...।'

'তার সম্পর্কে জরুরী আলাপ আছে মি. আরসালানের সাথে আমার।'

ইতস্তত ভাবটা কাটিয়ে উঠতে পারছে না ক্লিনশেভ। 'ও কে?' কাফাকে দেখিয়ে জানতে চাইল সে।

'তুমি কে? আমি জানতে চাই এত প্রশ্ন করার অধিকার তোমাকে কে দিয়েছে? এই আমি চললাম।'

খাদের কিনারা ঘেঁষে হাঁটতে শুরু করে দিল রানা। শির শির করে উঠল ঘাড়টা, লোকটা গুলি করছে ভেবে। কিন্তু কিছুই ঘটল না। পায়ের শব্দে বুঝল ও, সবাই অনুসরণ করতে শুরু করেছে ওকে।

নিচের দিকে তাকাল রানা। জামাল আরসালান খাদের মাঝখানে আরও একদল লোকের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। দাঁড়িয়ে আছে এদিকেই মুখ করে। ত্রিশ গজ এগোল ওরা।

'দাঁড়াও!' বাঁ দিক থেকে হুকুম করল কমপ্লিট স্যুট। 'তোমার ডানদিকে একটা পথ, ওটা ধরে নামো।'

নামতে নামতে লক্ষ্য করল রানা, চোখ তুলে একবারও তাকাচ্ছে না জামাল আরসালান। না তাকানোটা চেষ্টাকৃত বলে মনে হলো ওর।

বিশ পঁচিশ জনের ভিড়টা ঠেলে এগোল ওরা। ওদেরকে এবং ওদের পিছনে দু'জন অস্ত্রধারী লোককে দেখেই ছাইয়ের মত ফ্যাকাসে হয়ে গেছে সকলের মুখের চেহারা। যা বোঝার বুঝে নিয়েছে সবাই। দু'একজন ছিটকে সরে গেল। ভীতচকিত দৃষ্টি বিনিময় হতে দেখল রানা।

ভিড়টার কিনারা থেকে চার হাত দূরে দাঁড়িয়ে আছে জামাল আরসালান। কিনারায় দাঁড়াল রানা। পাশে কাফা। ওদের দু'জনের পিছনে গার্ড। কমপ্লিট স্যুট রানার পাশে।

সকলের দিকে চোখ বুলাচ্ছে জামাল আরসালান। কোটের বাঁ পকেটে একটা হাত। ডান হাতটা পাশে ঝুলছে, আঙুলের ফাঁকে হাভানা চুরুট, তা থেকে নীলচে ধোঁয়া উঠছে এঁকেবেঁকে। রানার উপর দিয়ে চোখের দৃষ্টি বুলিয়ে কাফার উপর আধ সেকেন্ডের জন্যে স্থির হলো কি হলো না, পাশের লোকের উপর দিয়ে সরে গেল দৃষ্টিটা ডাইনে। রানাকে দেখেছে, কিন্তু তা বোঝার কোন উপায় নেই। দেখেও যেন চিনতে পারেনি। বা চিনলেও তা বুঝতে দিতে চাইছে না। ক্ষমতার দম্ভ? নিজের শক্তি সম্পর্কে এতই আস্থাবান যে এরকম অগ্রাহ্য করছে?

খুক খুক করে কাশল ক্লিনশেভ। শব্দে আকৃষ্ট হয়ে তার দিকে নয়, তার হাতের রিভলভারটার দিকে একবার মাত্র তাকাল জামাল আরসালান। চোখ সরিয়ে নিয়ে সকলের উদ্দেশ্যে আবার কথা বলতে শুরু করল সে।

কোন প্রতিক্রিয়া নেই লোকটার মধ্যে, অনুভব করল রানা। ও যা ভেবেছিল তার কিছুই ঘটল না। জামাল আরসালান চমকে ওঠেনি, রাগে ফেটে পড়েনি, ব্যঙ্গাত্মক কোন ভাবও ফুটে উঠছে না মুখে। বোকার মত লাগল নিজেকে রানার।

'প্রতিটি নির্দেশ যেন অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হয়,' বলছে জামাল আরসালান। আর একবার চোখ বুলিয়ে সকলকে দেখে নিল সে। রানা এবং কাফাকেও দেখল। কিন্তু আগের মতই, কোন প্রতিক্রিয়া হলো না তার মধ্যে। ওরা

যেন দলেরই লোক, বাইরের কেউ নয়। সন্দেহ হলো রানার, লোকটা কি সত্যিই চিনতে পারছে না ওকে? মৃদু হাসি ফুটে উঠল তার মুখে। 'আর মাত্র কয়েকটা ঘণ্টা। তারপরই আমরা দখল করে নিচ্ছি গোটা লেবানন। পৃথিবীর ইতিহাসে এই বিজয়টার কথা সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে। এটা এমন একটা রণকৌশল যাকে ঐতিহাসিকেরা যুগান্তকারী বলে আখ্যায়িত না করে পারবে না।' চুরুটে মৃদু টান দিল সে। কিন্তু ধোঁয়া ছাড়ল না। থেমে থেমে ধোঁয়া বেরুতে শুরু করল তার কথা বলার সাথে, 'তোমরা সবাই তাহলে তৈরি, কেমন? তাহলে আর দেরি নয়। যাও, রওনা দাও। গুড লাক টু ইউ!'

পা বাড়াল জামাল আরসালান। রানার পাশ ঘেঁষে হেঁটে গেল সে স্বচ্ছন্দ, দৃঢ় ভঙ্গিতে। একবার তাকালও না রানার দিকে।

'স্যার!' কমপ্লিট স্যুট ডাকল।

সবাই অনুসরণ করছে জামাল আরসালানকে। কেউ কেউ তাকে দ্রুত ছাড়িয়ে গিয়ে যার যার ট্রাকে উঠে পড়ছে। ডাকটা শুনেও যেন শুনতে পায়নি জামাল আরসালান। প্রবেশ-পথের কাছে ঝকঝক করছে বিরাট একটা বুইক, সোজা সেদিকে এগোচ্ছে সে। গাড়িটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। চুরুটটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল। কোটের পকেট থেকে বাম হাতটা বের করল। দূর থেকেও লাইটারটা দেখতে পেল রানা। চুরুটে আগুন ধরাল সে। একরাশ ধোঁয়ায় আড়াল হয়ে গেল মুখটা।

ট্রাকগুলো স্টার্ট নিচ্ছে একে একে।

ধোঁয়া সরে যেতে রানা দেখল হাসি হাসি মুখে ট্রাকগুলোকে চলে যেতে দেখছে জামাল আরসালান। প্রতিটি ট্রাককে দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করছে সে। অদ্ভুত তৃপ্তির একটা উজ্জ্বল ভাব ফুটে উঠছে মুখের চেহারায়। সাফল্য সম্পর্কে তার মনে একটুও সংশয় নেই।

শেষ ট্রাকটাও খাদ থেকে বেরিয়ে গেল। ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে আর মাত্র আট-দশজন লোক এবং একটা জীপ আর দুটো মাইক্রোবাস। লোকগুলোর উদ্দেশ্যে পাইকারী ভাবে হাত নেড়ে গাড়ির দরজা খুলল জামাল আরসালান। ভিতরে ঢুকছে সে। একটা পা বুইকের ভিতর তুলল। মাথাটা নোয়াচ্ছে।

'স্যার!' ক্লিনশেভ আর্ত চিৎকার করে উঠল।

থমকে গেল জামাল আরসালান। পা'টা বের করে নিল সে গাড়ির ভিতর থেকে। কিন্তু সাথে সাথে ঘুরল না। হাতের চরুটটা ফেলল মাটিতে। জুতো দিয়ে পিষল সেটাকে। তারপর ধীর ভঙ্গিতে ওদের দিকে ঘুরে দাঁড়াল। 'ব্যাপার কি, ময়নিহান? কি করছ তুমি এখানে?'

'স্যার...' আমতা আমতা করতে লাগল ময়নিহান অর্থাৎ কমপ্লিট স্যুট। 'আমি...মানে...' রানাকে চোখের ইঙ্গিতে সামনে এগোবার নির্দেশ দিল সে। 'আমি...মানে...এই বন্দী বলছে কি একটা জরুরী ব্যাপারে সে আপনার সাথে কথা বলতে চায়।'

এগোল রানা। ওর পাশে চলে এল গার্ড। ওদের পিছনে ময়নিহান, যেন লুকাতে পারলে বাঁচে। রানার আরেক পাশে কাফা। অসম্ভব গম্ভীর সে।

জামাল আরসালানের সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা। দু'হাত রাখল কোমরে। রানার চোখেমুখে আশ্চর্য এক তেজস্বিতা লক্ষ করল সে। কিন্তু দু'সেকেন্ডের বেশি তাকাল না সে রানার দিকে। 'ওদেরকে এখানে কেন এনেছ?' ধমকের সুরে বলল জামাল আরসালান। 'আমার নির্দেশ পাওনি তুমি?'

'কিন্তু স্যার, বন্দী বলছে এ নাকি গানার নয়, আর...।'

'কি ব্যাপার, রানা?' তীক্ষ্ণ গলায় জানতে চাইল জামাল আরসালান। 'ধরা পড়লে তোমার কপালে কি ঘটবে তা তুমি আগেই অনুমান করোনি? কি আশা নিয়ে কথা বলতে চাও আমার সাথে?' পরিষ্কার বিরক্তি প্রকাশ পেল জামাল আরসালানের কথায়। কারণ আছে, ভাবল রানা, গত চার পাঁচ বছর ধরে সাধনা করছে সে, আজ সাফল্যের দোরগোড়ায় এসে বাধা পেলে অসহিষ্ণু হয়ে ওঠারই কথা তার। সব সমস্যার সমাধান আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছে সে। এমন কি ওকে নিয়ে কি করতে হবে তাও।

মৃদু হাসল রানা। বলল, 'তোমার হাতে এমন কিছু নেই যা আমি পাওয়ার আশা করতে পারি...।'

রানাকে শেষ করতে দিল না জামাল আরসালান কথাটা, ব্যস্ততার সাথে বলল, 'তাহলে কথা বলতে চাও কেন?'

'একটা খবর জানাবার জন্যে।'

রিস্টওয়াচ দেখল জামাল আরসালান। তারপর হঠাৎ যেন খেয়াল হলো, রানার কথার উত্তরে কিছু বলেনি সে। তাড়াহুড়ো করে বলল, 'কি খবর? চটপট বলে ফেলো। একেবারেই সময় নেই হাতে।'

হাসিটা সারা মুখে ছড়িয়ে দিল রানা। তারপর বলল, 'খবরটা হলো, তোমার খেলা শেষ হয়ে গেছে। খেলা-শেষের ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পাচ্ছ না, আরসালান?'

'পাগল!' রানার বুকের দিকে রিভলভারের মত তাক করে ধরল জামাল আরসলান তার ডান হাতের তর্জনী। 'এই লোক বদ্ধ পাগল। ময়নিহান, আমার সময় এভাবে নষ্ট করার জন্যে ভুগতে হবে তোমাকে, বিলিভ মি।'

'শুধু নাবাতিয়া নয়, লেবাননের সব ক'টা ফাইটার স্টেশনে খবর চলে গেছে, আরসালান। তোমাদের ষড়যন্ত্রের কথা জানতে এখন আর বাকি নেই কারও।'

'তাই নাকি!' আঁতকে ওঠার ভঙ্গি করল জামাল আরসালান। আতঙ্কে বিকৃত হয়ে উঠল মুখ।

কৃত্রিম ভাবভঙ্গি দেখে রাগে জ্বালা করে উঠল রানার শরীর। অত্যন্ত শান্ত রাখল ও নিজেকে। বুঝল, প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস রয়েছে লোকটার মধ্যে, সেখান থেকে তাকে টলানো সহজ নয়। 'আমাকে খুন করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছ তুমি,' বলল ও। 'তার কারণ, আগে থেকেই সতর্ক ছিলাম আমি। সত্যিই যদি আমি সাধারণ একজন

গানার হতাম তোমার প্রথম চেষ্টাই সফল হত, এখন আমি বন্দী থাকতাম স্টেশনের সেলে, আতাসী যেমন আছে। কিন্তু বাংলাদেশ থেকে আমি এসেছি একটা ষড়যন্ত্র উদঘাটন করতে…সবই তো তুমি জানো, তাই না?'

'আধঘণ্টা আগে জেনেছি,' বলল জামাল আরসালান, 'বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স ভাগিয়ে দিয়েছে তোমাকে। এ থেকেই তোমার যোগ্যতা পরিমাপ করতে পেরেছি। লেবানন এয়ারফোর্সের ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ কতখানি দুর্বল এ-থেকে তাও প্রমাণ হয়। তারা তোমার মত একজন লোককে ভাড়া করেছে…।'

'সে যাই হোক,' বলল রানা, 'তোমাকে স্বীকার করতেই হবে যে আমার যোগ্যতা সম্পর্কে যা ধারণা করেছিলে তা ভুল। তোমার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে গেছে, আরসালান। উইং কমান্ডার তারেক হামেদীকে সব কথা বলেছি আমি। প্রথমে তিনি আমাকে পাত্তা দেননি। কিন্তু তাকে যখন ডায়াগ্রামটা দেখালাম…কোন্ ডায়াগ্রামটা মনে আছে তো তোমার? যেটা রোপণ করে ফাঁসাতে চেয়েছিলে আমাকে। দেখে চক্ষু চড়ক গাছ হয়ে গেছে উইং কমান্ডারের। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছেন তিনি, দেখে এসেছি।'

ডায়াগ্রামের কথাটা উল্লেখ করার সময় রানা লক্ষ করল, সন্দেহের একটা ছায়া পড়েই মিলিয়ে গেল জামাল আরসালানের মুখ থেকে।

ইতস্তত করল সে এক সেকেন্ড। তারপর হঠাৎ হাসল। সহজ, স্বতঃস্ফূর্ত হাসি। হ্যাটটা মাথা থেকে নামিয়ে বাঁ হাতের আঙ্গুল চালাল কোঁকড়ানো চুলে। 'ফালতু কথা বলে লাভ কি, রানা! হামেদী যদি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েই থাকে, আমাকে তুমি সাবধান করে দেবে কেন? এখানেই বা তোমার আসার কি দরকার ছিল?'

রিস্টওয়াচ দেখল সে। 'এক মিনিট,' বলে অপেক্ষারত জীপটার দিকে এগোল সে মাথায় হ্যাট চড়াতে চড়াতে।

জীপের ভিতর ছয়জন লোক। ড্রাইভারের সাথে কথা বলল জামাল আরসালান। তারপর পিছিয়ে এল এক পা। স্টার্ট দিয়ে ছুটতে শুরু করল জীপটা। দৃষ্টি দিয়ে সেটাকে সে অনুসরণ করল যতক্ষণ দেখা যায়। তারপর ফিরে এল নিচের গাড়ির কাছে। 'দুঃখিত, রানা। এবার আমাকে যেতে হবে। বুঝতেই তো পারছ, আমার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিন আজ। বিজয়ের মুহূর্তটি খুব বেশি দূরে নয় এখন থেকে। একটা গোটা দেশ জয় করার সকল কৃতিত্বের একক অধিকারী হতে যাচ্ছি আমি। এটা এমন একটা ব্যক্তিগত বিজয় বা আধুনিক যে কোন যুদ্ধ-বিজয়কে ম্লান করে দেবে। যে-কোন অর্থে, এটি এককভাবে আমারই বিজয়। কারণ, স্কীমটা আমার নিজের তৈরি। আমি প্রথম থেকেই বিশ্বাস করে এসেছি, ইসরায়েলকে টিকিয়ে রাখতে হলে আমাদের মিত্রদের হাতে তুলে দিতে হবে লেবাননের শাসনভার। খ্রীস্টান ফালাঞ্জিস্টদের পরিণত করতে হবে সংখ্যা গরিষ্ঠে। আমরা আমাদের ইচ্ছে মাফিক তৈরি করে দিয়ে যাব লেবাননকে। যেখানে মুসলমানের সংখ্যা থাকবে

খ্রীস্টানদের চেয়ে কম, এখন যা আছে ঠিক তার উল্টো।'

জামাল আরসালান বিরতি নিল। রানা দেখল, লোকটা এই মুহূর্তে বর্তমান থেকে অনেক দূরের ভবিষ্যতে চলে গেছে। তার সাফল্য তাকে কি রকম ক্ষমতা, সুখ্যাতি এবং মর্যাদা এনে দেবে তা ভাবতে গিয়ে সে যেন রোমাঞ্চ অনুভব করছে। 'আর তুমি···তোমাকে চলে যেতে বাধ্য করতে হচ্ছে বলে সত্যি আমি দুঃখিত, রানা। কিন্তু এছাড়া আর করার আছেই বা কি। যেতে তো একজনকে হতই—হয় তোমাকে, নয় আমাকে। আমি দুঃখিত। হ্যাঁ,' মাথা দুলিয়ে স্বীকার করার ভঙ্গি করল সে, 'তোমার স্নায়ু আর বুদ্ধির প্রশংসা করি আমি। এমন একটা জিনিস তুমি দেখতে পেয়েছ যা আর কারও চোখে ধরা পড়েনি। এখানেই তোমার মেধার প্রমাণ পাই। সকলের চোখে আঙ্গুল দিয়ে ষড়যন্ত্রটা যখন তুমি দেখাতে চেষ্টা করলে, কেউ তোমাকে পাত্তা দিল না। তোমার ধারণা ঠিক ছিল, এটা জেনে তোমাকে মরতে হচ্ছে বলে সত্যি খুব খারাপ লাগছে।' প্রসঙ্গ বদলাল সে, 'আমি জানতাম পাঞ্জার তোমাকে বোকা বানাতে পারবে। বড় কাজের বুড়ো আমাদের এই পাঞ্জার। ছকের সাথে খাপে খাপে মিলে গেছে তার ভূমিকাটা। সিরিয়ায় যুদ্ধ করার ব্যাপারে কিছু বলেছে সে তোমাকে?'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

'জানতাম, বলবে। কিন্তু কার পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করেছে তা বলতে ভুল করেছে, তাই না? না, আরবদের হয়ে নয়—ইসরায়েলিদের হয়ে যুদ্ধ করেছে সে। ফোন করে সে আমাকে জানাল, এই জায়গা সম্পর্কে তোমার সকল সন্দেহ দূর হয়ে গেছে। নতুন করে তা আবার জাগল কিভাবে? নিশ্চয়ই ট্রাকের শব্দ?'

'না,' বলল রানা, 'তালার চাবি ঘোরাতে দেখে।'

'আচ্ছা! পাঞ্জারের ত্রুটি তাহলে!' একটু যেন চিন্তিত আর গম্ভীর দেখাল জামাল আরসালানকে। 'আমি আবার ব্যর্থতা ভালবাসি না। এই ত্রুটির জন্যে ভুগতে হবে পাঞ্জারকে।' রিস্টওয়াচ দেখল সে। 'ময়নিহান আসলে একটা বুদ্ধু, তবে ওকে আমি অন্য কাজে লাগাব বলেই সহ্য করছি।' কয়েক সেকেন্ড চুপ করে রইল আরসালান। 'সে যাক। রানা, একটা ব্যাপারে তোমার ওপর আমি খুশি, বিলিভ মি। তোমার অ্যাকটিভিটি যথেষ্ট উত্তেজনা আমদানী করেছিল, খেলাটা সেজন্যে উপভোগ করেছি আমি। গুড বাই!' অদ্ভুত মার্জিত ভঙ্গিতে মাথাটা একটু নোয়াল জামাল আরসালান। ময়নিহানের দিকে তাকাল সে। 'জানো তো, সব ঠিক করাই আছে ওদের জন্যে। ওদেরকে নিয়ে যাও। দাহরুল থেকে মেইন রোডে গিয়ে উঠবে, সোজা চলে যাবে সাফারী রোডে, পাহাড়ে উঠে প্রথম যে বাঁকটা পাবে, ওখানেই। দেখো, সাথে দেশলাই নিতে ভুলো না যেন আবার। বুঝেছ সব?' নিচু, স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর। এতটুকু কাঠিন্যের ছাপ নেই চেহারায়। এমন সহজভাবে খুন করার নির্দেশ দিতে কাউকে দেখেনি রানা।

ময়নিহান স্যালুট করল জামাল আরসালানকে। 'ইয়েস স্যার। বুঝেছি।'

জামাল আরসালান গাড়িতে উঠছে। রাইফেলের নলটা শিরদাঁড়ার উপর ঠেকল রানার। শিথিল হয়ে গেল ওর পেশীগুলো।

স্টার্ট নিয়ে সাঁ করে বেরিয়ে গেল বুইকটা খাদ থেকে।

পাঁচ

অন্ধকারে গড়িয়ে চিৎ হলো কাফা। 'দোস্ত!' ফিসফিস করে ডাকল কাফা। ট্রাকের পিছনে ওদের সাথে একজন গার্ডও উঠেছে, জানে ও। 'দোস্ত!'

নিচু, চাপা কণ্ঠে রানা বলল, 'চুপ!'

রানার কণ্ঠস্বরে অদ্ভুত একটা উত্তেজনা রয়েছে, টের পেল কাফা। ভাবল, কি হয়েছে রানার? কিছু করছে নাকি? কিন্তু...নাহ, করার আর কিছু থাকলে তো! দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল সে। 'দোস্ত, জানি, কি করছ তুমি। এ সময় কেউ বিরক্ত করলে মনোযোগ ছুটে যায়। কিন্তু শুধু নিজের জন্যে না করে আমার জন্যেও একটু দোয়া করো, দোস্ত। জীবনে জেনে না জেনে কত পাপ যে করেছি...।'

সাড়া দিল না রানা। মরুভূমির উপর দিয়ে ঝড় তুলে ছুটছে ট্রাক। ওদের গায়ের উপর চেপে আছে মোটা, ভারি তেরপলটা। দু'জনেরই হাত-পা দড়ি দিয়ে বাঁধা।

'রানা, করেছ, দোস্ত?' পাশ থেকে জানতে চাইল কাফা।

রানা নিরুত্তর। কেমন যেন সন্দেহ হলো আবার কাফার। 'এত নড়ছ কেন তুমি? পেশাব পেয়েছে বুঝি? ছেড়ে দাও। কেউ তো আর দেখছে না তোমাকে।' একটু বিরতি নিয়ে আবার বলল, 'ছেড়ে দিয়েছ নাকি? খবরদার, অমন ভুলও করো না! মাফ চেয়ে নেয়ার এই শেষ সুযোগ, ওজু করারও আর সুযোগ পাবে না...আর যদি ছেড়ে দিয়েই থাকো, স্বীকার করো, সরে যাই আমি,' ফিসফিস করে প্রলাপ বকেই চলেছে সে, 'তা নাহলে গড়িয়ে এসে ভিজিয়ে দেবে আমাকে...।'

চাপা কণ্ঠে কি যেন বলল রানা, কিন্তু ট্রাকটা তীব্র ঝাঁকুনি খাওয়ায় কথাগুলো শুনতে পেল না কাফা। গাড়িটা মরুভূমি ত্যাগ করে মেইন রোডে উঠে পড়েছে। গতি আরও বেড়ে গেল হঠাৎ করে।

রানার কানের কাছে মুখ সরিয়ে আনল কাফা। 'কি যেন বললে তুমি, দোস্ত?'

'কথা না বলে থাকতে পারো না?' দাঁতে দাঁত চেপে বলল রানা। 'ছুরিটার ওপর শুয়ে আছি আমি। হাতের দড়ি কাটার চেষ্টা করছি। যদি বাঁচতে চাও, চুপ করে থাকো।'

'ছুরি!'

'খাদের ওপর থেকে পড়েছিল যেটা।'

মরা কাঠের মত নিঃসাড়, নিশ্চুপ হয়ে গেল কাফা। ঝাঁকুনি কমেছে, কিন্তু গতি আরও বেড়ে গেছে গাড়িটার। থেকে থেকে কাফার ঢোক গেলার শব্দ পাচ্ছে রানা।

'হয়েছে?' দেড় মিনিট পর জানতে চাইল কাফা। রানা জবাব না দেয়ায় চুপ

করে গেল। ঘামতে শুরু করেছে সে। রানার নড়াচড়া অনুভব করতে পারছে পরিষ্কার। আটকে রাখা নিঃশ্বাস থেমে থেমে বেরুচ্ছে খানিক পরপর, শব্দ আসছে কানে।

'হয়েছে,' তিন মিনিট পর বলল রানা। 'টুঁ-শব্দ যেন না হয়। এখনও অনেক কাজ বাকি আছে।'

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়ল কাফা। 'কি মুশকিল চিন্তা করো! বাঁচতে হবে জানলে কি এত পাপের কথা স্বীকার করতাম ওঁর কাছে!'

হাত দুটো বাঁধনমুক্ত হলেও দীর্ঘক্ষণ রক্ত চলাচল বন্ধ থাকায় অবশ হয়ে আছে। কিছুক্ষণ ম্যাসেজ করার পর শক্তি ফিরে এল খানিকটা। উঠে বসতে গেলে গার্ডের নজরে পড়ে যেতে হবে। ধীরে ধীরে হাঁটু দুটো ভাঁজ করে বুকের কাছে তুলল ও। ছুরিটা তুলে নিয়ে ডান হাতটা গোড়ালির কাছে নিয়ে গেল। এক মিনিট লাগল দড়িটা কাটতে।

'গড়িয়ে তেরপলের শেষ মাথার দিকে চলে যাও,' কাফাকে বাঁধনমুক্ত করে তার কানে কানে বলল রানা। 'এমন ভাবে গড়াবে দেখে যেন বোঝা না যায় যে হাত-পায়ের বাঁধন খোলা হয়েছে। তারপর যা হোক কিছু একটা বলে চিৎকার করতে শুরু করবে তুমি। দাঁড়াও, কি বলতে হবে তাও বলে দিচ্ছি...বলবে, পেট ব্যথা করছে। ব্যস, তারপর যা করার আমি করব।'

'ঠিক হ্যায়! পরে কিন্তু জানিয়ো আমাকে অভিনয়টা কেমন হলো। ওমর শরীফ আমার হিরো, ওকে আমি টেক্কা দিতে চাই।' একটু বিরতি নিয়ে বলল, 'ছুরিটা আমাকে দেবে নাকি, দোস্ত? গার্ডের কাছাকাছি যাচ্ছি কিনা!'

'না।'

নিঃশব্দে গড়াতে শুরু করল কাফা। দু'হাত সরে গিয়েই চিৎকার জুড়ে দিল সে। 'খোদার কসম বলছি, ভান করছি না...বাবারে! মারে! পেটের যন্ত্রণায় মাথাটা খসে পড়ে যাচ্ছে...,' ভুলটা বুঝতে পেরে পরমুহূর্তে স্থির এবং বোবা হয়ে গেল কাফা। 'অ্যাঁই! কি হচ্ছে!'

আবার চিৎকার করে উঠল কাফা। 'গেছিরে, পেটের ব্যাথায় মরে যাচ্ছি...!'

বুট জুতোর শব্দ পেল রানা। গার্ড ট্রাকের শেষ প্রান্ত থেকে এগিয়ে আসছে কাফার দিকে।

তার স্বরে চিৎকার করছে কাফা। হঠাৎ দু'এক সেকেন্ডের বিরতি নিয়ে শোনার চেষ্টা করছে সে গার্ডের পায়ের আওয়াজ। ওর মাথার কাছে থামল বুট জোড়া, বুঝতে পেরে শক্ত হয়ে গেল পেশীগুলো।

'চুপ কর্, শালা!' ইঞ্জিনের শব্দকে ছাপিয়ে উঠল গার্ডের গলা। 'আবার চেঁচালেই বেয়োনেট গেঁথে দেব বুকে।'

কুঁকড়ে গিয়ে আবার চিৎকার করে উঠল কাফা। দু'হাত দিয়ে মাথাটা বাঁচাবার চেষ্টা করছে সে। তেরপলের বাইরে থেকে রাইফেল কক্ করার শব্দ ঢুকল কানে।

দেখতে না পেলেও অনুভব করল, বেয়োনেটটা ঠিক ওর বুকের উপর তুলে ধরেছে গার্ড, যে-কোন মুহূর্তে নামিয়ে দেবে।

ঠিক তাই, তেরপলের কিনারায় গিয়ে মাথা বের করে উঁকি দিয়ে রানা দেখল। শিকারী বিড়ালের মত নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে এল ও।

অঁ করে একটা যন্ত্রণাক্ত আওয়াজ ঢুকল কাফার কানে। রাইফেলটা পড়ল ঠকাস করে তেরপল বিছানো কাঠের মেঝেতে। দু'সেকেন্ড পর হুড়মুড় করে পড়ল লাশটা। দু'হাত দিয়ে মাথার উপর থেকে তেরপল সরিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ল কাফা। দেখল, গার্ডের কণ্ঠনালী থেকে ছুরিটা হেঁচকা টানে বের করে নিচ্ছে রানা। চাঁদের আলোয় কালো পারদের মত চকচকে রক্ত ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসতে দেখে ঢোক গিলল সে।

আচমকা ব্রেক করল ড্রাইভার। রানাকে জড়িয়ে ধরে তাল সামলাবার চেষ্টা করল কাফা। কাফাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে ড্রাইভিং কেবিনের কাঁচ ঢাকা জানালার দিকে তাকাল রানা। কাঁচটা সরে যাচ্ছে। ফাঁকটা দিয়ে বেরিয়ে এল একটা রিভলভারের নল।

'শুয়ে পড়ো!' চিৎকার করেই ডাইভ দিল রানা। তারপর পিছন দিকে তাকাল। ঝুপ করে বসে পড়ল কাফা। গুলির শব্দ হলো, কাফার মাথার ঠিক উপর দিয়ে বেরিয়ে গেল বুলেটটা। হাঁটু ভাঁজ করে হামাগুড়ি দেয়ার ভঙ্গিতে এক সেকেন্ড স্থির হয়ে রইল রানা, তারপর দু'পায়ের আঙুলগুলোর উপর ভর দিয়ে লাফ দিল লাশটাকে লক্ষ্য করে।

লাশটার পাশে গিয়ে পড়ল রানা। ছোঁ মেরে কোমরের হোলস্টার থেকে বের করে নিল রিভলভারটা। চোখ তুলতেই দেখল ড্রাইভারের পাশ থেকে রিভলভার তাক করছে ওর দিকে ময়নিহান। হঠাৎ লাফিয়ে উঠল ভ্যানটা। নড়ে গেল তার রিভলভার। আধ শোয়া অবস্থা থেকে লাফ দিয়ে জানালাটার একপাশে চলে এল রানা। কাফা যেখানে আগেই পৌঁছেচে ক্রল করে।

ড্রাইভারের ঘাড়ের উপর ঝুঁকে পড়ে ছোট্ট জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করছে ময়নিহান ওদেরকে। দেখতে না পেয়ে নিজের জায়গায় বসল সে। ড্রাইভারকে চিৎকার করে বলছে কিছু।

সন্তর্পণে এগিয়ে গিয়ে জানালা দিয়ে উঁকি দিল রানা। ড্রাইভার ঘনঘন পিছন দিকে তাকাচ্ছে। মাথাটা সরিয়ে নিয়ে জানালার পাশের একটা জায়গা নির্বাচন করল রানা। রিভলভারটা ঠেকাল সেখানে। তারপর গুলি করল।

ফুটো হয়ে গেল কাঠের দেয়াল। হঠাৎ মাতালের মত এদিক থেকে ওদিক, ওদিক থেকে এদিক ঘুরতে শুরু করল গাড়ির নাক। ভুলক্রমে ড্রাইভারকে গুলি করে ফেলেছে ও, ভাবল রানা। উঁকি দিতে যাবে, এমন সময় আবার শান্ত হলো গাড়ি।

গতি বেড়ে গেছে গাড়ির, অনুভব করল রানা। ব্রেক করার আর কোন চেষ্টা করছে না ড্রাইভার। জানালায় উঁকি দিতেই ও দেখল ড্রাইভারের কোলের উপর

মাথা রেখে শুয়ে আছে ময়নিহান। মাথার পিছনের গর্তটা দেখে মনে হলো ওর মুঠো করা একটা হাত ঢুকে যাবে অনায়াসে। রিভলভারটা জানালা দিয়ে গলিয়ে ড্রাইভারের ঘাড়ে ঠেকাল ও। 'গাড়ি থামাও!'

আড়চোখে পিছন দিকে তাকাল ড্রাইভার। তারপর ব্রেক করল। ধীরে ধীরে দাঁড়িয়ে পড়ল ট্রাক।

'রাইফেলটা নিয়ে নেমে যাও,' কাফাকে বলল রানা। 'এখান থেকে কাভার দিচ্ছি আমি। রাস্তায় নামাও ওকে।'

নিচে নেমে গেল কাফা।

'কোনরকম কৌশল না করে নেমে যাও নিচে,' ড্রাইভারকে বলল রানা।

কোলের উপর থেকে ময়নিহানের মাথাটা সরিয়ে দিল ড্রাইভার। তারপর ধীরে ধীরে নামতে শুরু করল।

ট্রাকের পিছন থেকে নিচে নেমে সামনের দিকে ছুটে গেল রানা। ড্রাইভার কান ধরে ওঠ-বোস করছে, একই তালে নিজের মাথাটা ওঠাচ্ছে আর নামাচ্ছে কাফা। 'পিছন ফিরে দাঁড়াও,' ড্রাইভারকে বলল রানা। লোকটা ঘুরে দাঁড়াতে কাফার দিকে তাকাল ও। 'এর আগে কাউকে কখনও একটা মাত্র বাড়ি দিয়ে অজ্ঞান করেছ?' নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করল। কাফা মাথা নাড়তে লাফ দিয়ে ট্রাকের সামনে উঠে পড়ল। দু'হাত দিয়ে লাশটা ধরে ওপাশের দরজা দিয়ে ফেলে দিল নিচে। ড্রাইভিং সীটে বসে ঘাড় ফেরাল ও। 'উঠে এসো...।' লোকটার পিঠ থেকে কাফা টান মেরে বেয়োনেটটা বের করে নিচ্ছে দেখে চোখ কপালে উঠে গেল রানার। 'কাফা!'

'হাতটা পাকিয়ে নিলাম, দোস্ত!' নির্বিকার ভাবে বলল কাফা রানার পাশে উঠে বসে।

কিছু বলতে গিয়েও বলল না রানা। খানিকটা পিছিয়ে গিয়ে ঘুরিয়ে নিল ট্রাকটা। রিস্টওয়াচ দেখল।

পৌনে চারটে বাজে।

সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে ছুটছে ট্রাক। নাবাতিয়ায় পৌঁছুল চারটে পনেরোতে। রাস্তা থেকে চওড়া একটা ফাঁকা মাঠে নামাল রানা ট্রাকটাকে। ক্রমশ উঁচু হয়ে পাহাড়ের দিকে চলে গেছে মাঠের শেষ প্রান্ত থেকে একটা পথ। সিকি মাইলটাক ওঠার পর ব্রেক করল রানা।

'বেরিয়ে আসার জায়গাটা দিয়েই স্টেশনের ভিতর ঢুকব আমি,' বলল রানা। 'তুমি পালাবে, নাকি ফিরবে আমার সাথে?'

'আমি পালাচ্ছিলাম না!' রেগে গিয়ে চিৎকার করে প্রতিবাদ জানাল কাফা। 'স্রেফ বদলি হতে চেয়েছিলাম!'

'বেশ। এখনও কি বদলি হতে চাও? নাকি আমার সাথেই থাকবে?'

'জীবনে কখনও কোন দোস্তকে ছেড়ে যাইনি আমি।'

'তার মানে বলতে চাইছ, স্টেশনে ফিরছ?'

'তা জানি না। তোমার সাথে আছি, ব্যস। স্টেশনেই যদি ফেরো, পুরানো পথটা বেছে নিয়ে বিপদ বাড়াবার কি দরকার? মেইন গেটে গিয়ে বাহাত্তুরে বুড়ো উইং কমান্ডারের সাথে দেখা করতে চাইলেই তো হয়? গার্ডের গুলি খেয়ে মরার ঝুঁকি কি না নিলেই নয়?'

'অত সময় নেই হাতে,' বলল রানা। 'তাছাড়া, উইং কমান্ডার সম্ভবত আমার কথা বিশ্বাস করবে না। তাকে নিয়ে ঝামেলা করার আগে ওদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে হবে ট্রাকগুলো। 'নামো! নেমে সরে দাঁড়াও ট্রাকের সামনে থেকে।'

কাফা নেমে পড়তেই ট্রাকের ব্রেক রিলিজ করে দিয়ে লাফ দিয়ে নিচে পড়ল রানা।

ঝাঁকুনি খেতে খেতে পিছিয়ে যেতে শুরু করল ঢালু পথে ট্রাকটা। পথ ছেড়ে কাঁটাতারের বেড়ার দিকে ছুটল ওরা।

ছয়

পিছনের খাদের তলা থেকে প্রচণ্ড সংঘর্ষের শব্দ ভেসে আসতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ওরা। যেন কত যুগ পেরিয়ে গেছে ট্রাকটাকে ছেড়ে দিয়ে এসেছে, এতক্ষণে সেটা পড়ল শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেছে দু'জনেই। আর কোন শব্দ হয় কিনা শোনার জন্যে দম আটকে রেখেছে রানা। নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করছে চারদিকে গাছের পাতারা, ভোরের বাতাসে মৃদু আন্দোলিত হচ্ছে। কোথাও আর কোন শব্দ নেই। মাত্র সাড়ে তিন ঘণ্টা আগে এই জঙ্গল দিয়ে গেছে ওরা। সময়ের এই ব্যবধানটা আমূল বদলে দিয়েছে গোটা পরিস্থিতি। আর মাত্র একটা কি বড়জোর দেড়টা ঘণ্টা, তারপরই কেয়ামত নেমে আসবে লেবাননের উপর। শত্রুর সৃষ্ট এই কেয়ামতকে প্রতিরোধ করার সম্পূর্ণ দায়িত্ব এখন রানার ঘাড়ে।

নিঃশব্দ পায়ে দ্রুত ঝোপ-ঝাড়ের পাশ দিয়ে এগোচ্ছে রানা। স্টেশনে নিরাপদে প্রবেশ করতে হবে। ভাবছে ও, ছাউনিতে পৌঁছুবার আগে ধরা পড়লে সর্বনাশ হয়ে যাবে। গার্ডদের করপোরাল লোকটার হাতে পড়লে লেবাননকে বাঁচানো তো দূরের কথা, নিজের জানটা বাঁচানোও অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে, কোন সন্দেহ নেই এই ব্যাপারে রানার। সাইয়িদ হাকাম আর নঈম যাকেরের মুখের চেহারা মনে পড়ে গেল। ছাউনিতে পৌঁছুতে পারলেও ঝামেলা কম হবে না। বিশেষ করে সাইয়িদ হাকাম ওকে ব্যর্থ করার চেষ্টায় ত্রুটি রাখবে না। খেলাশেষের ঘণ্টা বাজতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে জামাল আরসালানের সাঙ্গপাঙ্গরা মুখোশ খুলবে একে একে। প্রতি সেকেন্ডে নতুন করে বিপদ দেখা দিলেও অবাক হবে না ও।

চড়াই বেয়ে উঠছে ওরা। কাঁটাতারের বেড়াটা চাঁদের আলোয় পরিষ্কার দেখা গেল সামনে। হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল কাফা। 'ওই যে!' ডান হাতের তর্জনী তুলে সামনের দিকটা দেখাল সে।

কালো একটা মূর্তি। গার্ড। ধীর ভঙ্গিতে টহল দিচ্ছে সে। হঠাৎ থামল সে। ঝুপ করে বসে পড়ল রানা। দেখাদেখি কাফাও।

তারপর ঝোপের উপর ধীরে ধীরে মাথা তুলে উঁকি দিল রানা। দাঁড়িয়ে আছে গার্ডটা। চাঁদের আলোয় চকচক করছে রাইফেলের ধাতব অংশগুলো। কাটা পথটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রানা। হঠাৎ ওদের দিকে মুখ ফেরাল গার্ড। ঝাড়া প্রায় পনেরো সেকেন্ড একনাগাড়ে চেয়ে রইল সে। তারপর মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে হাঁটতে শুরু করল সেন্ট্রিদের দিকে। আগের চেয়ে একটু যেন দ্রুত হাঁটছে সে, সন্দেহ হলো রানার। পরমুহূর্তে ভাবল, হয়ত মনের ভুল।

ধীরে ধীরে দূরে সরে যাচ্ছে লোকটা। ঠিক অদৃশ্য হবার আগে চাঁদের আলো পড়ে আর একবার ঝিলিক দিয়ে উঠল তার রাইফেলের বেয়োনেট।

'কম্মটা বহুত কঠিন লাগছে, দোস্ত! অপরাধ করার চেয়ে তা সংশোধন করতে যাওয়া দেখছি বেশি ঝামেলার কাজ!'

'ঠিক,' বলল রানা, 'কিন্তু ধরা না পড়ার সবরকম চেষ্টা করব আমরা। অন্তত একজনকে ছাউনিতে পৌঁছুতেই হবে। কাফা, দু'জন দু'দিক থেকে বেড়া টপকাবার চেষ্টা করব। তুমি আগের ফাঁকটা খুঁজে বের করো। আমি নতুন একটা জায়গায় বেড়া কাটব।'

'তুমি যা বলো, দোস্ত! কিন্তু, ছাউনিতে আমিই যখন পৌঁছাচ্চি, কি করতে হবে বলে দাও আমাকে। তোমাকে গার্ডদের কবল থেকে উদ্ধার করার চেষ্টা করব আগে, নাকি…।'

রানা আবিষ্কার করল, হাসি পাচ্ছে না ওর। 'আমি মরি বাঁচি সে ব্যাপারে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। সোজা অপারেশন কন্ট্রোলরুমে যাবে তুমি। ওখানে অফিসার যাকে সামনে পাবে প্রথম তাকেই সব কথা খুলে বলবে। যা নিজের চোখে দেখেছ আর নিজের কানে শুনেছ তাই বলবে। বেশি রঙ চড়াতে যেয়ো না, কেননা গুলিয়ে ফেললে কেউ তোমার কথা বিশ্বাস করবে না। কিন্তু, পৌঁছুবার আগেই যদি গার্ড দেখে ফেলে থামতে বলে, দৌড়ে পালাবার চেষ্টা কোরো না। গুড লাক, কাফা। আর, দু'জনই যদি নির্বিঘ্নে বেড়া টপকাতে পারি, ছাউনিতে গিয়ে দেখা হবে আবার।'

'কিন্তু বেড়া কাটতে হবে তোমাকে। তাই না? সুতরাং ছাউনিতে তোমার সাথে দেখা হবার কোন আশা নেই। আমার পথটা রেডিমেড, আমাকে ধরে কোন্ শালা!'

'প্ল্যায়ার্সটা ফেলে গিয়েছিলে তুমি, সেটা তুলে একটা গাছের নিচে রেখে গেছি…দাঁড়াও এখানে।' চারদিক দেখে নিয়ে একটা পাইন গাছের দিকে এগোল রানা। 'পেয়েছি।'

'করপোরালের সাথে বেশি তর্ক কোরো না, দোস্ত। দুশ্চিন্তা কোরো না, সবাইকে নিয়ে আসব আমি তোমাকে উদ্ধার করতে।'

মাথা নিচু করে ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর দিয়ে দ্রুত এগোতে শুরু করল রানা। গজ

বিশেক এগিয়ে থামল ও। পিছন দিকে তাকিয়েই কাফাকে দেখার চেষ্টা করল। চোখে পড়ল না। কোন শব্দই নেই তার। ইতিমধ্যে ফাঁকটা গলে ওপারে পৌঁছে গেছে কিনা বুঝতে পারল না। উপরে উঠতে শুরু করল এবার ও। বিশ গজের মত দূরে কাঁটাতারের বেড়া। একটু একটু করে এগিয়ে সামনে গিয়ে দাঁড়াল ও। হাত বাড়ালেই ছুঁতে পারবে এখন। পকেট থেকে প্ল্যায়ার্সটা বের করেই স্থির পাথর হয়ে গেল শরীরটা। পাঁচ হাত সামনে ঠিক যেন আকাশ থেকে পড়ল একজন গার্ড। নিস্তব্ধ রাত, নিঃশ্বাসের শব্দ পাচ্ছে রানা। পেশীগুলো টান টান হয়ে আছে তার। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ঘাড়টা ধীরে ধীরে আশ্চর্য সাবধানতার সাথে চারদিকে ঘুরিয়ে কি যেন দেখার চেষ্টা করছে সে। রাইফেলটা দু'হাত দিয়ে ধরে তৈরি হয়ে থাকার ভঙ্গিটা দেখে বুঝতে বাকি থাকল না, কিছু একটা আঁচ করতে পেরেছে।

নৈরাশ্যে দমে গেল মন। লক্ষণ শুভ নয়। নির্বিঘ্নে অল্প সময়ের মধ্যে বেড়া টপকানো অসম্ভব। দ্রুত ভাবছে রানা। কি করা যেতে পারে! কাফাই এখন শেষ ভরসা ওর। সে যদি ইতিমধ্যে বেড়া টপকে থাকে···। চিন্তায় বাধা পড়ল। গার্ডটা আবার হাঁটতে শুরু করেছে।

তিন পা এগিয়ে আবার হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল সে। পিছন দিকে তাকাল। ইতস্তত করল দু'সেকেন্ড। তারপর ঘাড় সোজা করে নিয়ে হাঁটতে শুরু করল আবার।

নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল রানা। এক হাত সামনে কাঁটাতারের বেড়া। ওপারে সরু পথ, দুদিকে চলে গেছে। বাঁ দিকের পথটা ক্রমশ নেমে গেছে নিচের দিকে। তারপর আবার উঠেছে পঁচিশ ত্রিশ গজ দূরে। সেদিকে তাকিয়ে আছে রানা। এতক্ষণে নিচের পথ থেকে ওদিকের উঁচু পথে পৌঁছে যাবার কথা গার্ডের। চাঁদের আলোয় অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ঝোপ-ঝাড়গুলো। কিছুই নড়ছে না।

হঠাৎ ঝুপ করে বসে পড়ল রানা। ডানদিকে পায়ের শব্দ। সামনে কয়েকটা পাতার আড়াল, সরাবার সাহস হলো না ওর। পরিষ্কার বুটজুতোর আওয়াজ শুনেছে ও। খুব কাছে। দাঁড়িয়ে পড়েছে লোকটা। দেখতে পেয়েছে কাফাকে?

আরও দুটো মূল্যবান মিনিট। ভাবছে রানা। দ্রুত কেটে যাচ্ছে সময়। পাতার ফাঁক দিয়ে দৃষ্টি ফেলে কিছুই দেখতে পেল না ও। ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক মাথার উপরে ডাল থেকে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে একটা পাখি ডেকে উঠতে। আঙুল দিয়ে পাতা সরিয়ে তাকাল রানা। ছয় কি সাত হাত দূরে এক জোড়া বুট চাঁদের আলোয় চকচক করছে। মুখটা নামাতে শুরু করল রানা। শুয়ে পড়ল ও। একদিকের গাল ঘাস স্পর্শ করল। পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে এখন ও গার্ডের। ঘাড় ফিরিয়ে অন্য দিকে চেয়ে আছে সে। ঠিক কাফা যে জায়গায় বেড়াটা টপকাবে।

শুয়ে অপেক্ষা করছে রানা। কতক্ষণ ওভাবে আছে ও বলতে পারবে না এখন আর। হাত তুলে রিস্টওয়াচ দেখার ঝুঁকিটা নিতে পারছে না। পুবাকাশ ফর্সা হয়ে আসছে। লোকটা একচুলও নড়েনি তার জায়গা ছেড়ে।

শুকনো ঘাসের গন্ধ পাচ্ছে রানা। ধারাল ঘাসের ডগা খোঁচা মারছে চোখের

নিচে, কপালে। চুলকাবার জন্যে হাত তুলতে পারছে না। কাফার কথা ভেবে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল ও। সে-ও ওর কাছ থেকে বিশ গজ ডান দিকে এইভাবে অপেক্ষা করছে সম্ভবত।

অবশেষে পা তুলল গার্ডটা। প্রথম গার্ডটা যেদিকে চলে গেছে খানিক আগে সেদিকে এগোচ্ছে সে। পাঁজরের গায়ে বাড়ি খাচ্ছে হৃৎপিণ্ড, অনুভব করছে রানা। অস্থিরতা বাড়ছে ক্রমশ। উত্তেজনায় টান টান হয়ে আছে পেশীগুলো। একটা হাহাকার ভাব গ্রাস করছে ওকে। সকাল হতে দেরি নেই আর।

ঠিক রানার মাথার কাছে এসে থামল গার্ড। অলস ভঙ্গিতে আর একবার তাকাল পিছন দিকে। তারপর আবার হাঁটতে শুরু করল। থামল না আর। প্রথম গার্ডটার পথ ধরে নিচে নেমে গেল সে।

প্লায়ার্স দিয়ে নিচের দুটো তার কেটে ফেলল রানা। গার্ডটা তখনও গর্তের ওপ্যারের রাস্তায় ওঠেনি, আরও দুটো তার কেটে দুটো দিক দশ সেকেন্ড ধরে দেখে নিল। ফাঁকটা বেশ বড়ই হয়েছে। মাথাটা গলিয়ে দিয়ে দুটো দিক আরও একবার দেখে নিল ও। কাউকে দেখা যাচ্ছে না। ডান পা-টা ফাঁক দিয়ে গলিয়ে ওপারের মাটিতে রাখল ও। বাঁ পা-টা তুলতে যাবে, এমন সময় টর্চের আলো পড়ল মুখে

'হল্ট! কে ওখানে?'

সাত

পাথর হয়ে গেল রানা। তীব্র আলোয় কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। একটু নড়লেই গুলি করবে গার্ড। বেড়ার ফাঁকের মাঝখানে ওর পিঠ। একটা পা এপারে, আরেকটা পা ওপারে। একটু নড়লেই তারের সাথে ছোঁয়া লাগবে। বিদ্যুৎ টেনে নিয়ে পোড়া কাঠ করে ফেলবে শরীরটাকে। নিতম্বের কাছ থেকে ঠাণ্ডা একটা স্রোত শিরদাঁড়া বেয়ে উপরে উঠছে, অনুভব করছে রানা। ব্যথা করছে ঘাড়টা। বুকের ভিতর লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ড। পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে ও ছুটন্ত বুট জুতোর আওয়াজ।

অসহায় লাগছে নিজেকে। করার কিছুই নেই এখন ওর। মাথা তুলে দশ হাতের বেশি দেখতে পাচ্ছে না। আর আধ ইঞ্চি তুললে তারের সাথে ঠেকবে ঘাড়টা। দৃষ্টি সীমার মধ্যে বুট জোড়া পৌঁছুল। পা থেকে হাঁটুর উপর পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে রানা। পাঁচ হাত সামনে এসে দাঁড়িয়েছে লোকটা।

'কে তুমি? এখানে করছ কি?'

ফোঁটা ফোঁটা ঘামে ভরে গেছে রানার মুখ। মাথা ঝাড়া দিয়ে সেগুলো ঝরাতে গিয়েও সামলে নিল নিজেকে।

'আগে আমাকে বেরুতে দাও,' একচুল না নড়ে বলল রানা। 'কারেন্ট চলছে তারে, ছোঁয়া লাগলেই...।'

'খবরদার!' রাইফেলের নলটা দেখতে পেল রানা দুই হাত দূরে। ওর নাকের

মাঝখানে চেয়ে আছে নলটা লোলুপ দৃষ্টিতে। 'নড়লেই গুলি করব। আগে পরিচয় দাও, কে তুমি?'

দাঁতে দাঁত চেপে পিঠটাকে স্থির রাখার চেষ্টা করছে রানা। নিজের অজান্তে ঘাড়টা নেমে আসছে নিচের দিকে। টের পেয়ে আবার তুলে শক্ত করে রাখছে ও। 'নাবাতিয়া স্টেশনের একজন গানার আমি,' বলল; 'স্টেশন ছেড়ে পালিয়েছিলাম। এখান থেকে খানিক উঠলেই আমার গানপিট দেখতে পাওয়া যায়। পালিয়ে যাবার এবং ফিরে আসবার উপযুক্ত কারণ আছে, কিন্তু এই অবস্থায় তা আমি ব্যাখ্যা করতে পারি না। আমাকে যে-কোন একদিকে সরে গিয়ে সিধে হয়ে দাঁড়াতে দাও।'

'না,' গার্ডের মুখ দেখতে পাচ্ছে না রানা। কিন্তু লোকটা হাসছে বলে মনে হল ওর। 'আগে সম্পূর্ণ পরিচয় জানাও আমাকে। মাসুদ রানা?'

'হ্যাঁ।'

'আজ রাতেই পালিয়েছিলে?'

লোকটা গুলি করবে কিনা নিশ্চিত ভাবে বুঝতে পারছে না রানা। ফাঁক থেকে বেরিয়ে পড়ার প্রচণ্ড ব্যাকুলতাটাকে দমন করতে কষ্ট হচ্ছে ওর। এভাবে আর কতক্ষণ? যে-কোন মুহূর্তে তারের সাথে ছোঁয়া লেগে যেতে পারে। শরীরটাকে বশে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ছে।

'প্রতিটি সেকেন্ড এখন লেবাননের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ,' বলল ও, 'তুমি অযথা সময় নষ্ট করছ। এর জন্যে তোমাকে প্রাণ দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। গুলি করতে চাও করো, আমি ওপারে যাচ্ছি।'

'গুলি করছি কিন্তু!' গর্জে উঠল লোকটা। 'ওসব ফালতু ওজর আমি শুনতে চাই না। আগে আমার সব প্রশ্নের উত্তর চাই আমি। যে পথে পালিয়েছিলে সে-পথ দিয়ে ঢুকছ না কেন শুনি?'

ব্যথায় টন টন করছে পিঠটা। উত্তর দিতে দেরি দেখে গার্ড আবার কথা বলে উঠল। 'তার মানে, আরও একজন আছে তোমার সাথে। তোমরা দু'জনই কি পালিয়েছিলে?'

দ্রুত ভাবছে রানা। ও ধরা পড়ে গেছে। এখন একমাত্র ভরসা কাফা। গার্ডকে ভুল বুঝিয়ে তাকে ছাউনিতে যাবার সুযোগ করে দিতে হবে।

'পালিয়েছিলাম দু'জন এক সাথে,' বলল ও। 'কিন্তু ফিরে এসেছি একা। বেড়ার ফাঁকটা খুঁজে পাইনি, তাই…।'

'মিথ্যে কথা বলার জায়গা পাওনি! এখান থেকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি আমি ফাঁকটা, আর তুমি কিনা…।'

ঝুঁকিটা নিতেই হবে। সকল দ্বিধা কাটিয়ে উঠল রানা। ফাঁকটা গলে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে ও।

'সাবধান! গুলি করার নির্দেশ আছে আমার ওপর…।'

'করো,' শান্ত গলায় বলল রানা। ট্রিগারে চেপে বসা আঙুলটা দেখতে পাচ্ছে

ও, সাদা হয়ে গেছে তর্জনীর নখ। ভুলে থাকার চেষ্টা করল সে ভয়ঙ্কর বিপদটা। পিঠ বাঁকা করে ফাঁক দিয়ে গলিয়ে দিল। তারপর বাঁ পা-টা।

কিছুই ঘটল না। সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে তাকাল রানা। তড়াক করে লাফ দিয়ে এক পা পিছিয়ে গেছে গার্ড, রাইফেলের নলটা ওর দিক থেকে সরে গেল। 'হল্ট!'

গার্ডের দৃষ্টি অনুসরণ করে বিশ গজ দূরের একটা ঝোপকে দুলতে দেখল রানা।

'দেখে ফেলেছি!' গার্ড হুঙ্কার ছাড়ল। 'তিন পর্যন্ত গুনব, বেরিয়ে না এলে গুলি করব আমি।'

মাথার উপর হাত তুলে ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল কাফা। তিন সেকেন্ড দাঁড়িয়ে রইল সে। তারপর হঠাৎ ছুটতে শুরু করে দিল।

মুহূর্তের জন্যে আতঙ্কে কেঁপে উঠল রানা। পরমুহূর্তে বিদ্যুৎবেগে লাফ দিয়ে রাইফেলের নলের সামনে বুক পেতে দাঁড়াল ও। 'না! ও আমার সঙ্গী। গুলি কোরো না!' গুলি করছে কিনা দেখার সুযোগটা হারিয়ে ঝট্ করে পিছন দিকে তাকাল ও। 'কাফা!' চিৎকার করে উঠল। 'দাঁড়াও।'

থমকে দাঁড়াল কাফা। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল।

হাত নেড়ে ডাকল তাকে রানা। 'এদিকে এসো। কুইক!' গার্ডের দিকে ফিরল ও। 'একটা ভুল করলে জীবন দিয়েও তা সংশোধন করতে পারবে না তুমি। দাঁড়াও, ওকে আমি বুঝিয়ে শুনিয়ে নিয়ে আসছি।'

ইতস্তত করছে কাফা। লুকাবার জায়গা নেই তার। ছুটতে হবে তাকে উপর দিকে। গার্ডের বুলেট ব্যর্থ হবার কোন সম্ভবনাই নেই।'

'যা বলছি শোনো!' চিৎকার করে বলল রানা। 'ভয় পেয়ে কিছু করতে যেয়ো না। চলে এসো এখানে।' আড়চোখে লক্ষ করল ও, রাইফেল ধরা হাত দুটো মৃদু মৃদু কাঁপছে গার্ডের।

হাঁটতে শুরু করল কাফা। আসছে সে। চোখের কোণ থেকে রানা দেখল, শিথিল হয়ে যাচ্ছে গার্ডের পেশী। তীক্ষ্ণ চোখে দেখছে সে কাফাকে। তার দিকে সরাসরি তাকাল রানা। 'দেখলে তো! গুলি করলে কি হত বলো দিকি?' ওর ডান হাতের ঘুসিটা বাঁ চোখের উপর পড়ল গার্ডের, বাঁ হাত দিয়ে রাইফেলটা সরিয়ে দিল কাফার দিক থেকে। ট্রিগারে চাপ পড়ে কান ফাটানো শব্দে বেরিয়ে গেল বুলেটটা কাফার অনেক দূর দিয়ে। হাঁটু ভাঁজ করে গার্ডের তলপেটে গুঁতো মারল রানা। কাফা তিন লাফে চলে এসেছে কাছে। ছোঁ মেরে রাইফেলটা কেড়ে নিল সে।

টলছে গার্ড। রাইফেলটা উল্টো করে ধরা কাফার হাতে। পেটে গুঁতো মেরে গার্ডকে মাটিতে ফেলে দিল সে। খাপ সরিয়ে বেয়োনেটটা বের করে লোকটার বুকের উপর তুলল।

কড়াৎ করে বজ্রপাতের মত শব্দ করল কানের কাছে থ্রী নট থ্রী। চোখের পলকে রানা দেখল কাফা খালি হাতে দাঁড়িয়ে আছে, রাইফেলটা তিন হাত দূরে ঘাসের উপর পড়ে রয়েছে। পরমুহূর্তে ঝুপ করে বসে পড়ল কাফা। অজ্ঞান গার্ডের পকেট

হাতড়াচ্ছে সে।

'নড়লেই উড়িয়ে দেব মাথার খুলি!' ওদের পিছন থেকে বলল কেউ। 'মাথার ওপর হাত তোলো! যা বলবার একবার বলব, দ্বিতীয়বার কথা বলবে বুলেট।'

ঠোঁট কামড়ে রক্ত বের করে ফেলছে রানা। এত চেষ্টা, সব ব্যর্থ! ভাবছে ও। শেষ রক্ষা করা গেল না। তাঁবুতে যেতেই হবে এখন। সেখানে করপোরাল··· ছাউনিতে পৌঁছানো সম্ভব বলে বিশ্বাস করতে পারছে না এখন আর ও। দু'হাত মাথার উপর তুলতে তুলতে উদভ্রান্তের মত পিছন দিকে তাকাল। আকাশ ফর্সা হয়ে গেছে। দু'জন লোক দাঁড়িয়ে আছে ওদের দশ হাত পিছনে। একজন গার্ড, অপর জন···নঈম যাকেরকে চিনতে পেরে একটুও বিস্মিত হল না ও। আবছা অন্ধকারে সাদা দাঁত দেখা যাচ্ছে তার।

নঈম যাকের হাসছে। গার্ড এগিয়ে এল। তাকে অনুসরণ করল সে। 'ফালাঞ্জিস্টরাই ইসরায়েলের হয়ে লেবাননের সাথে দুশমনী করছে বলে জানতাম, তুমি রানা একজন প্যালেস্টাইনী আর তুমি কাফা একজন লেবানীজ হয়ে···' কাঁধ ঝাঁকাল সে, 'বিশ্বাস করা কঠিন।' গার্ডের দিকে তাকাল সে। 'করপোরালের কাছে নিয়ে গিয়ে আর কি হবে? খুলি দুটো এখানেই ফুটো করে দিতে পারো।'

'আর কে আছে তোমাদের সাথে?' জানতে চাইল গার্ড। লোকটা স্থির স্বভাবের, সহজে উত্তেজিত হয় না, ভাবল রানা।

'সেন্ট্রি,' কণ্ঠস্বরে যতটা সম্ভব জরুরী ভাব ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করল রানা, ইতিমধ্যেই অনেক মূল্যবান সময় নষ্ট হয়েছে। প্রতিটি সেকেন্ড এখন লেবাননের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ। এক সেকেন্ডের হেরফেরে এই দেশটা বারুদের একটা স্তূপের মত জ্বলে উঠতে পারে। আমার অপরাধের বিচার যদি করতেই হয়, তা করবে আমাদের ডিটাচমেন্ট কামান্ডার গওহর জুমলাত। আমি চাই আমাদেরকে তার কাছে ছাউনিতে নিয়ে যাওয়া হোক। এবং তা···,' পুবাকাশের দিকে তাকাল রানা। দিনের আলো ফুটতে শুরু করেছে ইতিমধ্যে। '···এখুনি।'

মন্থর ভঙ্গিতে এদিক ওদিক মাথা দোলাল গার্ড। 'সে অধিকার আমার নেই। তোমাদেরকে করপোরালের হাতে তুলে দিতে হবে আমার, আমার দায়িত্ব সম্পর্কে আমি পুরো সচেতন, এ ব্যাপারে জ্ঞান দান করার চেষ্টা কোরো না।' একটু বিরতি নিয়ে বলল, 'আবার আমি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, একটা কথা দু'বার বলব না আমি, দ্বিতীয়বার কথা বলবে রাইফেলের বুলেট। মাথার ওপর হাত!'

এতক্ষণে উঠে দাঁড়িয়ে মাথার উপর হাত তুলল কাফা।

'কুইক মার্চ!'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও পা বাড়াল রানা। খিক খিক করে হেসে উঠল নঈম যাকের। বলল, 'ক্রমেই জড়িয়ে জটিল হয়ে উঠছে জাল, ছিঁড়ে বেরুতে পারবে সে আশা নেই, রানা!'

'তুই শালা···।' হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল কাফা। হঠাৎ খাদে নেমে গেল তার কণ্ঠ।

'দোস্ত, যে অপরাধ করেছি তার শাস্তি যে কি, জানি। শহর থেকে এই মিষ্টির বাক্সটা কিনেছি, তুই আমার মাথা খাবি, এটা যদি তোর ভাবীর কাছে না পাঠাস,' পকেট থেকে বের করে একটা বাক্স ধরিয়ে দিল সে যাকেরের হাতে। তারপর শার্টের আস্তিন দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে অনুসরণ করল রানাকে।

পাঁচ হাত এগোবার পর পিছন থেকে দু'হাত দিয়ে ধাক্কা মারল কাফা রানাকে। দু'জন একসাথে পড়ল ঘাসের উপর। পরমুহূর্তে প্রচণ্ড শব্দে ফাটল গ্রেনেডটা। থরথর করে কেঁপে উঠল বুকের নিচে মাটি।

ঘাড় ফিরিয়ে রানা দেখল নঈম যাকের নেই। কোথাও নেই। কাছাকাছি একটা ঝোপের মাথায় মুকুটের মত শুধু শোভা পাচ্ছে তার খুলিটা।

এক চুল নড়ছে না গার্ড। আগের জায়গায় আগের মতই পাথর হয়ে আছে সে। 'দাঁড়াও!' অদ্ভুত চাপা স্বরে নির্দেশ দিল।

পাঁজরে দ্রুত বাড়ি মারছে হৃৎপিণ্ড, অনুভব করছে রানা। গলা শুকিয়ে গেছে ওর। মুখের ভিতর জিভটা শুকনো কাগজের মত ঠেকল। ধীরে ধীরে দাঁড়াল ও। যন্ত্রচালিতের মত আগেই দাঁড়িয়েছে কাফা।

ডানপাশে মাত্র ছয় হাত দূরে গার্ড। কাফাকে ঢোক গিলতে দেখে তার মানসিক অবস্থাটা অনুভব করতে পারল রানা। বুকের দিক থেকে তুলে কাফার মাথার দিকে রাইফেল তাক করল গার্ড।

প্রচুর সময় নিল সে লক্ষ্য স্থির করতে। কিছু বলতে গিয়ে রানা উপলব্ধি করল, গলা থেকে আওয়াজ বেরুচ্ছে না ওর। তাছাড়া, ভাবল ও, কথা বলা এখন বৃথা। কারও দোহাই শুনবে না এখন লোকটা।

অসহায় চোখে ঘনঘন তাকাচ্ছে কাফা রানার দিকে। মরিয়া হয়ে উঠছে রানা মনে মনে। পরিষ্কার বুঝতে পারল ও, ইতস্তত করছে গার্ড। লক্ষ্যস্থির করতে পারছে না সে। দুর্বোধ্য ঠেকল ব্যাপারটা ওর কাছে।

'দোস্ত!' কাফা করুণ স্বরে ডাকল একবার।

কিছু একটা করতে হবে। ভাবছে রানা। কিন্তু কি? এখন বাধা দিতে যাওয়া আত্মহত্যা করার শামিল। বাধা দিতে না যাওয়াটাও কি তাই নয়?

গার্ডের দিকে তাকিয়ে আবার সেই ব্যাপারটা লক্ষ করল রানা। ইতস্তত ভাবটা কাটিয়ে উঠতে পারছে না সে।

হঠাৎ রানা অনুমান করতে পারল ব্যাপারটা। ঠিক সেইসময় গুলি করল গার্ড

ওর অনুমান মিথ্যে নয়। রানা দেখল, কাফা দাঁড়িয়ে আছে। ঠক-ঠক করে কাঁপছে সে। তার মাথায় এখন আর সাদা কাপড়ের পট্টিটা দেখা যাচ্ছে না।

'খুন করার অর্ডার নেই,' বলল গার্ড। 'থাকলে তাই করতাম। ঘুরে দাঁড়াও। মাথার ওপর থেকে হাত যেন নামতে না দেখি। কুইক মার্চ!'

দশ কদম এগোতে না এগোতে পাঁচজনের একটা দলের মুখোমুখি হলো ওরা। দু'মিনিটের মধ্যে তাঁবুর সামনে পৌছে গেল তারা ওদের দু'জনকে নিয়ে।

'করপোরাল! করপোরাল!' কয়েকজন মিলে তাঁবুর ভিতর ঘুম ভাঙাচ্ছে করপোরালের।

'ব্যাপার কি? বেগিনের হাঁচি শুনে ভয় পেয়েছ নাকি?' সদ্য ঘুম থেকে জেগে ওঠা করপোরালের ঝাঁঝ মেশানো কণ্ঠস্বর শুনে আশ্চর্য একটা আশা জেগে উঠল রানার মনে। শ্রবণ এবং স্মরণশক্তি বেঈমানী না করলেই হয় এখন।

চোখ কচলাতে কচলাতে তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এল করপোরাল। শ্রবণশক্তি বেঈমানী করেনি, লোকটাকে দেখে চিনতে না পেরে ভাবল রানা। সাইয়িদ হাকামের সঙ্গে যাকে দেখেছিল ও এ-লোক সে নয়, এ আরেকজন করপোরাল। 'এসব সত্যি? স্টেশন থেকে পালিয়েছিলে তোমরা? ফেরার সময় একজনকে খুন, একজনকে প্রায় খুন করেছ?'

'সত্যি,' সময় বাঁচাবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে রানা। 'কিন্তু এসব করার যথেষ্ট সঙ্গত কারণ আছে। করপোরাল, আমি গোটা লেবাননকে বাঁচাবার চেষ্টা করছি।'

অবাক হয়ে চেয়ে রইল করপোরাল। যেন রানার ভাষা বোঝেনি সে। নিস্তব্ধতা জমাট বাঁধছে দেখে তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করল, 'নাম এবং নম্বর?'

'মাসুদ রানা,' তারপর কাফাকে দেখিয়ে বলল, 'হুসাইন কাফা।'

পকেট থেকে পরিচয় পত্র আর অ্যারোড্রোমের নাম বের করে দেখাল রানা। কাফাও।

'হুঁ,' বলল করপোরাল। গার্ডদের দিকে তাকাল সে। 'এদেরকে তাঁবুতে নিয়ে গিয়ে বেঁধে রাখ। দু'জন সারাক্ষণ পাহারায় থাকবে।'একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল সে সশব্দে, যেন বিরাট একটা সমস্যার সমাধান করে ভারমুক্ত হল।

'কিন্তু,' গলা ভিজিয়ে নিয়ে বলল রানা। 'করপোরাল।'

'কোন কথা নয়!' কড়া গলার ধমক খেল রানা। সকাল দশটায় ডিউটি অফিসার আসবেন, যা বলার তাকেই বোলো। আমার বরাদ্দ সময়টুকু আমি ঘুমাব।'

পাঁচজন গার্ড ওদেরকে ঘিরে রেখেছে। পাঁচটা রাইফেলের নল ওদের দিকে তাক করা।

'অসম্ভব!' দু'কোমরে হাত রেখে বলল রানা। 'আমি এই মুহূর্তে সার্জেন্ট গওহর জুমলাতের সাথে দেখা করতে চাই!'

'না।' কণ্ঠে দৃঢ়তার ছাপ করপোরালের। 'তার সাথে দেখা করব আমি। তোমরা যদি সত্যিই গানপিটের লোক হও, তাহলে তাকে জানাব যে দয়া করে তোমরা ফিরে এসেছ। এমন কি সার্জেন্টের হাতে তোমাদেরকে তুলে দিতেও বাধ্য নই আমি। বেশি তেড়িবেড়ি করলে আমি সরাসরি রিপোর্ট করব হেডকোয়ার্টারে। নিয়ম মাফিক তারপর যা হবার হবে। মনে রেখো, তোমরা আমার বন্দী। অবৈধ ভাবে পালিয়ে যাওয়া, ফিরে আসা ছাড়াও একজন গানারকে খুন করার অপরাধ তোমরা নিজেরাই স্বীকার করেছ। এই অবস্থায় তোমাদের কোন অনুরোধই আমি

কানে তুলতে পারি না।'

'করপোরাল,' আশ্চর্য শান্তভাবে বলল রানা, 'লেবাননের ওপর একটা মহা বিপদ নেমে আসছে। ব্যাপারটা কল্পনা বা অনুমান নয়। আমার কাছে তথ্য আছে। এবং একমাত্র আমি ছাড়া আর কেউ জানে না সত্যি কি ঘটতে যাচ্ছে। বিপদটা সম্পর্কে কর্তৃপক্ষকে সাবধান করলেই শুধু চলবে না, এই মুহূর্তে শত্রুকে প্রতিরোধ করার ব্যবস্থা নিতে হবে। দেরি হয়ে গেলে সর্বনাশটা ঠেকানো যাবে না। লেবাননকে বাঁচাতে হলে যা করার আগামী বিশ মিনিটের মধ্যে করতে হবে। আমি আবার বলছি, সার্জেন্ট গওহর জুমলাতের সাথে আমার দেখা করার ব্যবস্থা করুন। এখুনি।'

'আমার কর্তব্যে আমি অটল,' করপোরাল বলল। 'তোমার কোন কথাই আমি শুনছি না।' গার্ডদের দিকে ফিরল সে। 'ওদেরকে বেঁধে ফেলে রেখো তাঁবুতে। তোমাদের ওপর অর্ডার রইল, বাধা দিলে যেকোন ব্যবস্থা নিতে পারবে, এমন কি গুলি করতেও ইতস্তত করবে না। আমি হেডকোয়ার্টারে যাচ্ছি।'

বলল, কিন্তু নড়ল না করপোরাল। রানার দিকে তীক্ষ্ণ নজর তার। হাতটা ধীরে ধীরে কোমরে বাঁধা হোলস্টারে গিয়ে ঠেকল। রানার মুখের ভাব দেখে কিছু একটা আশঙ্কা করতে পারছে সে।

'এখুনি গুলি খেয়ে মরার ইচ্ছা থাকলে বাধা দাও ওদেরকে,' সাবধান করে দিয়ে বলল করপোরাল।

পাঁচজন গার্ডকে এগিয়ে আসতে দেখে শক্ত হয়ে উঠল রানার মুখ। আড়চোখে দেখে নিল দু'পাশ। অঝোরে পানি নামছে কাফার দু'চোখ থেকে। তার কাছ থেকে কোনরকম সাহায্য পাওয়ার আশা করা বৃথা।

ওদেরকে ঘিরে এগিয়ে আসছে গার্ডরা। দু'জন হাতের রাইফেল কাঁধে ঝুলিয়ে নিল। রানার দিকে বাকি তিনজন রাইফেল তাক করে এগিয়ে আসছে। কাফাকে গুনতির মধ্যে ধরছেই না তারা। একজন পিছনে চলে গেল রানার। একজন ডান পাশে। আর একজন রানার সামনে। তিনটে রাইফেলের নল ওর শরীরের কাছ থেকে আধ হাত দূরে।

দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় কঠোর হয়ে উঠেছে রানার মুখ। এদের হাতে বন্দী থাকতে চাইছে না ও, যে-কোন মূল্যে মুক্তি পেতে চায় এই মুহূর্তে—বুঝতে পারছে সবাই।

'সাবধান!' চাপা কণ্ঠে সতর্ক করে দিল গার্ডদেরকে করপোরাল।

সামনের রাইফেলটার নল ধরল রানা ডান হাত দিয়ে, ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল বুকের কাছ থেকে। বিপদকে তোয়াক্কা না করে এক পা এগোল ও। তিনদিক থেকে রাইফেলের নল ঠেকল ওর শরীরে। রাগে, উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠেছে মুখটা। নিজের কণ্ঠস্বরকে বশে রাখতে পারছে না ও। 'এই, গাধার বাচ্চা! কথার গুরুত্ব বুঝিস না কেন? এই শেষবার বলছি, গুলি করতে চাস কর, কিন্তু আমাকে এখানে আটকে রাখতে পারবি না...' নিজেই অবাক হচ্ছে রানা নিজেকে এমন চিৎকার

করতে নে।

স্তম্ভিত হয়ে গেছে করপোরাল। রানাকে কাঁপতে দেখে, সম্বোধনের ভাষা শুনে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে সে। 'দেখ গানার···।'

'ইউ সান-অফ-এ বিচ, শাট আপ!' রানার কণ্ঠ থেকে বজ্রপাত ঘটল যেন। 'এক মিনিটের মধ্যে যদি সার্জেন্ট জুমলাতের সাথে আমার দেখা করার ব্যবস্থা না করিস, তোকে আমি নির্ঘাৎ খুন করব। কেন, তাও শুনে রাখ।' গলার পাশে রগগুলো ফুলে উঠেছে রানার। ঘামে ভরে গেছে মুখ, কপাল। 'আজ সকালে আমাদের এই নাবাতিয়া এবং লেবাননের অন্যসব গুরুত্বপূর্ণ এয়ারফাইটার স্টেশনে ইসরায়েলি প্যারাট্রুপার নামতে যাচ্ছে। অ্যারোড্রোমে ল্যান্ড করার যে-কোন স্বাভাবিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য, কিন্তু ইসরায়েলি গুপ্তচরেরা বিশেষ আয়োজন করেছে, যার ফলে অনায়াসে প্যারট্রুপ নিয়ে প্রতিটি এয়ারফাইটার স্টেশনে একের পর এক প্লেন নামতে পারবে। এই মুহূর্তে আমাদের এই স্টেশনের ভিতর ঢুকছে বা অনুমতি পাবার জন্যে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছে তিনটে কি চারটে ট্রাক। গায়ে L.A.F.-এর ছাপ মারা থাকলেও আসলে ওগুলোর সাথে লেবানন এয়ারফোর্সের কোন সম্পর্ক নেই। প্রতিটি ট্রাকে সাতজন করে লোক আছে। বয়ে আনছে স্মোক কনটেইনার। লক্ষ করে দেখো, উত্তর-পুব দিক থেকে বাতাস বইছে,' রিস্টওয়াচের দিকে তাকাল রানা। 'এখন চারটে বেজে বত্রিশ মিনিট। ট্রাকগুলো সম্ভবত স্টেশনে ঢুকে পড়েছে, পৌঁছে গেছে উত্তর-পুব প্রান্তে। কেউ দেখেছ তোমরা? এদিকের টারমাকের কাছ দিয়েই যেতে হবে ওগুলোকে।'

'না।'

'তাহলে এখনও নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছায়নি ওগুলো···।'

করপোরাল মনোযোগ দিয়ে শুনছে রানার কথা। ইতস্তত করছে সে। রানাকে বাধা দিয়ে জানতে চাইল, 'স্মোক কনটেইনার দিয়ে কি হবে?'

'উত্তর প্রান্ত থেকে আকাশে ওরা স্মোকস্ক্রিন তৈরি করবে গোটা অ্যারোড্রোমের উপর। ধোঁয়ার বিশাল পর্দার আড়াল থেকে ট্রুপক্যারিয়ারগুলো ল্যান্ড করবে। আমাদের গ্রাউন্ড ডিফেন্স শব্দ শুনতে পাবে, চোখে দেখতে পাবে না কিছুই। বুঝতে পারছ, কি হতে যাচ্ছে? নাবাতিয়াকে ওরা তিন থেকে পাঁচ মিনিটের মধ্যে দখল করে নেবে। শুধু নাবাতিয়াকে নয়, লেবাননের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ফাইটার স্টেশন দখল করার ষড়যন্ত্র করেছে ওরা। গোটা ব্যাপারটা একমাত্র আমি জানি। এই মুহূর্তে অফিশিয়াল নিয়ম মেনে কিছু করতে যাওয়া মানে জেনেশুনে লেবাননকে ইসরায়েলের হাতে তুলে দেয়া। আমি বেঁচে থাকতে তা হতে দিতে পারি না। আমার শেষ কথার অর্থ বুঝতে পারছ?'

করপোরাল কেঁপে গেছে ভিতরে। তার চেহারা দেখে টের পেল রানা। কিছু বলছে না দেখে আবার ও বলল, 'জানি, তোমাদেরকে এখন বাধা দিতে গেলে আমি গুলি খেয়ে মারা যাব। কিন্তু মরার ভয়ে দায়িত্ব পালন করতে পিছিয়ে যাচ্ছি না

আমি। তোমার গার্ডদের সরে যেতে বলো, আমি আমার ছাউনির দিকে হাঁটছি।' কথা শেষ করে সামনের রাইফেলধারীর বুকে দু'হাত দিয়ে ধাক্কা মারল রানা।

করপোরাল হাত তুলে থামতে বলল রানাকে। 'একটা প্রশ্ন। ধোঁয়ায় যদি অ্যারোড্রোম ঢাকাই থাকে, ট্রুপ-ক্যারিয়ারগুলো ল্যান্ড করবে কিভাবে?'

'অটোমেটিক কন্ট্রোলের ওপর নির্ভর করে ল্যান্ড করবে ওরা। রানওয়ের শুরু এবং শেষ প্রান্তগুলোয় সিগন্যালের ব্যবস্থা করা হবে রঙিন বেলুন উড়িয়ে। ট্রাকে সেই বেলুনও দেখেছি আমি।' কথা শেষ করে পা বাড়াল রানা। সামনের গার্ডের পাশ ঘেঁষে যাবার সময় আড়চোখে রানা দেখল লোকটা চেয়ে আছে করপোরালের দিকে।

তিন গজ এগোল রানা। কেউ বাধা দেয়নি।

'দাঁড়াও!' কঠিন কণ্ঠে পিছন থেকে বলল করপোরাল।

দাঁড়াল না রানা। ঘাড়ের পিছনে শিরশির করে উঠল ওর। গুলি করছে? ঘাড় ফিরিয়ে পিছন থেকে তাকাতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল ও। যা হবার হবে। সময় নষ্ট করার কোন উপায় নেই ওর।

'দাঁড়াও! আমরাও যাচ্ছি তোমার সাথে।' ছুটন্ত পদশব্দ পেল রানা। সবাই ওকে অনুসরণ করে আসছে।

'দোস্ত!' রানার পাশে চলে এসেছে কাফা 'এসব কি ঘটছে? আমি স্বপ্ন দেখছি না তো?'

জবাব না দিয়ে হঠাৎ রানা দৌড়ুতে শুরু করল। ছাউনি তখনও বেশ খানিকটা দূরে, এমন সময় ইঞ্জিনের শব্দ শুনে শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল রানার। থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে ও। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, সবাই দাঁড়িয়ে পড়েছে ওর দেখাদেখি। ওর মত কান পেতে ইঞ্জিনের শব্দটা শুনছে প্রত্যেকে।

একটা নয়, কয়েকটা ইঞ্জিনের শব্দ। ট্রাক? ভাবছে রানা।

চৌরাস্তার দিক থেকে আসছে। দ্রুত চারদিকে তাকাল রানা। ঝোপ-ঝাড়গুলো বাঁ দিকে, এখান থেকে টারমাক দেখা যাবে পরিষ্কার।

করপোরাল ওর ডান পাশে এসে দাঁড়াল। 'কিসের শব্দ ওগুলো?'

'L.A.F-এ ছাপ মারা যে ট্রাকগুলোর কথা বলেছিলাম,' বলল রানা। 'ওই ঝোপে লুকাতে হবে—কুইক!'

ক্রমশ বাড়ছে শব্দটা। তারপর হঠাৎ গাম্ভীর্য হারিয়ে কেমন যেন অগভীর হয়ে গেল আওয়াজটা।

ঝোপের ভিতর করপোরাল বলল, 'ব্যাপার কি?'

শব্দ ক্রমশ বাড়ছে। রানা বলল, 'নানান দিকে ছড়িয়ে পড়ছে ট্রাকগুলো। এদিকে আসছে মাত্র একটা।'

খানিকপরই ছাউনির আড়াল থেকে চলমান কালো ট্রাকটা বেরিয়ে এল। রানওয়ে ধরে খুব মন্থর বেগে আসছে। হেডলাইট দুটো জ্বলছে। অস্পষ্ট আলোয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না কিছু। সবুজ রঙের তেরপল দিয়ে ঢাকা রয়েছে ট্রাকের

পিছনটা। কিন্তু ট্রাকের কপালের উপর তরবারির ছবিটা চিনতে পারা গেল কাছে আসতে।

'অস্বাভাবিক কিছু তো দেখছি না,' ট্রাকটা ওদের বিশ গজের মধ্যে দিয়ে উত্তর দিকে চলে যেতে ঝোপ থেকে বেরিয়ে রানাকে অনুসরণ করার জন্যে ছুটতে শুরু করে বলল করপোরাল, 'লেবানন এয়ারফোর্সের ট্রাক নয়, বুঝব কিভাবে?'

সময় নেই···সময় নেই···ভাবছে রানা। করপোরালের কথা কানেই ঢোকেনি ওর। পিছনের দরজাটা বন্ধ ছাউনির। ধাক্কা দিতে ভিতর থেকে কারও সাড়া পেল না ও।

'বোধহয় ঘুমাচ্ছে ওরা সবাই।'

পিছিয়ে এল রানা। তারপর খ্যাপা ষাঁড়ের মত ছুটে গিয়ে কাঁধ দিয়ে প্রচণ্ড একটা ধাক্কা মারল দরজার কবাটে। হুড়মুড় করে ছাউনির ভিতর ঢুকে পড়ল ও ভাঙা কবাট দুটো সাথে নিয়ে। তাল সামলে নিতে নিতে ছাউনির ভিতরটা দেখে নিল এক পলকে। বিছানার উপর উঠে বসছে অনেকে। কারও দিকে না তাকিয়ে তিন লাফে সার্জেন্টের কেবিনের সামনে গিয়ে দাঁড়াল ও। ধাক্কা দিতে ও'পাশে বাড়ি খেল কবাট দুটো।

সার্জেন্টের বিছানার ধারে গিয়ে দাঁড়াল রানা। ঘুমাচ্ছে সার্জেন্ট। মাথার কাছে ছোট্ট একটা টেবিল। তাতে ল্যাম্পটা জ্বলছে মিটমিট করে। দু'হাত দিয়ে সার্জেন্টের দুটো কাঁধ ধরল রানা। 'সার্জেন্ট! সার্জেন্ট!'

ধড়মড় করে উঠে বসল গওহর জুমলাত। 'কে! কি হয়েছে?'

হাউমাউ করে কেঁদে উঠল কেউ। 'সর্বনাশ হয়েছে, সার্জেন্ট! আমাদের লেবাননকে নিকা করতে আসছে ইসরায়েল···।'

'কে? কাফা!'

ল্যাম্পের শলতেটা বড় করে দিয়ে কেবিনটাকে আলোকিত করল রানা। আঁতকে উঠল গওহর জুমলাত। 'রানা, তুমি! গুড গড! কোন্ নরকে গিয়েছিলে শুনি?'

রানা কিছু বলার আগেই করপোরাল তার হাতের রিভলভার চেপে ধরল ওর পাঁজরে, তারপর সার্জেন্টকে প্রশ্ন করল, 'এরা তোমার লোক, সার্জেন্ট?'

বিছানা থেকে নিজের আড়াই মন ওজনের শরীরটা নামাল গওহর জুমলাত। ব্যাটল ড্রেসটা গায়ে চড়াতে চড়াতে বলল, 'ইয়েস।'

'কাঁটাতারের বেড়া কেটে স্টেশনের ভেতর ঢোকার সময় গ্রেফতার করা হয়েছে এদের। আমার গার্ডদের একজনকে এরা মারাত্মকভাবে আহত করেছে, এবং তোমার একজন গানারকে গ্রেনেডের সাহায্যে খুন করেছে···।'

'হোয়াট!' কোমরে হোলস্টার লাগাচ্ছিল জুলমাত, স্থির হয়ে গেল তার হাত দুটো। 'কে, কাকে···?'

'কি হচ্ছে এখানে?' নতুন কিন্তু পরিচিত কণ্ঠস্বর কানে ঢুকতেই ঝট্ করে পিছন

দিকে তাকাল রানা। কেবিনের দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল ও সাইয়িদ হাকামকে। হাতে ধরা রিভলভারটা তার চকচক করছে ল্যাম্পের লালচে আলোয়। চোখাচোখি হতে বাঁকা হাসল সে। 'ওঃ, ইসরায়েলি গুপ্তচরেরা ফিরে এসেছেন—কোন্ সাহসে, শুনি? সার্জেন্ট জুমলাত, তুমি এখনও বোকার মত দাঁড়িয়ে আছো? জানো, ওদেরকে দেখামাত্র হেডকোয়ার্টারে খবর পাঠাচ্ছ না বলে জবাবদিহি দিতে হতে পারে তোমাকে?'

'এই সেরেছে রে!' মাথা নিচু করে নিল কাফা, যেন লুকাতে চাইল।

ঠিক এই সময় রানার ভরাট কণ্ঠ গমগম করে উঠল কেবিনের ভিতর। 'সার্জেন্ট গওহর জুমলাত!'

চমকে উঠল সবাই। রানার গলার স্বরে কর্তৃত্বের সুর।

'ইয়েস!' নিজের অজান্তেই যেন সাড়া দিল জুমলাত।

সবাই চেয়ে আছে রানার দিকে। কেউ এক চুল নড়ছে না। রানা কিছু বলবে। রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে সবাই। 'আমি চাই,' পরিষ্কার কর্তৃত্বের সুর রানার কণ্ঠস্বরে, 'এই মুহূর্তে বম্বারডিয়ার সাইয়িদ হাকামের নেতৃত্বে সবাইকে ব্যাটল ড্রেস পরার হুকুম করো।'

'কিন্তু কেন?'

'হ্যাঁ, আমিও জানতে চাই—কেন? তোমার কথায় আমরাও ইসরায়েলের পক্ষে চলে যাব, এই যদি ভেবে থাকো তুমি...।'

'চুপ!' হুঙ্কারের মত শোনাল রানার ধমকটা। 'নষ্ট করার মত সময় নেই আমাদের হাতে। এখন থেকে যে কোন মুহূর্তে ইসরায়েলি ট্রুপ ক্যারিয়ারগুলো নাবাতিয়া ফাইটার স্টেশনের অ্যারোড্রোমে ল্যান্ড করতে যাচ্ছে। স্মোক কনটেইনার ভর্তি চারটে ট্রাক স্টেশনে ঢুকে পড়েছে। মাত্র তিন মিনিট আগে এই ছাউনির পাশ দিয়ে একটা ট্রাক উত্তর-পুব দিকে ছুটে গেছে। ধোঁয়ার সাহায্যে ওরা অ্যারোড্রোমটাকে আড়াল করে ফেলবে।'

'পাগলের প্রলাপ! সার্জেন্ট, আমি হেডকোয়ার্টারে খবর দিতে যাচ্ছি।'

'দাঁড়াও!' বাধা দিল সাইয়িদ হাকামকে সার্জেন্ট গওহর জুমলাত। 'আমার দায়িত্ব আর কেউ পালন করুক তা আমি চাই না। আগে শুনি, কি বলবার আছে রানার। রানা?'

'বলো।'

'গ্রেনেড ফাটিয়ে কাকে খুন করেছ তোমরা?'

'তার প্রকৃত পরিচয়, সে একজন ইসরায়েলি গুপ্তচর।'

এদিক ওদিক তাকাল গওহর জুমলাত। 'সবাইকেই তো দেখছি...কে সে? নঈম যাকের...কোথায়, নঈম যাকের কোথায়?'

'হ্যাঁ, সে-ই,' বলল রানা। 'জামাল আরসালানের অনুচর ছিল সে। এই কেবিনে তার আরও একজন অনুচর রয়েছে বলে সন্দেহ করি আমি।'

কারও মুখে কথা ফুটল না ক'সেকেন্ড। জাফরী শুধু উঁকি মেরে তাকাল সাইয়িদ হাকামের দিকে। সাইয়িদ হাকামকে মুহূর্তের জন্যে অপ্রতিভ দেখাল। ঢোক গিলল সে। রানা লক্ষ করল, দ্বিধাগ্রস্ত দেখাচ্ছে তাকে।

'নঈম যাকের বিশ্বাসঘাতক ছিল! তার প্রমাণ?'

'সার্জেন্ট,' শান্ত অথচ জরুরী সুরে বলল রানা, 'স্টেশনে হাজার হাজার লোক রয়েছে, এদের অধিকাংশই সশস্ত্র। কোনরকম চালাকি করার চেষ্টা করলে এখান থেকে আমার প্রাণ নিয়ে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। কোন বদ মতলব থাকলে আমি স্টেশনে ফিরতাম না এটা অন্তত তোমার বোঝা উচিত। ভয়ঙ্কর একটা বিপদের খবর নিয়ে এসেছি আমি, অথচ তুমি কথাটা কানেই তুলছ না। এর মূল্য আমাদের সবাইকে প্রাণ দিয়ে শোধ করতে হবে। আজ—আবার কথাটা মন দিয়ে শোনো—আজ, আজ, আজ, আজকেই লেবানন দখল করে নিতে যাচ্ছে ইসরায়েল। মধ্যপ্রাচ্যের গোটা চেহারা রাতারাতি বদলে যাবে এই ঘটনা ঘটলে। মুশকিল হলো, ঘটনাটা যে কয়েক মিনিটের মধ্যে ঘটতে যাচ্ছে তা কেউ জানে না। মধ্যপ্রাচ্যে এখন ভোর হবো হবো, সবাই ঘুমাচ্ছে, তারা কেউ জানে না কত বড় সর্বনাশ ঝড়ের বেগে ছুটে আসছে তাদের দিকে। কিন্তু তোমরা জানো। আমি তোমাদেরকে বারবার সাবধান করে দিচ্ছি। অথচ তোমরা শুনেও শুনছ না। লেবানন থেকে মুসলমানদেরকে এবং লেবানীজ খ্রীস্টান, যারা প্যালেস্টাইনীদের অধিকার স্বীকার করে, তাদেরকে সমূলে উচ্ছেদ করা হবে। ইসরায়েলের পতাকা উড়বে এ দেশে। এবং এই ঘটনার জন্যে দায়ী থাকবে তুমি, সার্জেন্ট গওহর জুমলাত।' থরথর করে কাঁপছে রানা উত্তেজনায়। 'কেননা, শেষ রক্ষা করার সুযোগটা তুমি পাচ্ছ, অথচ সেটাকে কাজে লাগাচ্ছ না।' দম নিল রানা। প্যান্টের বাম পা-টা তুলল রানা, উরুর সাথে বাঁধা একটা রিভলভার বের করল ও। বাড়িয়ে দিল সার্জেন্টের দিকে। 'এটা একটা প্রমাণ। আল মাকারদানা মরূদ্যানে জামাল আরসালানের আস্তানা, সেখানে গিয়েছিলাম আমি। তার কয়েকজন অনুচরকে খুন করে পালিয়ে এসেছি—শুধু খবরটা তোমাকে দেবার জন্যে। আমার ধারণা ছিল, কর্তৃপক্ষের মত তোমার মাথায় গোবর নয়, ঘিলু আছে। এখন দেখছি আমি ভুল করেছি...।'

'আল মাকারদানায় কি দেখেছ তুমি?' রিভলভারটা নিয়ে পরীক্ষা করতে করতে বলল সার্জেন্ট।

'স্মোক কনটেইনার ভর্তি প্রায় ত্রিশটা ট্রাক দেখেছি,' বলল রানা। 'জামাল আরসালানের কথাবার্তা শুনে জেনেছি প্রতিটি ফাইটার স্টেশনে তিন থেকে চারটে ট্রাক যাবে।'

'কিন্তু নঈম যাকের সম্পর্কে...।'

'গানপিটে এখন কার পাহারা দেবার সময়, সার্জেন্ট?'

'যাকেরের।' গওহর জুমলাত বলল।

'সেক্ষেত্রে ওখানে গার্ডদের সাথে কি করছিল সে?'

করপোরালের দিকে তাকাল গওহর জুমলাত।

'আমি ঠিক বলতে পারব না,' করপোরাল গার্ডদের দিকে তাকাল। 'তোমরা কেউ জানো?'

'টহল দিচ্ছিলাম আমি, নঈম হঠাৎ ওখানে যায়,' একজন গার্ড বলল, 'ও আমাকে বলে, স্টেশনে ইসরায়েলি গুপ্তচর অনুপ্রবেশ করতে পারে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে আমাদেরকে সতর্ক করে দেবার জন্যে গিয়েছিল সে।'

'কথাটা কি ঠিক, সার্জেন্ট? তুমি তাকে পাঠিয়েছিলে?'

'না।'

'গানপিটে কার ডিউটি এ-সময় তা আমার জানা আছে, তাই ওকে দেখে খটকা লাগে আমার। তাছাড়া, নঈমকে একজনের সাথে গোপনে কথা বলতে শুনেছি আমি। জেনেছি সে রানার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে, তাই একজন গার্ডের পকেট থেকে একটা গ্রেনেড নিয়ে আমার চকলেটের বাক্সে সেটা ভরি, তারপর...'

কাফাকে থামিয়ে দিয়ে সাইয়িদ হাকাম প্রশ্ন করল, 'আর একজন? আর একজন কে?'

'তুমি, সম্ভবত,' বলল কাফা। 'তবে কণ্ঠস্বরটা চিনতে পারিনি। কারণ, সে যেই হোক, নঈমের সাথে আলাপ করার সময় গলার স্বর বিকৃত করে রেখেছিল।'

অবাক হয়ে গেছে রানা। কাফা ওকে এ ব্যাপারে কিছুই বলেনি।

সাইয়িদ হাকাম রেগেমেগে কিছু বলতে যাচ্ছিল, রানা তাকে বাধা দিল। 'সার্জেন্টের সাথে কথা বলছি আমি। সার্জেন্ট, আমার কথার সত্যতা যাচাই করতে রাজি আছ কিনা?'

'কি প্রমাণ করতে চাও তুমি, গানার রানা?'

'আমি চাই অ্যারোড্রোমের উত্তর-পুব প্রান্তে যে ট্রাকগুলো গেছে সেগুলোকে ঘেরাও করতে। স্মোক কনটেইনার না পাওয়া গেলে আমাকে হেডকোয়ার্টারে পাঠিয়ে দিয়ো।'

'ঠিক আছে,' বলল গওহর জুমলাত। 'বম্বারডিয়ার সাইয়িদ হাকাম, টেক পোস্টের অর্ডার জারি করো।'

'কিন্তু...।'

'যা বলছি!' হুকুমের সুরে বলল গওহর জুমলাত। 'রানার কথা সত্যি না-ও হতে পারে। কিন্তু সত্যি না ধরে নিয়ে গোটা দেশের ওপর ঝুঁকি নিতে আমি রাজি নই। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা জানতে পারব আসল ঘটনা।'

প্যাঁচার মত মুখ করে বেরিয়ে গেল কেবিন থেকে সাইয়িদ হাকাম। তাকে অনুসরণ করল জাফরী এবং অন্যান্য গানাররা। পনেরো সেকেন্ড পর সাইয়িদ হাকামের চড়া গলা শোনা গেলঃ টেক পোস্ট!

'এটা একটা আমেরিকান রিভলভার,' বলল সার্জেন্ট। 'কিন্তু আমেরিকান রিভলভার L.A.r.-এর অনেকের কাছেই আছে। সে যাক, পুরো কাহিনীটা প্রথম

থেকে সংক্ষেপে শোনাও তুমি আমাকে, রানা।'

ছাউনির ভিতর ব্যস্ততা শুরু হয়ে গেছে। ঘুম থেকে উঠেছে সবাই। ব্যাটল ড্রেস পরছে তাড়াহুড়োর মধ্যে।

'এখন ঠিক কি করতে বলো তুমি?' রানার কাছ থেকে সংক্ষিপ্ত ঘটনার বিবরণ শোনার পর প্রশ্ন করল জুমলাত।

'ট্রাকগুলোকে ঘিরে ফেলতে হবে। স্মোক-কনটেইনার নিজেদের চোখে না দেখে এতবড় বিপদের কথা বিশ্বাস করবে না হেডকোয়ার্টারের অফিসাররা। আমাদের প্রথম কাজ ট্রাকের স্মোক কনটেইনারগুলো দখল করা। ওগুলো দেখাতে পারলে অফিসারদের আমি অনুরোধ করতে পারব লেবাননের আর সব ফাইটার স্টেশনকে সতর্ক করার জন্যে।'

'কিন্তু ট্রাকগুলোয় ক্ষতিকর কিছু যদি না থাকে?'

'আছে।'

'যদি না থাকে?'

'সেক্ষেত্রে আমার কি হবে তা আমি জানি।'

'বেশ, জানলেই ভাল,' গওহর জুমলাত চিন্তিতভাবে বলল। তাকাল করপোরালের দিকে। 'এদেরকে আমার হাতে আধঘণ্টার জন্যে ছেড়ে দিতে তোমার কোন আপত্তি আছে, করপোরাল? ব্যক্তিগতভাবে এদের দায়িত্ব নিতে চাইছি আমি।'

'ভেরি গুড, সার্জেন্ট।' কথাটা বলে কেবিন থেকে বেরিয়ে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল করপোরাল।

'এক মিনিট, করপোরাল। রানার কথা অনুযায়ী, ট্রাকগুলো উত্তর-পুব প্রান্তে পার্ক করা হয়েছে। আমরা প্রথমে একটা ট্রাক ঘেরাও করব। রানার কথার মধ্যে যদি সত্যতা থাকে, গুলি বিনিময় হতে পারে। রাইফেলের আওয়াজ শুনলে তোমার গার্ডদের কি তুমি ট্রাকগুলোর দিকে পাঠাবে?'

'অবশ্যই, সার্জেন্ট।'

'একটা কথা,' গওহর জুমলাতের কানে কানে কি যেন বলল রানা। চোখ কপালে উঠে গেল সার্জেন্টের। কিন্তু কোন মন্তব্য করল না সে।

'করপোরাল, তোমার ডিউটি শেষ কখন?'

'এখন থেকে,' রিস্টওয়াচ দেখল করপোরাল, 'দু'ঘণ্টা পর।'

'ঠিক আছে,' সার্জেন্ট জুমলাত বলল। 'আমি আশা করব, গোটা ব্যাপারটা মিটে না যাওয়া পর্যন্ত তুমি ডিউটিতে থাকবে। আর কাউকে ডিউটি হস্তান্তর করার আগে আমার সাথে পরামর্শ করলে আমি ব্যক্তিগতভাবে তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব, করপোরাল।'

'ঠিক আছে, সার্জেন্ট,' করপোরাল বলল, 'কিন্তু ব্যাপারটা কেমন যেন...।'

'সব কথা বলার সময় এখনও আসেনি, রানার ধারণা।'

মাথা ঝাঁকিয়ে করপোরাল বেরিয়ে যাবার পর কাফা কেবিনের দরজায় এসে

দাঁড়াল। ব্যাটল ড্রেস তো পরেছেই, রানা দেখল, তার হাতে খাপমুক্ত বেয়োনেট সহ একটা রাইফেলও রয়েছে। 'আমার হাতে অস্ত্র থাকতে পারবে তো, সার্জেন্ট?'

'আর একজনের কথা বলছিলে তখন তুমি,' চাপা স্বরে বলল রানা। 'তুমি জানো কে সে? আমাকে বলো কাফা। কে সে?'

'কে আবার! যে গুলি করে তোমার স্টীল হেলমেট ফুটো করে দিয়েছে, সে।'

ভুরু কুঁচকে উঠল রানার। 'তুমি জানলে কিভাবে আমার স্টীল হেলমেট গুলি করে কেউ ফুটো করে দিয়েছে?'

'একজন দেখেছে।'

'দেখেছে! কে?'

'দেখেছে, মানে, আমার মনে হয় সেই গুলি করেছে। তা না হলে সে জানল কিভাবে?'

'কে?'

'সাইয়িদ হাকাম। জাফরীকে বলছিল, রানার হেলমেট ফুটো করে দিয়েছে কেউ গুলি করে। জাফরী বিশ্বাস করেনি কথাটা। আমিও বিশ্বাস করিনি। ওদের কথা আড়াল থেকে শুনছিলাম কিনা...।'

'সাইয়িদ হাকাম বলেনি কাকে সে গুলি করতে দেখেছে?'

'না,' কাফা বলল, 'আমার ধারণা, সে-ই কালপ্রিট। নিজে গুলি করে ব্যর্থ হয়ে ঘটনাটা প্রচার করার চেষ্টা করে, সকলের সন্দেহের বাইরে থাকার জন্যে।'

মৃদু হাসল রানা। কাফার ধারণা সম্পর্কে কোন বিতর্কে যেতে চাইল না ও। 'আর কাকে কথাটা বলে হাকাম?'

'শুধু জাফরীকে।'

'নঈম যার সাথে কথা বলছিল তার গলার স্বর তুমি সত্যিই চিনতে পারোনি তাহলে?'

'না,' কাফা বলল, 'তবে সাইয়িদ হাকাম সে, আমার যতদূর বিশ্বাস। লোকটা তোমাকে দু'চোখে দেখতে পারে না, দোস্ত।'

'বিশ্বাস নয়, কারও বিরুদ্ধে মুখ খুলতে হলে প্রমাণ চাই,' বলল গওহর জুমলাত। 'কাফা, আর কখনও কারও বিরুদ্ধে কিছু বলার আগে কথাটা মনে রেখো। সাইয়িদ হাকামকে আমার চেয়ে ভালভাবে তুমি চেনো না। বদরাগী, স্বীকার করি, কিন্তু ঠাণ্ডা মাথায় খুন করার লোক সে নয়। আমি বলতে চাইছি, বিশ্বাসঘাতক সে হতে পারে না।'

'তুমি জানো, জাফরীকে কি বলেছে ও?' হাত নেড়ে বলল কাফা। 'বলেছে, রানা শালার হেলমেট কে যেন গুলি করে ফুটো করে দিয়েছে। ব্যাটা মরলে খুব খুশি হতাম। তাছাড়া, কাঁটাতারের বেড়ায় ইলেকট্রিসিটি...।'

হঠাৎ পিছন দিকে তাকাল কাফা। ভূত দেখার মত চমকে উঠল সে। সাইয়িদ হাকাম কেবিনের ভিতর কখন যে এসে দাঁড়িয়েছে কেউ টেরই পায়নি। কাফার দৃষ্টি

অনুসরণ করে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা এবং জুমলাত। মুখ দেখে কিছুই বোঝা গেল না। থমথম করছে চেহারাটা। রানার দিকে তাকালই না। স্থির চোখে ক'সেকেন্ড চেয়ে থাকল গওহর জুমলাতের দিকে। তারপর কর্কশ গলায় জানাল, 'ওরা সবাই তৈরি হয়ে গেছে, সার্জেন্ট।'

'তুমি যাও, আমরা আসছি।' সাইয়িদ হাকাম কেবিন থেকে বেরিয়ে যেতে গওহর জুমলাত রানাকে বলল, 'জানি না ঘটনাটার তাৎপর্য কি, তবু তোমাকে জানানো দরকার ব্যাপারটা। রাত একটার সময় স্কোয়াড্রন লিডার ইউনুস মেহের তোমার খোঁজে এসেছিল ছাউনিতে। তোমাকে পাওয়া যাচ্ছে না শুনে দৌড়ে গাড়িতে গিয়ে চড়ল, তারপর ঝড়ের বেগে গাড়ি নিয়ে চলে গেল। সাথে একজন···মানে সেই মেয়েটা ছিল। ইফফাত না কি যেন নাম···?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা, 'মেহের মোটামুটি পরিস্থিতিটা জানে, ওকে কয়েকটা তথ্য সংগ্রহ করতে বলেছিলাম।'

'একটা কথা, রানা,' রানার দু'কাঁধে হাত রাখল সার্জেন্ট, 'জানি না কি ঘটতে যাচ্ছে। কিন্তু যাই ঘটুক, খুব সাবধানে থাকা উচিত তোমার।'

'ধন্যবাদ, সার্জেন্ট।'

বেরিয়ে এল ওরা কেবিন থেকে। ছাউনির ভিতর মিটমিট করে একটা মাত্র ল্যাম্প জ্বলছে। লালচে গম্ভীর মুখগুলো ওদের দিকে ফিরল। এতগুলো মানুষ, কিন্তু কারও নিঃশ্বাস ফেলার শব্দও শুনতে পেল না রানা। কেউ যদি গুলি করে এখন? হঠাৎ কথাটা মনে হতেই চট্ করে পিছনটা একবার দেখে নিল। কুতুব দীন না জাফরী, ঠিক চিনতে পারল না ও—স্যাঁত্ করে সরে একজনের পিছনে চলে গেল। নাকি সাইয়িদ হাকাম?

'বম্বারডিয়ার কোথায়?' জানতে চাইল গওহর জুমলাত।

রানার পিছন দিক থেকে সাড়া দিল সাইয়িদ হাকাম। 'এই যে,' কথাটা বলে রানা এবং গওহর জুমলাতের সামনে এসে দাঁড়াল সে।

'তোমরা সবাই যে-যার রাইফেল হাতে তুলে নাও,' জুমলাত নির্দেশ জারি করছে। 'হাকাম, প্রত্যেককে বিশ রাউন্ড করে বুলেট বরাদ্দ করো। কুতুব দীন, সেন্ট্রি হিসেবে এখানেই দায়িত্ব পালন করবে তুমি।'

কে যেন একটা স্বস্তির চাপা নিঃশ্বাস ফেলল, পরিষ্কার শুনতে পেল রানা। বুঝতে অসুবিধে হল না ওর, সেন্ট্রির দায়িত্ব তার কাঁধে না পড়ায় অসম্ভব ভাগ্যবান মনে করছে নিজেকে কেউ।

বাক্স খুলে রাইফেল এবং গুলি ভাগ করে দেয়া হল।

গওহর জুমলাত সকলকে একবার করে দেখে নিয়ে অত্যন্ত ধীর ভঙ্গিতে বলল, 'আমাদের গানার মাসুদ রানা ক্যাম্পে ফিরে এসেছে আজ সকালে, এখন থেকে যে-কোন মুহূর্তে এয়ার অ্যাটাকের একটা খবর নিয়ে। চারটে ট্রাককে আমরা উত্তর দিকে যেতে দেখেছি। রানার বক্তব্য, ওগুলো ইসরায়েলি গুপ্তচরদের ট্রাক, প্রত্যেকটিতে

স্মোক কনটেইনার আছে, এবং শত্রুপক্ষের উদ্দেশ্য হলো অ্যারোড্রোমের ওপর আকাশে একটা স্মোকস্ক্রিন তৈরি করা, যার আড়াল থেকে ট্রুপ ক্যারিয়ারগুলো রানওয়েতে নামবে। এসব কথা সত্যি কিনা তা আমরা জানতে পারব যদি ঘেরাও করে ট্রাকের লোকজনকে চ্যালেঞ্জ করি। ঘেরাও করার পরে আমি একা যাব ব্যাপারটা কি দেখার জন্যে। তোমাদের কাজ হবে দূর থেকে আমাকে কাভার দেয়া। হাকাম, কাফা, রানা আর জাফরী, প্রত্যেকে গ্রেনেড নাও সাথে।'

'রানাও?' সাইয়িদ হাকামের কণ্ঠস্বর।

একটু ইতস্তত করতে দেখা গেল গওহর জুমলাতকে। তারপর সে বলল, 'কানে তুমি কম শোনো বলে আমি বিশ্বাস করি না, হাকাম।'

হ্যান্ড গ্রেনেড বরাদ্দ করা হলো।

'চলো, বেরিয়ে পড়া যাক এবার।'

বাইরে বেরিয়ে অবাক হলো রানা। ভোরের আলো এখনও পরিষ্কারভাবে ফোটেনি। রিস্টওয়াচ দেখে হিসেব করল, মাত্র পনেরো মিনিট হয়েছে স্টেশনে ঢুকেছে ও।

গানপিটের পাশ দিয়ে যাচ্ছে ওরা। আকাশের গায়ে দেখা যাচ্ছে তিন ইঞ্চি কামানটার অস্পষ্ট সিলুয়েট। জুমলাত বলল, 'আফাজী, ওখানে আমার মোটর-সাইকেলটা আছে। নিয়ে এসো সাথে করে। যদি কিছু ঘটে হেডকোয়ার্টারে খবর দেয়ার দায়িত্ব পালন করতে পারবে তুমি, ওটার সাহায্যে।'

'যাচ্ছি,' ছুটতে শুরু করে হঠাৎ থামল খালেদ আফাজী। তার নিরীহ-দর্শন মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। 'সাথে করে কি কামানটাও আনব, সার্জেন্ট?'

এমন কি রানাও সকলের সাথে হাসিতে যোগ না দিয়ে পারল না। কিন্তু একজন হাসেনি, হঠাৎ মনে হতেই দ্রুত সকলের দিকে তাকাল রানা। চোখাচোখি হতে হাসিটা থামিয়ে গম্ভীর হয়ে উঠল সাইয়িদ হাকাম। হেসে ফেলে নিজের সম্মান হারিয়ে ফেলেছে যেন। চিন্তিত হয়ে উঠল রানা। কে হাসেনি ঠিক ধরতে পারেনি ও। তবে, দু'জন অনেক পরে, সকলের যখন শেষ হয়ে এসেছে সেই সময় হাসতে শুরু করল। তাদের মধ্যে একজন কাফা। আরেকজন জাফরী।

কাফার ব্যাপারটা অনুমান করতে পারে রানা। ঘনঘন রিস্টওয়াচ দেখছে সে। আর বিড় বিড় তো সারাক্ষণই করছে, 'শালাদের পেট ফুটো করে দেব বেয়োনেট চার্জ করে, একবার নেমেই দেখুক না অ্যারোড্রোমে...।' মনেপ্রাণে চাইছে সে, শত্রুপক্ষ নামুক স্টেশনে। তা না হলে সামনাসামনি দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করবে কিভাবে, কার সাথে?

ঘন ঘন পিছন দিকে তাকাচ্ছে জাফরী। তার সেই রসিকতা কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। সন্ত্রস্ত দেখাচ্ছে তাকে। ইসরায়েল সেজে অভিনয় করার সেই অফুরন্ত উদ্যমের ছিটেফোঁটাও নেই তার মধ্যে এখন আর। আক্রমণ আসার আগেই হেরে গেছে সে—ভয়ে। জাফরীর জন্যে দুঃখবোধ করল রানা।

গোটা ডিটাচমেন্ট অনুসরণ করছে রানা আর সার্জেন্ট জুমলাতকে। সাইয়িদ হাকামের দু'পাশে কাফা আর জাফরী। পিছন ফিরে রানা দেখল অনর্গল কথা বলে চলেছে হাকাম। গভীর মনোযোগের সাথে তার কথাগুলো নিঃশব্দে গিলছে বাকি দু'জন। কি বলছে হাকাম শুনতে না পেলেও, অনুমান করতে বেগ পেতে হলো না রানার। ওর বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করছে সে। ট্রাকগুলোয় যদি ক্ষতিকর কিছু পাওয়া না যায়, ভাবল রানা, হাকাম জান নিয়ে টানাটানি শুরু করে দেবে ওর। অন্যান্যরা তাকে সাহায্য করবে।

সামনে ল্যান্ডিং ফিল্ড। টারমাকের কিনারায় পৌঁছুতে নিজের অজান্তেই হাঁটার গতি দ্রুত হল রানার। দেখাদেখি জুমলাতও দ্রুত করল হাঁটা। ওরা দু'জন একটা কথাও বলেনি পরস্পরের সাথে রওনা হবার পর থেকে। কেন যেন একটা অস্বস্তি কাটিয়ে উঠতে পারছে না রানা। শেষ পর্যন্ত কি হতে যাচ্ছে? যদি ট্রাকগুলোয় সত্যি কিছু পাওয়া না যায়? শত্রুপক্ষ যদি সাবধান হয়ে গিয়ে সরিয়ে ফেলে থাকে স্মোক কনটেইনারগুলো? সাবধান হবার সঙ্গত কারণ তাদের আছে। রানা এবং কাফা যে প্রাণ নিয়ে পালিয়েছে, এবং স্টেশনে ঢুকতে পেরেছে শেষ পর্যন্ত—এ খবর কি তারা পায়নি এখনও?

পাবার কথা নয়। অন্তত এত তাড়াতাড়ি না। ওদেরকে খুন করার পর পায়ে হেঁটে এদ্ দায়রা অ্যারোড্রোমে ফেরার কথা ছিল জামাল আরসালানের অনুচরদের। সকাল ন'টার আগে এদ্ দায়রায় তাদের পৌঁছুবার কথা নয়। অর্থাৎ, ভাবছে রানা, শত্রুপক্ষের সাবধান হবার কোন কারণ নেই। নেই? ওরা যখন কাঁটাতারের বেড়া টপকাবার সময় ধরা পড়ে তখন অনুচরদের কেউ খবরটা পৌঁছে দেয়নি তো ট্রাকের লোকগুলোকে? মিনিট সাতেক ছিল ওরা করপোরালের তাঁবুতে। গার্ডদের মধ্যে কেউ জামাল আরসালানের অনুচর থাকলে তার পক্ষে কি সম্ভব নয় স্টেশনের গেটে গিয়ে অপেক্ষারত ট্রাকগুলোকে সাবধান করে দেয়া?

সম্ভব। এবং স্মোক কনটেইনারগুলো অ্যারোড্রোমের ভিতর যে-কোন জায়গায় নামিয়ে লুকিয়ে ফেলাও কঠিন কিছু নয়।

দূর, দূর! নিজেকে সান্ত্বনা দেবার প্রয়াস পাচ্ছে রানা। এসব আশঙ্কার কোন ভিত্তি নেই। কিন্তু গওহর জুমলাতের দিকে তাকাতে মনটা আবার দমে গেল। অস্বাভাবিক গম্ভীর আর চিন্তিত দেখাচ্ছে তাকে।

ওদের গানপিটের উত্তর দিকের ডিসপারসাল পয়েন্টটা ছাড়িয়ে গেল ওরা। পরবর্তী ডিসপারসাল পয়েন্টের দিকে অর্ধেকটা পথ পেরোবার পর রানা আর গওহর জুমলাতের মাঝখানে চলে এল সাইয়িদ হাকাম। 'কই হে, কোথায় তোমার ইসরায়েলি ট্রাক?' প্রকাশ্যে ব্যঙ্গ করছে সে।

অ্যারোড্রোমের শেষপ্রান্ত অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে এখন। চোখ কুঁচকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাতে গাছের ঝাঁকড়া মাথা আর তার উপর ছাই রঙের ভাসমান মেঘের টুকরো ছাড়া কিছুই পরিষ্কার দেখতে পেল না রানা। রানওয়েগুলো সাদা ফিতের

মত পড়ে আছে লম্বা হয়ে। বাঁ দিকে বাঁক নিয়ে চলে গেছে দৃষ্টি সীমার বাইরে। কোথাও ট্রাকগুলোর কোন চিহ্ন নেই।

ঢোক গিলে গলাটা ভিজিয়ে নেবার ব্যর্থ চেষ্টা করল রানা। 'পরবর্তী ডিসপারসাল পয়েন্টের কাছ থেকে বাঁক নিয়ে আমরা পাহাড়ের গা বেয়ে নিচে নামব,' বলল ও, 'ওরা হয়ত নিচে নেমে ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। যথাসম্ভব বেশি জায়গা জুড়ে ধোঁয়া ছড়িয়ে দেবার উদ্দেশ্য থাকলে সেটাই সম্ভব।'

'এদিকে এসে থাকলে নিশ্চয়ই কোথাও না কোথাও আছে,' বলল গওহর জুমলাত।

'নট নেসেসারিলি,' দ্বিমত পোষণ করল হাকাম। 'এমনও তো হতে পারে যে একটা কাজ নিয়ে এসেছিল, কাজ সেরে আবার চলে গেছে অন্য পথ ধরে? এমনও তো হতে পারে যে ওগুলো আমাদের এয়ারফোর্সেরই ট্রাক, কোন অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে আসেনি। আমি বলতে চাইছি, গানার মাসুদ রানার মাথাটা একবার বড় ডাক্তারকে দিয়ে পরীক্ষা করার দরকার হতে পারে।'

'দোস্ত,' কাফা নয়, জাফরী পিছন থেকে বলল, 'সত্যি, ব্যাপারটা কি বলো তো? আমার মত শখের অভিনেতা ছিলে নাকি তুমি? হিরোর ভূমিকায় অভিনয় করার শখটা মিটিয়ে নিতে চাচ্ছ? আমার মনে হয়, কাফাকে বাদ দিয়ে তুমি আমার সাথে জুটি বাঁধলে ভাল করতে। এমন অভিনয় করতাম দু'জন মিলে যে চোখে শর্ষে ফুল দেখত সবাই।'

কাফা খুক খুক করে কাশল। কেন যেন, অন্য একটা তাৎপর্য আছে কাশিটার মধ্যে, মনে হল রানার।

রানা লক্ষ করল, আড়চোখে ওর দিকে তাকাতে শুরু করেছে গওহর জুমলাত। ট্রাক যদি সত্যি না পাওয়া যায়, এবং তাতে যদি স্মোক কনটেইনার আর ইসরায়েলি গুপ্তচররা না থাকে—গুরুতর বিপদে পড়ে যাবে সে। রানা এবং কাফা, পলাতক দুই খুনীর কথায় বিশ্বাস স্থাপন করার অপরাধে এমন কি কোর্ট মার্শাল পর্যন্ত হতে পারে তার। অপরাধীদের সরাসরি হেডকোয়ার্টারে না পাঠিয়ে, হেডকোয়ার্টারের অনুমতি না নিয়ে কল্পিত শত্রুর সন্ধানে তৎপরতা চালাবার চেষ্টা ভয়ঙ্কর ধরনের অপরাধ হিসেবেই বিবেচনা করবে কর্তৃপক্ষ। রানা বুঝতে পারছে, ভয় পেতে শুরু করেছে জুমলাত।

টারমাক ছেড়ে শুকনো শক্ত ঘাসের মাঠে নামল ওরা। পরিত্যক্ত একটা লুইস গানপিটের ধসে পড়া বালির বস্তা দিয়ে তৈরি পাঁচিলের পাশ ঘেঁষে এগোল। বস্তাগুলোর গায়ে অসংখ্য সমান মাপের ফুটো। সেদিকে চোখ পড়তেই পাশ থেকে চাপা স্বরে ফিসফিস করে বলল সাইয়িদ হাকাম, 'ওরকম ঝাঁঝরা করা হবে একজনকে!'

শক্ত প্লাস্টিকের মত ঘাস। পায়ের চাপে নত হলেও পা তুলে নিলেই আবার সটান দাঁড়িয়ে পড়ছে। কোথাও কোথাও মাটিকে রেহাই দিয়েছে, সেখানে পা

ফেললে টের পাওয়া যায় এখানকার মাটি পাথরের চেয়ে কম শক্ত নয়। যতই সামনে এগোচ্ছে ওরা, ঘাসের ঘনত্ব এবং দৈর্ঘ্য বাড়ছে ক্রমশ। প্রকাণ্ড ডিসপারসাল পয়েন্টের পিছনে চলে এল ওরা। বাঁক নিয়ে চল্লিশ গজ এগোল। পাহাড়ের কিনারা ওই জায়গা। নামতে শুরু করেছে নিচের দিকে।

পাথর মেশানো শক্ত মাটির ঢালু পাহাড়ের গা। শুক্রবারের আক্রমণ স্বাক্ষর রেখে গেছে এখানে অসংখ্য। বোমা পড়ে এক একটা ছোটখাট পুকুরের মত গর্ত তৈরি হয়েছে। গর্তের দু'পাশে বুক সমান উঁচু মাটির স্তূপ জমা হয়ে আছে। খানিকটা নামাবার পর ঢালু পাহাড়ের গায়ের মাঝামাঝি জায়গায় কালো রঙের মস্ত একটা শরীসৃপের মত কাঁটাতারের বেড়ার খানিকটা দেখতে পেল ওরা। দু'জন লোক বেড়া ঘেঁষে হাঁটছে, ধরাধরি করে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে ভারি একটা কি যেন। জিনিসটা দেখতে সিলিন্ডারের মতই। তাদের পরনে L.A.F-এর ইউনিফর্ম। গওহর জুমলাতের ইউনিফর্মের আস্তিন খামচে ধরল রানা। একই সাথে ঝট্ করে তাকাল পিছন দিকে।

কাকে সন্দেহ করবে, ঠিক করতে পারল না রানা। সাইয়িদ হাকাম পিছিয়ে পড়েছে আগেই। রানা তাকাতেই দেখল পকেট থেকে হাত বের করছে সে। চোখাচোখি হতে কেমন অপ্রতিভ দেখাল হাকামকে। হাতটা স্থির হয়ে রইল দু'সেকেন্ড পকেটের ভিতর। ইতস্তত ভাবটা দ্রুত কাটিয়ে উঠে হাতটা বের করল সে। কালো রঙের চকচকে গ্রেনেডটা দেখতে পেল রানা। পকেট থেকে হাত বের করল আরও দু'জন, হাতে একটা করে গ্রেনেড। হঠাৎ রানার মনে বিদ্যুৎ চমকের মত একটা সত্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। যারা পিছনে রয়েছে তাদের প্রত্যেকে কিন্তু এখনও দেখতে পায়নি নিচের লোক দুটোকে।

দাঁড়িয়ে পড়েছে গওহর জুমলাত। সকলকে সাবধান করে দেবার জন্যে পিছন দিকে ফিরল সে। ক'জনের হাতে গ্রেনেড দেখে বিস্মিত হল সে। পরমুহূর্তে রাজ্যের বিরক্তি ফুটে উঠল চেহারায়। 'গ্রেনেড কেন? ও দিয়ে কি হবে এখন? রাখো পকেটে!'

সবাই পকেটে ভরে রাখল যার যার হাতের গ্রেনেড। রানা লক্ষ্য করল, জাফরীর হাবভাব বদলে গেছে। শূন্যে ছুঁড়ে দিল সে তার হাতের গ্রেনেডটা। আবার লুফে নিতে নিতে বলল, 'আমি আর ইসরায়েল সেজে অভিনয় করতে রাজি নই। আমার অরিজিন্যাল ভূমিকায় অভিনয় করব এখন থেকে। আমরা সবাই এখন তাই করব, তাই না?'

'ঠিক,' বলল কাফা। 'ইসরায়েল স্বয়ং চোখের সামনে উপস্থিত। কাউকে তার হয়ে প্রক্সি দিতে হবে না।'

লোক দু'জন হারিয়ে গেছে গাছের আড়ালে।

'ঠিক আছে,' বলল গওহর জুমলাত। 'রাইফেল রেখে আমার সাথে এসো, রানা। বাকি তোমরা সবাই খানিকটা নিচে নেমে ওই লম্বা ঘাসের ভিতর গা ঢাকা দিয়ে থাকবে, কোন শব্দ যেন না হয়।'

রানাকে নিয়ে জুমলাত নিচে নামতে শুরু করল। নিজেদের লুকাবার কোন

চেষ্টাই করছে না ওরা। কোনাকোনিভাবে নিচে নামছে, প্রতি পদক্ষেপে দৃষ্টিসীমার মধ্যে চলে আসছে কাঁটাতারের বেড়া। এখন প্রায় ত্রিশ গজের মত দেখা যাচ্ছে। আরও দু'জন লোককে দেখল ওরা বেড়ার কাছে। আরও স্মোক কনটেইনার বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আরও গজ পনেরো নামল ওরা। দু'পাশে কাঁটাতারের বেড়া অনেকটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে এখন। বেড়াটা যেখানে অকস্মাৎ বাঁক নিয়েছে সেখানে ট্রাকটাকে দেখল ওরা। দু'জন লোক ধরাধরি করে নামাচ্ছে পিছন থেকে স্মোক কনটেইনারগুলো। আর একজন দাঁড়িয়ে আছে, ওদের কাজ দেখছে সে, হাতে রাইফেল।

'গুড,' চেপে রাখা নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে বলল গওহর জুমলাত। 'যতদূর বুঝতে পারছি, তোমার ভাগ্যে দেশ সেবার জন্যে সবচেয়ে বড় পদকটা ঝুলছে। তবে, ব্যাপারটার মধ্যে এখনও কিন্তু আছে একটা।'

ফিরতি পথে উঠতে শুরু করল ওরা। 'তোমার এ কথার অর্থ?' জানতে চাইল রানা।

'এখনও আমি জানি না ওরা বেআইনী কোন কাজ করছে কিনা। এল.এ.এফ-এর ট্রাক নয় ওগুলো, বুঝব কিভাবে? হয়ত নির্দেশ পেয়েই ওরা ওখানে নিয়ে গেছে স্মোক কনটেইনারগুলো।'

'এখন কি করতে চাও তুমি?'

'ওদেরকে জিজ্ঞেস করতে চাই, কি করছে।'

লম্বা ঘাসের ওপারে পৌঁছুল ওরা। আড়াল থেকে বেরিয়ে এল সবাই।

'রাস্তায় ফিরে চলো সবাই,' অর্ডার করল গওহার জুমলাত। 'যত তাড়াতাড়ি পারো। নিঃশব্দে, মনে রেখো। মাথা নিচু করে হাঁটো সবাই।'

রাইফেল তুলে নিয়ে গওহর জুমলাতকে অনুসরণ করল রানা। খানিকটা ওঠার পর নিচের কাঁটাতারের বেড়া যখন আর দেখা গেল না, ছুটতে শুরু করল সবাই। ডিসপারসাল পয়েন্টের কাছে টারমাকে উঠে হাত তুলে থামাল জুমলাত সবাইকে। হাত বাড়িয়ে তর্জনী দিয়ে দূরের একটা জায়গা দেখাল। 'ওখানে,' বলে ছুটতে শুরু করল আবার।

জুমলাতের পাশে থাকার জন্যে সকলের আগে চলে এল রানা। এক ছুটে তিনশো গজ এগিয়ে জুমলাত মাথার উপর হাত তুলে সকলকে থামার নির্দেশ দিল।

'ঠিক আমাদের নিচে L.A.F-এর ছাপ মারা একটা ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে,' পাহাড়ের কিনারার দিকে আঙুল তুলে দেখাল জুমলাত। 'ওটাই আমাদের টার্গেট লম্বা একটা লাইনের মত সবাই ছড়িয়ে পড়বে তোমরা, একজনের কাছ থেকে আরেকজন বিশ গজ দূরে থাকবে। তারপর সামনের দিকে এগোব আমরা। ট্রাকটা চোখে পড়লে মাথা নিচু করে এগোব; দরকার হলে হামাগুড়ি দিতে হবে। কোনভাবেই যেন নিচে থেকে ওরা আমাদেরকে দেখতে না পায়। অর্ধবৃত্তের আকার নিয়ে ট্রাকটাকে ঘিরে ফেলবে তোমরা, এই আমি চাই। বৃত্তের দুটো প্রান্ত ট্রাকটার

সবচেয়ে কাছাকাছি থাকবে। কিন্তু প্রত্যেকের ফাইন্যাল পজিশন ট্রাক থেকে দুশো গজের বেশি যেন না হয়। রওনা হবার পর থেকে পাঁচ মিনিট পাচ্ছ তোমরা ফাইন্যাল পজিশনে পৌঁছুবার। পাঁচ মিনিট পর আমি সামনে এগোব।'

'একা?'

রানার দিকে তাকাল জুমলাত। 'হ্যাঁ। আর কাউকে সাথে নেবার ঝুঁকি আমি নিতে চাই না। যা বলছিলামঃ কেউ তোমরা গুলি করবে না আমি অর্ডার না দিলে বা ওরা কেউ গুলি না করলে। ওরা যদি গুলি করে বা আমি যদি অর্ডার দিই তাহলে সম্ভাব্য দ্রুততার সাথে ট্রাকটাকে দখল করার এবং লোকগুলোকে আহত, নিহত অথবা বন্দী করার সবরকম চেষ্টা চালিয়ে যাবে তোমরা। গুলি শুরু হলেই বুঝবে, সত্যি এয়ার অ্যাটাক হবে এবং ইসরায়েলি বিমান বহরকে সাহায্য করাই ওদের উদ্দেশ্য, কথা বলে অপব্যয় করার মত সময় এখন হাতে নেই। আমার বক্তব্য পরিষ্কার হয়েছে?'

একটা কথাও বলল না কেউ। মুখ খুলল আবার জুমলাত। 'ঠিক আছে তাহলে, কেমন? বেশ, আমার দু'পাশে লম্বা একটা লাইন হিসেবে ছড়িয়ে পড়ো সবাই এবার।'

রানওয়ের কিনারা বরাবর ছড়িয়ে পড়ল সবাই। জুমলাত হাত নেড়ে সামনে এগোবার ইঙ্গিত জানাল। তার সাথে রানা এবং হাকাম রয়েছে। ওদের বাঁ দিকে, বিশ গজ দূরে কাফা। ডানদিকে জাফরী। জাফরীর ডান দিকে খালেদ আফাজী। মোটরসাইকেলটা সে রানওয়ের একধারে দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছে।

ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠে গেছে পাহাড়ের এদিকটা। তারপর হঠাৎ প্রায় খাড়া নেমেছে গজ দশেকের মত। এরপর পাহাড়ের গা ক্রমশ ঢালু হয়ে নেমে গেছে পাদদেশে। খুব সতর্কতার সাথে দশ গজ নামার পর ঝোপঝাড়ের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে এগোতে শুরু করল ওরা। ত্রিশ গজের মত নামার পর থামল সবাই। ট্রাকটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

জুমলাতের দূরত্ব অনুমানটা নিখুঁত হয়েছে, ভাবল রানা। ট্রাকটার ঠিক উপরে এসে পৌঁছেচে তিনজনের দলটা। মাথা নিচু করে ঝোপঝাড়ের ভিতর গা ঢাকা দিয়ে আবার এগোতে শুরু করল জুমলাত। তার দু'পাশে হাকাম আর রানা। পিছন থেকে অনুসরণ করছে তাকে। ট্রাক দেখতে পাবার পর থেকে একটা কথাও বলেনি হাকাম। রানার দিকে তাকায়ওনি সে একবার।

ইতিমধ্যে ভোরের আলো পরিষ্কার হয়ে ফুটেছে। তবে পুবাকাশ এখনও রাঙা হয়ে ওঠেনি। দু'পাশে তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেল না রানা। ডানদিকে বিশ গজ দূরে একটা ঝোপকে শুধু নড়তে দেখে বুঝল, জাফরী সন্তর্পণে নিচের দিকে নামছে।

কোথাও কোন শব্দ নেই। গাছের মাথা থেকে পাখিদের কিচিরমিচির আসছে না। ভোর না সন্ধ্যা, বোঝার কোন উপায় নেই। শুধু শীতল বাতাস লাগছে মুখে, জুড়িয়ে যাচ্ছে শরীর।

ট্রাকটা যখন ওদের কাছ থেকে একশো গজের ভিতরে, জুমলাতের একটা হাত ধরল রানা। রানার দৃষ্টি অনুসরণ করে উত্তরের শেষপ্রান্তের খানিকটা এদিকে আরও একটা ট্রাক দেখল জুমলাত। ওরা আরও খানিক নিচে নামলে সেটাকে আর দেখতে পাওয়া যাবে না, তার কারণ, পাহাড়ের গা উটের পিঠের মত ফুলে আছে বেশ অনেকটা জায়গা নিয়ে। ছোট ছোট লোকজন দেখা যাচ্ছে ট্রাকটার পিছনে। স্মোক কনটেইনার বা ওই ধরনের কিছু ধরাধরি করে নিচে নামাচ্ছে তারা।

আরও বিশ গজ নামল ওরা। রিস্টওয়াচ দেখে জুমলাত থামল। 'পাঁচ মিনিট পেরিয়ে গেছে। আমি যাচ্ছি। দেখি, কি বলবার আছে ওদের।'

'এ আত্মহত্যার সামিল,' বলল রানা। 'ওদেরকে চ্যালেঞ্জ করলে ওরা তোমাকে খুন করবে।'

'তাতে দুঃখ কিসের? তবু তো একটা ভাল কাজ করতে গিয়ে মরব। না, রানা, এতবড় দায়িত্ব আমি কারও ঘাড়ে চাপাতে পারি না।'

'তুমি বোধহয় আমাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছ না। তাই, আমাকে সাথে নাও এ কথা বলতে পারি না। কিন্তু আর কাউকে...?'

'নিজের প্রাণের ওপর ঝুঁকি নিতে পারি আমি,' বলল জুমলাত। 'আর কাউকে সাথে করে মৃত্যুর দুয়ারে কেন নিয়ে যাব? রানা, তোমাকে আমি এখন আর অবিশ্বাস করছি না। যদি ফিরে না আসি, জানবে, তোমার দেশপ্রেমের প্রতি আমার মনে কোন সন্দেহ নেই।'

'ঠিক আছে, ধন্যবাদ,' বলল রানা। 'একটা ব্যাপার খেয়াল রেখো, ওদের সাথে কথা বলার সময় আমার রাইফেলের নল থেকে সরে থাকতে হবে তোমাকে। সাধারণত লক্ষ্যভ্রষ্ট হই না আমি। তোমাকে আমি সারাক্ষণ কাভার দিয়ে রাখছি।'

'ধন্যবাদ, রানা,' সিধে হয়ে দাঁড়াল জুমলাত। পাহাড়ের ঢালু গা বেয়ে নিচে নেমে যেতে শুরু করল। এতটুকু উত্তেজনা বা ভীতি নেই লোকটার মধ্যে, ভাবছে রানা। ধীরে ধীরে দৃঢ় পায়ে নেমে যাচ্ছে সে। মুখ তুলে ট্রাক বা লোকগুলোর দিকে তাকাচ্ছেই না। এমন আত্মবিশ্বাস, দায়িত্বের প্রতি নিবেদিত প্রাণ লোক যে-কোন সামরিক বাহিনীর গর্বের বস্তু, মনে হলো ওর।

গোটা ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক, ভাবছে রানা, অথচ, এর মধ্যে অস্বাভাবিকতা কোথাও আছে বলে বিশ্বাস হয় না। শান্ত, স্থির মস্তিষ্কের অধিকারী সার্জেন্ট গওহর জুমলাতের কৃতিত্ব এইখানেই। বিপদ যত বড়ই হোক, মাথা ঠাণ্ডা রেখে কর্তব্য পালন করার দুর্লভ গুণ রয়েছে তার।

অনায়াস ভঙ্গিতে এখনও নেমে যাচ্ছে জুমলাত। কোমরের হোলস্টারে রিভলভারটা দুলছে। একবারও পিছন ফিরে তাকায়নি সে। হাঁটার মধ্যে কোন জড়তা বা দ্বিধা নেই। একেবারে ট্রাকটার কাছে গিয়ে সে মুখ তুলল। নিচে পৌঁছে গেছে এখন। ট্রাকটার কাছ থেকে সে যখন আর মাত্র পনেরো গজ দূরে, ওটার পিছন থেকে নামল একজন লোক মাটিতে।

ইউনিফর্ম দেখে বোঝা যায়, লোকটা L.A.F-এর একজন সার্জেন্ট। চলতে চলতে জুমলাত সামান্য একটু সরে গেল একপাশে, যাতে রানার গুলির মুখে থাকে লোকটা। রাইফেল কক্ করে কাঁধে ঠেকাল রানা সেটাকে। লক্ষ্য স্থির করে অপেক্ষা করতে চায় ও। লোকটা নিরস্ত্র। তার হাবভাবে শত্রুতার কোন চিহ্ন নেই।

পাঁচ গজ দূরের ঝোপ থেকে হাকাম বলল, 'দেখো, গুলি যেন ঝট করে বেরিয়ে না যায় আবার। গায়ে ইউনিফর্ম চড়ানো থাকলেই খুন করার শাস্তি এড়ানো যায় না।'

উত্তর দিল না রানা। গভীর মনোযোগ দিয়ে নিচের দিকে চেয়ে আছে ও। রাইফেলধারি গার্ডটা টহল দিচ্ছে আগের মতই। কোনদিকে বিশেষভাবে খেয়াল দেবার প্রয়োজন বোধ করছে না সে। L.A.F-এর সার্জেন্ট কথা বলছে জুমলাতের সাথে। তার দাঁড়াবার ভঙ্গি, কথা বলার ভঙ্গি, হাত নাড়ার ভঙ্গি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। ট্রাকের উপর থেকে দু'জন লোক তাকিয়ে আছে ওদের দু'জনের দিকে। উত্তেজনার বা ভীতির কোন চিহ্ন নেই কারও মধ্যে। বিনকিউলারটা সাথে থাকলে খুব সুবিধে হত, ভাবছে রানা। জুমলাত নিজের পিছন দিকটা দেখাল হাত নেড়ে। কি বলছে সে তা বোঝার কোন উপায় নেই। হয়ত বলছে, পিছনে আমার লোকদের রেখে এসেছি আমি। L.A.F-এর সার্জেন্ট এদিকে তাকাল। একটু যেন উত্তেজিত মনে হলো তাকে। কিন্তু পরমুহূর্তে হাসতে শুরু করল সে। মাথাটা হেলে পড়ল পিছন দিকে। অদম্য হাসিতে বেসামাল হয়ে পড়েছে যেন।

তারপর, চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে বদলে গেল সবকিছু। জুমলাতের সামনে দাঁড়ানো লোকটা পকেট থেকে রিভলভারটা বের করল। ঠিক সেই সময় মেঘের ফাঁক থেকে মাথা তুলে উঁকি মারল সূর্য। রিভলভার ধরা হাত নেড়ে জুমলাতকে ট্রাকের দিকে এগোবার ইঙ্গিত করছে লোকটা। রোদ লেগে চকচক করে উঠল রিভলভারটা।

আপনা আপনি রাইফেলের ট্রিগারে আঙুল চেপে বসল রানার।

'আমি ইসরায়েল,' রানার ঠিক পিছন থেকে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল। 'এটা অভিনয় নয়। গুলি করেছ কি মরেছ!'

শুধু অভিনয় নয়, নাটকীয়তা ভালবাসে জাফরী, তাই সে প্রথমেই গুলি করেনি, ভাবল রানা। ধীরে ধীরে অত্যন্ত সাবধানে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ও। চার গজ পিছনে একটা ঝোপের ভিতর বসে আছে সে। রাইফেলের নল আর চোখ দুটো পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে শুধু।

'রাইফেল ফেলে ঠিক যেমন বসে আছ তেমনি বসে থাকো, রানা,' জাফরী বলল। 'ঠিক এই মুহূর্তে তোমাকে আমি গুলি করছি না। দেখা দরকার, কোথাকার পানি কোথায় গড়ায়। আওয়াজ করে সবাইকে আমি সতর্ক করে দিতে চাই না শেষ মুহূর্তে। তবে ভুল বুঝো না। প্রয়োজন মনে করলে তোমাকে খতম করতে দ্বিধা করব না আমি। সাবধান, এমন কোন ভঙ্গি কোরো না যাতে কারও মনে সন্দেহ হয়

পিছনে তোমার আজরাইল লেগেছে।'

চোখের কোণ দিয়ে পরিষ্কার দেখল রানা জিনিসটাকে উড়ে আসতে। একচুল নড়ল না ও। সুন্দর লক্ষ্য হাকামের। ঠিক ঝোপটার ভিতর পড়বে বলে মনে হলো গ্রেনেডটা। পড়বার আগেই কান ফাটানো শব্দে গর্জে উঠল একটা রাইফেল। ঝোপটা দুলে উঠল, এইটুকুই শুধু দেখতে পেল রানা। রাইফেলটা ধরে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল ও। সামনে তাকিয়ে দেখল ট্রাকের দিকে এগোচ্ছে জুমলাত। রাইফেল তুলেই গুলি করল রানা। গুলির শব্দটা শোনা গেল না আলাদা ভাবে। একই সাথে ফাটল গ্রেনেডটা।

পিঠ আর মাথার উপর পাথর আর মাটির ঝর ঝর পতন যেন একযুগ পর থামল। নড়েচড়ে মাথা ঝাঁকিয়ে মুখ তুলল ও। আশ্চর্য হয়ে গেল রানা লোকটাকে দেখে। এখনও পড়ে যায়নি। গুলিটা লেগেছে শিরদাঁড়ায় সম্ভবত। পিঠ বাঁকা হয়ে গেছে ধনুকের মত। মন্থর গতিতে ঘুরছে সে পাক খাবার ভঙ্গিতে, সেই সাথে হাঁটু দুটো তার ভাঁজ হয়ে যাচ্ছে। ক্রমশ ছোট হয়ে যাচ্ছে লোকটা লম্বায়। কাঁধ থেকে রাইফেল নামাল না রানা, দ্রুত বোল্ট টেনে ভরে নিল দ্বিতীয় বুলেট।

এক সেকেন্ডের জন্যে ইতস্তত করল জুমলাত। লোকটার পতন দেখছে সে। দৃশ্যটা যেন কোন ছায়াছবির স্টীল ফটোগ্রাফ। ট্রাকের পিছনে দাঁড়ানো লোক দু'জন অপলক চেয়ে আছে, মন্ত্রমুগ্ধের মত কাঁটাতারের বেড়া ঘেঁষে স্মোক কনটেইনার বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল দু'জন, থমকে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইল তারা এদিকে।

পরমুহূর্তে চলচ্চিত্রের মত একসাথে জীবন্ত হয়ে উঠল সবাই। ঘুরে দাঁড়িয়ে ঝড়ের বেগে ছুটতে শুরু করল জুমলাত। স্মোক কনটেইনার ছেড়ে দিয়ে লোক দু'জন ছুটল ট্রাকের দিকে। ট্রাকের উপর দাঁড়ানো লোক দু'জন অদৃশ্য হয়ে গেল ভিতরে। দুই সেকেন্ড পরই আবার দেখা গেল তাদের রাইফেল সহ। সঙ্গে আরও দু'জন জুটেছে।

গ্রেনেড ফাটার পর থেকে চার কি পাঁচ সেকেন্ড মাত্র সময় পেরিয়েছে। দশ গজ এগিয়ে হোলস্টার থেকে রিভলভার বের করে ফেলল জুমলাত। ঝট্ করে পিছন ফিরেই গুলি করল সে। তারপর এঁকেবেঁকে উঠতে শুরু করল ঢালু পাহাড়ের গা বেয়ে। ট্রাকের পিছনে দাঁড়ানো লোকগুলোর দিকে গুলি করল রানা। পাশ থেকে গর্জে উঠল আরও একটা রাইফেল। গুলি ভরার ফাঁকে পাশে তাকাল রানা। হাসছে সাইয়িদ হাকাম। 'দুঃখিত,' সংক্ষেপে ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল সে।

'প্রাণ বাঁচিয়েছ,' গুলি করল রানা, তারপর আবার বলল, 'সে জন্যে তোমার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।'

উত্তরে কি যেন বলল হাকাম, কিন্তু শুনতে পেল না রানা। ঝোপের আড়াল থেকে গুলি করছে এখন সবাই। ওর বুলেটটা সরাসরি ট্রাকের উপর হাঁটু ভাঁজ করে বসা লোকটার গলায় গিয়ে ঢুকেছে। চিত হয়ে শুয়ে পড়ল সে। শরীরের অর্ধেকটা ঝুলছে নিচের দিকে। তার পরিণতি দেখে পিছিয়ে গিয়ে ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল

বাকি তিনজন।

তাড়া খাওয়া শিয়ালের মত কাঁটাতারের বেড়া ঘেঁষে ছুটছে আরও দু'জন লোক। আফাজী, কাফা এবং অন্যান্যদের বুলেট তাদের পায়ের কাছে মাটিতে গর্ত তৈরি করছে অনবরত। একটা বুলেটও লাগল না কারও গায়ে, ট্রাকের আড়ালে চলে গেল দু'জনই।

'ট্রাকের স্টিয়ারিং হুইলের দিকে পিছন ফিরে বসে জানালা দিয়ে গুলি করছে ওরা,' একমুহূর্ত পর বলল হাকাম। পরমুহূর্তে জানালার ফাঁকের কাছে দুটো নল দেখল রানা রাইফেলের। ঝলসে উঠল আগুনের শিখা। গুলির আওয়াজ হলো। জুমলাতের পায়ের কাছে ছিটকে উঠল একরাশ বালি। কয়েক সেকেন্ড সময় নিয়ে জানালার ফাঁকে লক্ষ্য স্থির করল রানা। একের পর এক পাঁচ রাউন্ড গুলি করল ও। আর সবাইও তাই করছে। কিন্তু কারও লক্ষ্য সফল হলো কিনা ঠিক বোঝা গেল না। তবে, শত্রুদের লক্ষ্য ব্যর্থ হলো এতে করে। জুমলাতকে একটা বুলেটও স্পর্শ করতে পারেনি। প্রায় খাড়া জায়গাটায় পৌঁছে গেছে সে। হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গিয়ে তার বাড়িয়ে দেয়া হাতটা ধরল রানা। টেনে তুলল আড়াই মণ ওজনের শরীরটাকে। হাপরের মত হাঁপাচ্ছে সে। দেখে মনে হল রানার, এইমাত্র গোসল করে এল সে। রাইফেল তুলতে গিয়ে থমকাল রানা। মাত্র ছয় রাউন্ড অবশিষ্ট আছে ওর। 'এখন কি করব আমরা?'

হাঁপাতে হাঁপাতে প্রশ্ন করল জুমলাত। 'আমি ভেবেছিলাম তোমার ওপর হামলা করা হয়েছে, রানা?'

'ঠিকই ভেবেছ তুমি,' জুমলাতের অপরপাশ থেকে জবাব দিল বম্বারডিয়ার! 'ওকে গুলি করতে বাধা দিচ্ছিল পিছন থেকে জাফরী। আমি দেখতে পেয়ে বুঝতে পারি ব্যাপারটা। তাছাড়া,' বেশ কিছুক্ষণ থেকেই ওকে আমি সন্দেহ করছিলাম। জানো, ও আর নঈম যাকের আমাকে দিয়ে এমন সব কাজ করিয়ে নিয়েছে···অথচ আমি জানতামই না যে···।'

'লেকচার বন্ধ করো!' ধমক মারল জুমলাত। 'গ্রেনেড কে ছুঁড়েছে, সেটাই আমি জানতে চাই।'

অভিমানে মুখ ফুলিয়ে হাকাম বলল, 'আমি।'

'মারা গেছে জাফরী?'

'জানি না,' বলল হাকাম। 'খুঁজে পাইনি ওকে ঝোপের ভিতর। হাড় আর খানিকটা ধুলো মাখা মাংসের দলা দেখেছি—সম্ভবত ওরই অবশিষ্টাংশ।'

'হুঁ,' গম্ভীর হল জুমলাত। রানার দিকে ফিরল সে। 'তুমি ওর সাথে একমত, রানা? জাফরী জামাল আরসালানের একজন অনুচর ছিল?'

'কোন সন্দেহ নেই।'

ব্যাপারটা সম্পর্কে দ্বিতীয় কোন মন্তব্যই করল না জুমলাত। 'আফাজী!'

চিৎকার শুনে চল্লিশ গজ দূর থেকে সাড়া দিল আফাজী। 'ইয়েস, সার্জেন্ট।'

'ছুটে এসো!' ঝোপের ভিতর থেকে তৃতীয় একটা চিৎকার শোনা গেল। কাফার।

ক্রল করে বেরিয়ে এল ঝোপের আড়াল থেকে আফাজী। জুমলাত হাত দেখাতে থামল সে।

'মোটর সাইকেল নিয়ে গানপিটে চলে যাও। ওখান থেকে ফোন করো অপারেশন কন্ট্রোলরূমে। যা ঘটেছে সব বলবে ওদেরকে। ট্রাকগুলোকে ধ্বংস বা দখল করার জন্যে রিজার্ভ বাহিনী দরকার আমাদের। মুহূর্তমাত্র দেরি না করে অ্যাটাক অ্যালার্ম ঘোষণা করতে বলবে ওদের। গ্রাউন্ড ডিফেন্সের প্রতিটি পয়েন্টে যেন লোকজন তৈরি হয়ে থাকে। বলবে, আধ ঘণ্টার মধ্যে ব্যাপক এয়ার অ্যাটাকের আশঙ্কা আছে। ও. কে?'

'ও. কে।' বাঁক নিয়ে ক্রল করে উঠতে শুরু করল খালেদ আফাজী।

'স্টেশন হেডকোয়ার্টার থেকে armoured car আনালে কেমন হয়?' বলল হাকাম, 'এ ধরনের কাজের জন্যে ওটাই দরকার।'

'রাইট,' বলল জুমলাত। আফাজীর দিকে ফিরল সে। উঠে দাঁড়িয়েছে আফাজী। ছুট দিতে যাচ্ছে সে। পিছন থেকে চিৎকার করে জুমলাত বলল, 'ফোন করার পর হেডকোয়ার্টারে যাবে তুমি, আফাজী। armoured car-টা চালায় যারা তাদেরকে খুঁজে বের করবে। যেভাবে হোক, এখানে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করবে ওটাকে।'

'ঠিক আছে,' ছুটে অদৃশ্য হয়ে গেল আফাজী ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর।

'ওরা একটা ব্রেনগান বের করছে,' বলল হাকাম। তার রাইফেল গর্জে উঠল। ট্রাকের পিছন দিকে কয়েকজন লোককে দেখা যাচ্ছে। একজন মাথা নিচু করে নিল। তারপর শুয়ে পড়ল লম্বা হয়ে। গুলি করল রানা। দ্বিতীয় লোকটা ঘুরে দাঁড়িয়ে দ্রুত ফিরে যাচ্ছিল। ডান পা-টা পিছন দিকে ভাঁজ হয়ে গেল তার। বস্তার মত পড়ে গেল সে ট্রাকের মেঝেতে। ঝুপ ঝুপ করে লাফ দিয়ে নিচে নামল দু'জন লোক। দাঁড়াল না তারা। হাত বাড়িয়ে ট্রাকের উপর থেকে টেনে নামাচ্ছে তারা দুটো গান আর চারটে অ্যামুনিশনের বাক্স। লক্ষ্যস্থির করে গুলি করল আবার রানা। তারপর আবার। বাঁ পাশ থেকে কাফার রাইফেল থেকেও বুলেট ছুটল কিছুতেই কিছু হলো না। তারা ট্রাকের পিছনে নিয়ে চলে গেল গান দুটো।

'হোল্ড ইওর ফায়ার!' চিৎকার করে নির্দেশ দিল জুমলাত।

আর কোন বিকল্প নেই। প্রত্যেকের বুলেট প্রায় শূন্যের কোঠায় এসে ঠেকেছে। নতুন সরবরাহ না আসা পর্যন্ত হাতে কিছু অবশিষ্ট রাখতে হবে।

তর্জনী দিয়ে রানার কাঁধে খোঁচা মারল গওহর জুমলাত। 'বেড়ার দিকে দেখো। কারা বলো তো ওরা? গার্ড। দেখতে পাচ্ছ?'

খাপমুক্ত বেয়োনেটসহ রাইফেল বাগিয়ে ধরে বেড়া ঘেঁষে দু'জন গার্ড ছুটে যাচ্ছে ট্রাকটার দিকে। অন্যান্য আরও সাত-আটজন ছড়িয়ে ছিটিয়ে ঘাসের উপর

দিয়ে এগোচ্ছে, ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে পথ তৈরি করে নিয়ে। রিস্টওয়াচ দেখল রানা। চারটে বেজে ঊনষাট মিনিট। উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল ও। আরও তিনটে ট্রাক রয়েছে স্টেশনে। সেগুলোর ব্যাপারে কিছুই করতে পারেনি ওরা। বেড়া ঘেঁষে সিলিণ্ডারগুলো দক্ষিণ দিকে নিয়ে যাওয়া হলেও ওগুলোকে এখন আর কোন কাজে লাগানো সম্ভব নয়। কে যাবে ওদের মধ্যে থেকে ওদিকে? কিন্তু ট্রাকটায় স্মোক কনটেইনার আরও আছে, সেগুলোর সাহায্যে স্মোক স্ক্রিন তৈরি করা সম্ভব। এবং চেষ্টার ত্রুটি করবে না তারা।

'বাকি তিনটে ট্রাকের ব্যাপারে কিছু করা দরকার,' জুমলাতকে বলল রানা।

'হ্যাঁ—কিন্তু কি করা যেতে পারে? Armoured car ছাড়া আর তো কোন উপায় দেখছি না।'

ওটা আসতে অনেক দেরি হয়ে যেতে পারে।'

কি যেন বলতে যাচ্ছিল জুমলাত, ব্রেনগানের বিকট আওয়াজ থরথর করে বুকের নিচের মাটি কাঁপিয়ে দিতে চুপ করে গেল সে। ওদের দিকে লক্ষ করে নয়, ঝোপের ভিতর গা ঢাকা দিয়ে এগোচ্ছে গার্ডেরা, তাদের দিকে গুলি করছে ওরা ট্রাকের পিছন থেকে।

বিদ্যুৎ চমকের মত একটা কথা উদয় হলো রানার মনে। 'মাই গড, সার্জেন্ট! Bofors! গোটা ঢালু জায়গাটা পাঁচ নম্বর পিটের গুলি করার আওতার মধ্যেই পড়েছে। অনায়াসে Bofors-এর নাক ঘুরিয়ে একটা একটা করে সবগুলো ট্রাককেই গুঁড়ো করে দেয়া সম্ভব।'

'খোদার কসম, একেবারে খাঁটি কথা বলেছ তুমি!' আনন্দ-উত্তেজনায় লাফ দিয়ে উঠে বসল জুমলাত, হাকামের দিকে ফিরল সে। 'টেক চার্জ, বম্বারডিয়ার। আমি আর রানা পাঁচ নম্বর পিটে যাচ্ছি।'

'দাঁড়াও!' রুদ্ধশ্বাসে অন্যদিকে তাকিয়ে বলল হাকাম।

হামাগুড়ি দিতে শুরু করেছিল ওরা, দু'জনেই ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল।

'ক্রাইস্ট! এভাবে কাউকে আত্মহত্যা করতে যেতে দেখিনি,' শিউরে উঠল হাকাম।

ঘুরে ট্রাকের দিকে ফিরল রানা। সামনের দৃশ্যটা দেখে কেঁপে গেল ওর বুক। ঢালু জায়গা দিয়ে তীরবেগে নামছে লোকটা। এত দ্রুত নামছে, প্রথমে তাকে চিনতেই পারল না রানা। যে-কোন মুহূর্তে হোঁচট খেয়ে গড়াতে শুরু করতে পারে সে। ট্রাকটা তার কাছ থেকে এখনও অনেক দূরে। সে পৌঁছুবার আগেই ব্রেনগানধারীরা দেখে ফেলবে ওকে। স্রেফ চালুনির মত ঝাঁঝরা করে দেবে শরীরটাকে।

কাফা উন্মত্ত শূকরের মত নেমে যাচ্ছে। মাথার উপর তুলে ধরেছে সে রাইফেলটা। রোদ লেগে চকচক করছে তার বেয়োনেট। 'পাগল হয়ে গেছে নাকি ও?'

কানের পর্দায় অনবরত বাড়ি মারছে ব্রেনগানের আওয়াজ। ও-দুটোর সমস্ত রোষ গার্ডদের দিকেই এখন পর্যন্ত। একমুহূর্ত পরই আশঙ্কা সত্যে পরিণত হল রানার। তারা দেখতে পেয়েছে কাফাকে। মুহূর্তের জন্যে নিস্তব্ধ হয়ে গেল পরিবেশটা। গান দুটো দিক পরিবর্তন করছে।

নিক্ষিপ্ত তীরের মত এখনও ছুটে নেমে যাচ্ছে কাফা। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রানা পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে কি ঘটতে যাচ্ছে। ঢালু জায়গা থেকে বিরাট এক লাফ দিয়ে সমতল ভূমিতে নামল সে। ব্রেনগানের আওয়াজ আবার শুনতে পাবার অপেক্ষায় টান টান হয়ে উঠল রানার শরীরের পেশী। ট্রাকের কাছ থেকে এখনও ত্রিশ গজ দূরে কাফা। কখনই পৌঁছুতে পারবে না সে ওখানে।

হঠাৎ যেন কিসের সাথে ধাক্কা খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল কাফা। তার ডান হাতটা মাথার উপর তুলে পিছন দিকে সরিয়ে আনল সে। মুহূর্তের জন্যে জ্যাভেলিন থ্রো-র ভঙ্গিতে একটা মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কাফা। তারপর দ্রুত তার হাতটা সামনের দিকে চলে এল। মুঠো আলগা হয়ে যেতে ছড়িয়ে পড়ল পাঁচটা আঙুল, পরিষ্কার দেখতে পেল রানা। সদ্যমুক্ত পাখির মত বেরিয়ে গেল জিনিসটা মুঠো থেকে। রঙধনুর মত বাঁকা একটা পথ তৈরি করে নিয়ে মন্থর গতিতে উড়ে যাচ্ছে। ভুলে ছিল রানা, ঠা ঠা আওয়াজ তুলে ব্রেনগানটা নিজের অস্তিত্ব জাহির করল ঠিক সেই সময়। তাল সামলাতে গিয়ে থরথর করে কেঁপে উঠল কাফা। পরমুহূর্তে লুটিয়ে পড়ল সে ঘাসের উপর।

কাফার ছুঁড়ে দেয়া গ্রেনেডটা কোন্‌দিকে গেল, শেষ পর্যন্ত দেখা হয়নি রানার। তবে, তার লক্ষ্যটা নিখুঁতই ছিল বলে মনে হলো ওর। ঘাসের উপর সে লুটিয়ে পড়ল, সেই সাথে তীব্র আলোর ঝলক দেখল ও ট্রাকটার নিচে। বিস্ফোরণের আওয়াজ ভরাট নয়, তীক্ষ্ণ লাগল কানে। দুলে উঠল ট্রাকটা। কাঠের কয়েকটা টুকরো সাঁ সাঁ করে উড়ে গেল চারদিকে।

বিস্ফোরণের পর পরিপূর্ণ নিস্তব্ধতা। তারপর নিঃশব্দে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল অঢেল ধোঁয়া। রানার মনে হলো, ট্রাকটায় বুঝি আগুন ধরে গেছে। কিন্তু ধোঁয়ার বিপুল উত্থান দেখে ভুল ভাঙল ওর। স্মোক সিলিন্ডার ফেটে গেছে, বুঝতে পারল ও।

বিস্ফোরণের শব্দ শোনার পরপরই আবার উঠে দাঁড়িয়েছে কাফা। তার দৌড়টা এখন আগের মত উন্মত্ত নয়। সামনে একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য রেখে দৃঢ়সংকল্পের সাথে ছুটছে সে। প্রতিটি পদক্ষেপ দ্রুত, কিন্তু দৃঢ়তার ছাপ স্পষ্ট।

দৃশ্যটা অলৌকিক বলে মনে হল রানার। ব্রেনগানের অসংখ্য বুলেট কি এক যাদুবলে কাফার শরীরের দু'পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। ট্রাকের পাশে পৌঁছে গেছে সে। সামনের ব্রেনগানের পিছন থেকে টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল একজন লোক। আগে থেকেই যেন ঠিক করা ছিল ব্যাপারটা, লোকটা উঠে দাঁড়াবে আর কাফা গিয়ে পড়বে তার উপর। ঠিক তাই ঘটল।

রাইফেলটা দু'হাতে ধরে ছুটছিল কাফা। লোকটা দাঁড়াতেই তার উপর পড়ল

রাইফেলের আগাটা। লোকটা পড়ে গেল মাটিতে। পরমুহূর্তে রানা দেখল, হেঁচকা টান মেরে লোকটার বুক থেকে বেয়োনেটটা বের করে নিচ্ছে কাফা।

আর একটা শিকার পালাচ্ছে, দেখেই ধাওয়া করল কাফা। ট্রাকের উপর একটা পা তুলে দিয়ে ঘাড় ফিরিয়েই ভুল করল লোকটা। কাফাকে আসতে দেখে ভয়ে অচল হয়ে গেল তার হাত-পা। সোজা ছুটে এল কাফা। আগে আগে আসছে রাইফেলের মাথায় বেয়োনেট।

একচুল নড়ল না লোকটা। একটা ঝাঁকুনি খেল সে। রানা দেখল, হতভম্ব হয়ে গেছে লোকটা। ঘাড়টা আরও একটু বাঁকা করে নিজের পিঠ দেখল সে। কাফা ওদিকে ব্যস্ত, কোনদিকে খেয়াল দেবার সময় নেই তার। এক সেকেন্ডের বেশি সর্বনাশটা দেখতে দিল না লোকটাকে, টান মেরে তার পিঠ থেকে বের করে নিল বেয়োনেটটা।

পরমুহূর্তে আর দেখা গেল না কাফাকে। পুরু কালো ধোঁয়া ট্রাকটাকে গ্রাস করল হঠাৎ। মাটি থেকে ট্রাকের মাথার অনেক উপর পর্যন্ত মোটা চাদরের মত ধোঁয়ার পর্দা। বাতাস এসে পাহাড়ের ঢালু গায়ের দিকে সরিয়ে আনল পর্দাটাকে, আড়াল হয়ে গেল ট্রাক দৃষ্টিপথ থেকে।

আট

'লোকটা আমাকে বলল উইং কমান্ডার তারেক হামেদীর নির্দেশে কাজ করছে তারা,' পাহাড়ে চড়ে উত্তর দিকে ছুটছে গওহর জুমলাত, পাশে রানা। 'কাজটা কি জানতে চাইলাম। বলল, হেভী এয়ার অ্যাটাকের সময় অ্যারোড্রোমকে রক্ষা করার জন্যে স্মোকস্ক্রিন কতটা কার্যকরী হতে পারে তারই পরীক্ষা। নির্দেশপত্র দেখতে চাইলে আমাকে বলল, উইং কমান্ডার মৌখিক নির্দেশ দিয়েছেন, লিখিত কিছু দেননি। আমি বললাম, সেক্ষেত্রে স্মোক সিলিন্ডারগুলো ট্রাকে তুলে ফেলার নির্দেশ দিয়ে আমার সাথে স্টেশন হেডকোয়ার্টারে চলো লিখিত নির্দেশ সংগ্রহ করার জন্যে। আমাকে তুমি অবিশ্বাস করছ—এই কথা বলে অট্টহাসি হাসতে শুরু করে সে। হাসতে হাসতেই পকেট থেকে রিভলভার বের করে আমাকে ট্রাকে ওঠার হুকুম করে।'

পাঁচ নম্বর পিট দূর থেকে দেখা যাচ্ছে। Bofors-এর লম্বা ব্যারেল বালির বস্তা দিয়ে তৈরি প্রাচীরের উপর মাথা তুলে আছে তির্যকভাবে। পিটের ভিতর নড়তে চড়তে দেখা যাচ্ছে স্টীল হেলমেটগুলোকে। টিমের অন্যান্যরা জটলা বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে তাদের ছাউনির সামনে। যুদ্ধের পোশাক পরে পুরোপুরি তৈরি সবাই।

ঠিক পাহাড়ের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে পাঁচ নম্বর পিট। পিটের প্রায় সরাসরি নিচে দাঁড়িয়ে আছে একটা ট্রাক। আরেকটা দেখা যাচ্ছে বেড়ার গা ঘেঁষে সাতশো গজ আরও উত্তরে।

আলোচনায় মুখ্য ভূমিকা নিল রানাই। প্রথমেই একটা আতঙ্ক ঢুকিয়ে দিল ও খাদিমের মনেঃ ট্রাকগুলোকে যদি ধ্বংস করা না যায় তাহলে আধঘণ্টার মধ্যে অ্যারোড্রোমের উপর তৈরি হয়ে যাবে ঘন একটা স্মোকস্ক্রিন, তার আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে শত্রুবিমানগুলো একের পর এক নামবে রানওয়েতে, বেদখল হয়ে যাবে ইসরায়েলি প্যারাট্রুপারদের হাতে গোটা নাবাতিয়া এবং এর জন্যে দায়ী থাকবে একমাত্র পাঁচ নম্বর পিটের ইনচার্জ সার্জেন্ট আল খাদিম। ইসরায়েলিদের হাত থেকে সে যদি দৈবক্রমে রেহাই পায়ও, লেবানন সামরিক বাহিনী তার কোর্টমার্শাল না করে ছাড়বে না।

শত্রুকে ব্যর্থ করার জন্যে রানার মধ্যে যে দৃঢ় প্রত্যয় ফুটে উঠেছে তাতেই কাজ হল। রানার হাবভাব লক্ষ্য করতে করতে খাদিমের ভিতরও সংক্রামিত হলো একটা উত্তেজনা। সম্মোহিত হয়ে পড়ল সে। কাত্ করল মাথা। ইতিমধ্যে যথেষ্ট বালির বস্তা নামানো হয়ে গেছে। জুমলাত অবাক বিস্ময়ে শুনতে পেল খাদিমের বিকট চিৎকার 'গেট রেডি!'

দক্ষিণের নিচে থেকে প্রকাণ্ড মেঘের মত উঠে আসছে বিশাল একটা ধোঁয়ার পাহাড়। বাতাস একেবারেই যে নেই তা নয়। কিন্তু সে-বাতাস ধোঁয়ার খণ্ডটাকে বিচ্ছিন্ন করছে না, উপরে এবং রানওয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছে গোটা শরীরটাকেই।

'লেয়ার্স অন। লোড!' সার্জেন্ট খাদিমের গলার রগ ফুলে উঠতে দেখল রানা। 'লে অন দ্যাট L. A. F. ট্রাক। vertical zero, lateral zero!'

'অন, অন!' প্ল্যাটফর্ম থেকে উত্তর এল।

'সেট টু অটো। ওয়ান বার্স্ট। ফায়ার!'

উম্‌ম্‌-পম্‌-উম্‌ম্‌-পম্‌, উম্‌ম্‌-পম্‌—অকস্মাৎ যান্ত্রিক শব্দের সাথে গর্জে উঠল কামান, ভূমিকম্পের মত কেঁপে উঠল পায়ের নিচে মাটি। প্রতিটি শটের সাথে ব্যারেল ধাক্কা খেয়ে আগুপিছু করল দ্রুত। বাতাস চিরে বেরিয়ে যাচ্ছে শেলগুলো ছোট আকারের জ্বলন্ত কমলালেবুর মত পরস্পরকে ধাওয়া করতে করতে নির্দিষ্ট লক্ষ্যস্থলের দিকে। ঢুস্‌-ঢুস্‌ মৃদু, ভোঁতা শব্দে ফাটল সেগুলো ট্রাকের ঠিক একপাশের কাঠের দেয়ালের মাঝখানে লেগে। পরপর পাঁচটা শট লক্ষ্য ভেদ করে ট্রাকটাকে কয়েক শ' টুকরো করে উড়িয়ে দিল শূন্যে। মাত্র দশ সেকেন্ডের মধ্যে কিছুই অবশিষ্ট দেখা গেল না। বিপুল কালো ধোঁয়ার উত্থান শুরু হল। ঢালু পাহাড়ের গা গ্রাস করতে করতে উপর দিকে হামাগুড়ি দিয়ে আসছে।

'বাই গড, জুমলাত, তোমার কথাই ঠিক,' উত্তেজনায় চিৎকার করে উঠল আল খাদিম। 'এত ধোঁয়া! স্মোকস্ক্রিন তৈরি করাই ওদের উদ্দেশ্য ছিল দেখতে পাচ্ছি।'

'তাড়াতাড়ি! দ্বিতীয় ট্রাকটাও গুঁড়ো করুন! বলল রানা, 'ধোঁয়া উঠে এলে দেখতেই পাওয়া যাবে না আর ওটাকে।'

'কিন্তু সময় কি পাওয়া যাবে…?'

বাঁ দিকে ঘোরানো হল কামানের প্ল্যাটফর্ম। কিন্তু ব্যারেল নামাতে গিয়ে দেখা

পিটে ঢোকার মুখে ওরা দেখল, সার্জেন্ট-ইন-চার্জ ফোনে কথা বলতে ব্যস্ত। প্রথমে বাধা দেয়া হল ওদেরকে, তবে দ্বিতীয় প্রহরী গওহর জুমলাতকে চিনতে পেরে ভিতরে ঢোকার অনুমতি দিল।

'সার্জেন্ট আল খাদিম!'

বিরক্তির সাথে হাত নেড়ে চুপ করতে বলল সার্জেন্ট আল খাদিম জুমলাতকে। এগিয়ে গিয়ে পাশে দাঁড়াল জুমলাত। তর্জনী ভাঁজ করে টোকা মারল তার কাঁধে।

ঝট্ করে ফিরল আল খাদিম। সার্জেন্ট জুমলাতকে দেখেও তার মুখ থেকে রাগের ছাপ এতটুকু ম্লান হল না। 'গোলমাল কোরো না। অত্যন্ত জরুরী একটা মেসেজ। এখন থেকে যে-কোন মুহূর্তে হাজার হাজার ইসরায়েলি সৈন্য অ্যারোড্রোমে ল্যান্ড করতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে...'

'জানি, জানি,' বলল জুমলাত, 'আমারই একজন গানার অপারেশন কন্ট্রোল-রুমে রিপোর্ট করছে। রিসিভারটা নামিয়ে রেখে আমার কথা শোনো এখন।'

নিজের বম্বারডিয়ারকে রিসিভারটা ধরিয়ে দিয়ে জুমলাতের মুখোমুখি দাঁড়াল আল খাদিম। 'কি বলতে চাও...তোমার গানার মানে? কি ঘটছে এসব? গ্রেনেড, ব্রেনগান, রাইফেলের আওয়াজ...!'

'বলছি সব,' বাধা দিল জুমলাত। গর্বের একটা হাসি ফুটে উঠল তার চোখে-মুখে। বুড়ো আঙ্গুল বাঁকা করে পাশে দাঁড়ানো রানাকে দেখাল সে। 'লোকটাকে চিনে রাখো, খাদিম। আমার তো ধারণা, অল্পদিনের মধ্যেই একে দেখা মাত্র আমরা সবাই স্যালুট করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠব। শোনো...।'

আল খাদিম আপাদমস্তক দেখল রানাকে। 'একজন গানার...কি বলছ তুমি, জুমলাত?'

'একজন অসাধারণ গানার,' জুমলাত বলল। 'সব কথা বিস্তারিত বলার সময় নেই। সংক্ষেপে বলছি কিজন্যে এসেছি আমরা। শোনো...।' পরিস্থিতিটা মোটামুটি ব্যাখ্যা করল জুমলাত। কিন্তু সে যখন L. A. F.-এর ছাপ মারা দুটো ট্রাককে Bofors-এর গোলা দিয়ে ধ্বংস করার অনুরোধ জানাল, প্রবলভাবে মাথা দোলাল আল খাদিম।

'অফিসারের অনুমতি ছাড়া?' চোখ কপালে তুলে প্রশ্ন করল সার্জেন্ট খাদিম। 'অসম্ভব। এরকম অনুরোধ এমন কি আমি শুনতে পর্যন্ত চাই না, জুমলাত। ভেবে দেখো, L. A. F.-এর ট্রাকগুলো নকল কিনা তাও আমি জানি না।'

'ঠিক আছে,' রানা বলল, 'আপনি আপনার লোকদের বালির বস্তা নামিয়ে ফেলতে বলুন, যাতে দরকারের সময় গুলি করতে পারা যায় ট্রাকগুলোকে—এই ফাঁকে আমরা ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করে একটা সমাধানে পৌঁছুবার চেষ্টা করি। আপত্তি আছে?'

খানিক ইতস্তত করার পর রাজি হল খাদিম। 'কিন্তু বালির বস্তা নামাতে রাজি হচ্ছি মানে এই নয় যে গোলা দাগতেও রাজি হব আমি।'

গেল আরও বালির বস্তা নামাতে হবে। ওদিকে ˜হাড়ের উপর উঠে গড়িয়ে এগিয়ে আসছে বিশাল আকৃতি নিয়ে কালো, আশ্চর্য রক ভীতিকর ধোঁয়া রাশি। প্রকাণ্ড খণ্ডটার সামনের অংশটা হাতির শুঁড়ের মত আকৃতি নিয়ে গানপিটের দক্ষিণ আকাশ প্রায় ঢেকে ফেলেছে। হঠাৎ তাকালে বোঝা যায় না ওটা ধোঁয়া, নাকি মেঘ, নাকি অচল পাহাড়। পিট এবং ডিসপারসাল পয়েন্টের মাঝখানে আরেকটা ধোঁয়ার প্রাচীর আকাশ ছুঁই ছুঁই করছে। প্রথম ট্রাক থেকে উঠছে এটা।

প্ল্যাটফর্মে সীটে বসে অপারেটর দু'জন যখন ঘোষণা করল আমরা তৈরি তখন কালো ধোঁয়ার আতঙ্ক মাত্র কয়েক গজ দূরে। 'লোড। সেট টু অটো। ওয়ান বার্স্ট। ফায়ার!' প্রথম দুটো আগুনের বল পাহাড়ের ঢালু গায়ে আঘাত করল। প্ল্যাটফর্ম আরও উপরে তোলার নির্দেশ দিল আল খাদিম। তৃতীয় শেলটা ট্রাকের পিছনে, চতুর্থটা সরাসরি কেবিনে গিয়ে ধাক্কা খেল। আরও দুটো শেল ছোঁড়ার পর আল খাদিম নির্দেশ দিল, 'সিজ ফায়ার!' শেষ শেলটাতেই সব শেষ হলো। উল্টে পড়ল ট্রাক কাঁটাতারের বেড়ার উপর। তারপর উঠতে শুরু করল বিপুল কালো ধোঁয়া।

'ধন্যবাদ, সার্জেন্ট,' বলল রানা। হঠাৎ একটা ব্যস্ততা অনুভব করল রানা নিজের মধ্যে। কত কাজ বাকি! যেন মনে পড়ে গেছে সব কথা এক সাথে। এদিকের কাজ হলো, এবার আতাসীকে উদ্ধার করতে হবে। জামাল আরসালানকে খুঁজে বের করতে হবে। স্টেশন হেডকোয়ার্টারে গিয়ে সব কথা বুঝিয়ে বলতে হবে উইং কমান্ডার তারেক হামেদীকে। তা নাহলে তিনি হয়ত গোটা একটা ব্যাটালিয়ান পাঠাবেন ওকে গ্রেফতার করার জন্যে। ওদিকে ইফফাতের খবর নেয়া হয়নি…।

'আর মাত্র একটা ট্রাক, ওটাকে armoured car-এর দায়িত্বে ছেড়ে দেয়া যেতে পারে।'

'এই ধোঁয়ায় যদি সেটা আসতে পারে তবে,' বলল জুমলাত।

'কিছু এসে যায় না,' বলল রানা। 'একটা ট্রাকের কতটুকুই বা ক্ষমতা। গোটা অ্যারোড্রোম জুড়ে স্মোকস্ক্রিন তৈরি করতে পারে না।'

'তা ঠিক, কিন্তু,' জুমলাত বলল, 'যদি এখনই ট্রুপক্যারিয়ারগুলো এসে পড়ে?' বিচলিত দেখা যাচ্ছে তাকে। দেখে মনে হচ্ছে, গোটা, অ্যারোড্রোম ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে যাবে। গ্রাউন্ড ডিফেন্সের করণীয় কিছুই থাকবে না।

রানা হাসল। 'আসুক। ল্যান্ড করতে পারবে না। আসল কথাটা ভুলো না, সার্জেন্ট জুমলাত। ওদের গোটা প্ল্যানটার সফলতা নির্ভর করছে রানওয়ের দুই প্রান্তে বেলুন মার্কারের ওপর। ওই বেলুন দেখেই পাইলটরা ল্যান্ড করবে রানওয়েতে। তাছাড়া, আকাশ এখনও খালি, তারা এসে পৌঁছায়নি, তাই না? ভেবেচিন্তে নির্দিষ্ট একটা সময় বেছে রেখেছে ওরা। ধরো, আমরা যদি বাধা নাও দিতাম, এখনও কি স্মোক কনটেইনারগুলো বিলি করার কাজ শেষ করতে পারত ওরা? না। অন্তত আরও পনেরো মিনিট সময় লাগত। তারপর, অতিরিক্ত কিছুটা

সময় মার্জিন রাখার কথা। অন্তত পঁচিশ মিনিট সময় এখনও আছে, আমার বিশ্বাস। বেশিও থাকতে পারে।' হঠাৎ, বিদ্যুৎ চমকের মত একটা কথা মনে পড়ে গেল ওর। 'জুমলাত, স্টেশন হেডকোয়ার্টারে যেতে হবে আমাকে···।'

'কেন?'

'আর সব স্টেশনকে সাবধান করে দিতে হবে না?'

ঠিক সেই সময় লাউডস্পীকার থেকে ঘোষণা ছড়িয়ে পড়ল বাতাসে, 'অ্যাটেনশান, প্লীজ! অ্যাটেনশান, প্লীজ! অ্যাটাক অ্যালার্ম! অ্যাটাক অ্যালার্ম। গ্রাউন্ড ডিফেন্সের সকল কর্মীকে এই মুহূর্তে যার যার স্টেশনে রিপোর্ট করতে হবে। এদের তৈরি থাকতে হবে ডিসপারসাল পয়েন্টে। বাকি লোকজনকে নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। ক্যাম্পের ভিতর যে যেখানে আছে প্রত্যেককে গ্যাসমাস্ক পরতে হবে।' এবং তারপর দ্বিতীয় ঘোষণায় বলা হল, 'টাইগার অ্যান্ড ঈগল স্কোয়াড্রন টু রেডিনেস ইমিডিয়েটলি।'

'থ্যাঙ্ক গড ফর দ্যাট,' বলল রানা। 'আফাজী কাজের কাজই করেছে বটে। যাকেই সে বলে থাকুক, বিপদটা বুঝিয়ে দিতে পেরেছে অক্ষরে অক্ষরে।'

পিটের টেলিফোন বেজে উঠল। সার্জেন্ট আল খাদিম হাত বাড়াতে যাচ্ছিল, রানা তাকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে গেল। রিসিভারটা তুলে নিয়ে কানে ঠেকাল ও।

'সার্জেন্ট আল খাদিম!'

যা ভেবেছিল রানা, তাই! উইং কমান্ডার, C.O. নাবাতিয়া তারেক হামেদীর ফোন।

সাড়া পেতে দেরি হওয়ায় বাঘের মত গর্জে উঠল উইং কমান্ডার। 'হু ইজ দেয়ার? এটা কি পাঁচ নম্বর পিট নয়?'

শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে রানা বলল, 'ইয়েস।' তিন সেকেন্ড বিরতি নিল রানা। তারপর খুব ধীর-মন্থর বাচন ভঙ্গির সাথে বলল, 'আমি মাসুদ রানা বলছি।'

'রানা!' বিষম খেলেন উইং কমান্ডার। 'গানার মাসুদ রানা? আমি জানতে চাই···।'

'জ্বী, স্যার। মাসুদ রানা।' গানার শব্দটা ইচ্ছে করেই উচ্চারণ করল না রানা। 'আপনি কি জানতে চান তা আমি অনুমান করতে পারছি, স্যার। শুনুন। পরিস্থিতিটা হলোঃ স্মোকস্ক্রিনের আড়ালে থেকে আজ সকালে আমাদের এবং গোটা লেবাননের সমস্ত অ্যারোড্রোমে প্যারাট্রুপার ল্যান্ড করাবার একটা প্ল্যান করা হয়েছে। খানিক আগে L. A. F.-এর ছাপ মারা চারটে ট্রাক স্মোক সিলিন্ডার নিয়ে ক্যাম্পে ঢুকেছে। L. A. F.-এর ইউনিফর্ম রয়েছে ট্রাকগুলোর লোকজনদের পরনে। আমি, মাসুদ রানা, ত্রিশটার ওপর দেখেছি এই ধরনের ট্রাক আল মাকারদানা উপত্যকায়। নেতৃত্ব দিচ্ছিল জামাল আরসালান।'

'কি! কি বললে? মি. জামাল আরসালান···?'

রানা দমন করতে পারল না নিজেকে। 'জ্বী, জামাল আরসালান!' তীব্র ব্যঙ্গ ঝরল ওর কণ্ঠস্বরে। 'আপনার পরম গুরু, জামাল আরসালান। দুঃখিত, স্যার, কিন্তু না বলে পারছি না যে এটা আপনার মস্ত একটা পরাজয়। একজন বেঈমানের সাথে সাড়ে চার বছর ওঠাবসা করছেন অথচ সে যে বেঈমান তা টেরটিও পাননি, কেউ যখন চোখে আঙ্গুল দিয়ে আপনাকে তার পরিচয় জানাবার চেষ্টা করল, তখন আপনি গর্বের সাথে তাকে অবজ্ঞা করলেন।'

'তোমার আর কি বলবার আছে, গানার?' অপমানে রূঢ় শোনাল উইং কমান্ডারের স্বর।

'আমাদের ক্যাম্পে ঢুকে চারটে ট্রাক উত্তর উত্তর-পুব দিকের বেড়া ঘেঁষে বিচ্ছিন্নভাবে ঘাঁটি তৈরি করে। বাতাস ওদিক থেকেই অ্যারোড্রোমের দিকে বইছে। ওদের উদ্দেশ্য ছিল স্মোক কনটেইনার ফাটিয়ে দিয়ে নাবাতিয়ার গোটা আকাশ ঢেকে ফেলা। আমাদের ডিটাচমেন্ট কমান্ডার সার্জেন্ট গওহর জুমলাতের নেতৃত্বে একটা ট্রাককে আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি। আরও দুটোকে এইমাত্র গুঁড়ো করা হয়েছে পাঁচ নম্বর পিটের Bofors-এর সাহায্যে। যতদূর বুঝতে পারছি, যে ধোঁয়া উঠতে দেখতে পাচ্ছেন তা শুধুই ধোঁয়া, গ্যাস নয়। গ্যাস ওরা ব্যবহার করতে পারে না, তার কারণ, তাতে ওদের সৈন্যরাও আক্রান্ত হতে পারে। জামাল আরসালানের প্ল্যান ছিল, নির্দিষ্ট একটা উচ্চতায় রানওয়ের দু'প্রান্তে লাল এবং নীল বেলুন ওড়াবার, যাতে পাইলটরা রানওয়ের শুরু এবং শেষ কোথায় তা বুঝতে পারে।'

'এক মিনিট,' উইং কমান্ডার বললেন। 'জরুরী একটা কথা সেরে নিই আমি।'

বাঁকা হাসল রানা। জরুরী কথাটা কি, অনুমান করতে পারছে ও।

পুরো এক মিনিট পর আবার উইং কমান্ডারের স্বর শুনতে পেল রানা। 'হ্যাঁ, গল্পটা শেষ করো এবার।'

'গল্প?' রাগটা দমন করে বলল রানা, 'আপনি একেবারেই গর্দভ একথা আমাকে বিশ্বাস করতে বলেন, স্যার?' অত্যন্ত সহজভাবে বলল রানা, যেন প্রশংসা করছে উইং কমান্ডারের। 'আসলে আপনি বার্ধক্যে ভুগছেন, স্যার। আপনার অবসর গ্রহণ করা উচিত। আপনাকে যাতে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয় সে ব্যাপারে আমি ব্যবস্থা গ্রহণ করব, বিলিভ মি।'

'হোয়াট! তুমি…!'

'জ্বী, আমি। পারি। আপনার চাকরির কথা বলছি, স্যার। ইচ্ছা করলে ওটাও খেতে পারি। আমাকে গ্রেফতার করতে লোক পাঠিয়ে দিয়েছেন, তাই না? তার দরকার ছিল না। আমি নিজেই যাচ্ছি আপনার কাছে। কেন, জানতে চান? জবাবদিহি চাইবার জন্যে। জ্বী। সে অধিকারও আমার আছে। জ্বী।' কথা শেষ করে রিসিভারটা নামিয়ে রাখল রানা।

রানার দিকে এমনভাবে চেয়ে আছে গওহর জুমলাত যেন ভূত দেখছে সে।

ভীষণ বোকা দেখাচ্ছে তাকে। তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম লক্ষ করল রানা। হাসিটা দমন করল ও। পা বাড়াতে যাবে, তা দেখে পিছিয়ে গেল জুমলাত হঠাৎ। 'রানা!'

'একটা কথাও বাড়িয়ে বলিনি আমি, জুমলাত,' বলল রানা। 'আবার দেখা হবে গানপিটে, সার্জেন্ট। চললাম।' কেউ বাধা দিল না ওকে। দৃঢ়, দ্রুত পায়ে পাঁচ নম্বর পিট থেকে বেরিয়ে গেল রানা।

নয়

ঢং, ঢং। কাজ ফুরাল।

অস্পষ্ট, কিন্তু শুনতে পাচ্ছে রানা···বিদায় বেলার ঘণ্টা বাজছে। বড় ব্যস্ততার মধ্যে কেটে গেল ক'টা দিন। দম ফেলবার ফুরসত পায়নি এর মধ্যে। মাথার উপর বিরাট একটা দায়িত্বের বোঝা চেপে ছিল। সেটা নামতে যাচ্ছে আজ। যে কাজ নিয়ে এসেছিল ও, তা শেষ করে দিয়ে যাচ্ছে। আবার মার্শিয়ার মুখে সেই বিদ্যুতের মত হাসির ঝিলিক দেখতে পাবে ও। বুকে চেপে ধরে উষ্ণ আলিঙ্গনে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে আতাসী। আরও অনেক ঘটনা ঘটবে। এসবই ভাল লাগবে ওর। কিন্তু তবু কি একাকীত্ব ঘুচবে? তবু কি স্বস্তি পাবে? আসবে কি শান্তি?

মনে পড়ে যায়। আর সেই সাথে বুকে তীব্র একটা অসহনীয় ব্যথা জাগে। আহত পাখির মত বুকের ভিতর ছটফট করে ওঠে মনটা। মনে পড়ে যায়। রেবেকার মুখ। চোখ। হাত নাড়া। কণ্ঠস্বর। কথা। হাসি। প্রতিশ্রুতি। ইচ্ছে হয় প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে গোটা দুনিয়াটাকে···ইচ্ছে হয় নিজের বুকে আমূল এক ধারাল ছোরা···ইচ্ছে হয় সেই বুড়োর কাছে ফিরে গিয়ে চিৎকার করে উঠতে, কাজ দাও, আমাকে কাজ দাও, যাতে ভুলে যেতে পারি সব কথা। সব মুখ, সমস্ত স্মৃতি···ইচ্ছে হয়···

ধোঁয়ায় পথ দেখছে না রানা। অন্ধ পথিকের মত পথ হাতড়াচ্ছে। খক খক করে কেশে উঠল ও গলার ভিতর ঝাঁঝাল ধোঁয়া ঢুকে পড়ায়। কোন্‌দিকে যাচ্ছে দিশা পেল না কিছুক্ষণ। শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যাবার একটা ভয় জাগল, কিন্তু ভয়টাকে ধাওয়া করে তাড়িয়ে দিল কাজের তাগাদাগুলো। সময় নেই, সময় নেই। দু'চার মিনিটের মধ্যে ঘটনাটা ঘটতে শুরু করবে। কি হয়, এখনও বলা যায় না। অনেক দিক এখনও সামলানো বাকি। স্মোকস্ক্রিনের সাহায্য পাবে না শত্রুরা, কিন্তু তার মানে এই নয় যে তারা ল্যান্ড করবে না। যদি তারা ল্যান্ড করে···ভাবতে গিয়ে শিউরে উঠল রানা। যুদ্ধের ইতিহাসে যত রক্তপাত ঘটেছে সেগুলোকে ছাড়িয়ে যাবে আজ লেবানন।

উত্তর দিক থেকে ভয়ঙ্কর একটা অশুভ লক্ষণের মত ধোঁয়ার পাহাড় আকাশটাকে গ্রাস করতে করতে উঠে আসছে। ইতিমধ্যে প্রায় মাথার উপর পৌঁছে গেছে সেটা।

পিছনের অংশটার ঝোঁক উপরে ওঠার দিকে নয়, রানওয়ে ছুঁতে চাইছে যেন। ল্যান্ডিং ফিল্ডটাকে প্রায় ঢেকে ফেলেছে উত্তর-পুব দিকের ধোঁয়ার কালো হাত। পশ্চিমটা এখনও খালি। ভোরের সূর্য জ্বলজ্বল করছে। রানওয়ে ধরে দক্ষিণ দিকে ছুটতে শুরু করল রানা।

ধোঁয়ার পর্দা ফুঁড়ে বেরিয়ে এসে রানা দেখল স্টেশনের গেটের প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গেছে ও। যতটা পথ ছুটে এসেছে ও প্রায় ততটা পথ পেরিয়ে তবে পৌঁছুতে পারবে স্টেশন হেডকোয়ার্টারে। ঘামে ভিজে গেছে ব্যাটল ড্রেস। হাঁপাচ্ছে রানা। কিন্তু সময় নেই। আবার ছুটল ও। লাল ইঁটের একটা বাড়ি, তার সামনেই গেটে একটা দুই চাকা। সেটাই ওর লক্ষ্য।

কাছে গিয়ে দাঁড়াল রানা। সাইকেলটা ধরে চড়তে যাবে, সাঁ করে বেরিয়ে গেল গা ঘেঁষে একটা কালো গাড়ি। কি মনে করে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ও। ছ্যাঁৎ করে উঠল বুকটা। দেখে ফেলেনি তো ওকে জামাল আরসালান?

লাফ দিল রানা। সাইকেলে বসল। প্যাডেলে ভর দিয়ে পরমুহূর্তে সীট ত্যাগ করল ও। দাঁড়িয়ে চালাচ্ছে। বনবন করে ঘুরছে পা দুটো। ফাঁকা রাস্তা। কালো বুইকটা দ্রুত ছুটছে। পিছনে সাইকেল। সাইকেলে রানা। দ্রুত ছুটছে সাইকেলটাও। মাঝখানের ব্যবধান একশো গজ থেকে কমিয়ে পঞ্চাশ গজে আনতে পারল রানা। ঘ্যাঁচ্ করে ব্রেক কষে বুইকটা দাঁড়াল স্টেশন হেডকোয়ার্টারের গেটের সামনে। ঝাঁকুনিটা থামেনি তখনও, দরজাটা খুলে যেতে দেখল রানা। বাইরে বেরিয়ে এল একটা বাঁকা পাইপ। পরিষ্কার দেখল রানা, ধোঁয়া বেরুচ্ছে। তারপর বেরোল পাইপ ধরা হাতটা। গাড়ি থেকে নামছে জামাল আরসালান।

তারপর হাসিটা দেখতে পেল রানা। মুখের একটা পাশ দেখতে পাচ্ছে ও। চেয়ে আছে উত্তরের আকাশের দিকে। হঠাৎ কি মনে করে রিস্টওয়াচ দেখল। ভুরু কুঁচকে এদিক ওদিক মাথা নাড়ল আপন মনে। আবার তাকাল আকাশের দিকে। কাঁধ ঝাঁকাল জামাল আরসালান।

কাছে পৌঁছুল রানা। ব্রেক কষে সাইকেলটাকে দাঁড় করানোর চেষ্টাই করল না ও। পাঁচ গজ দূরে থাকতে সাইকেলের সীটের উপর দু'পা তুলে দিয়ে উবু হয়ে বসল। সেই অবস্থা থেকে লাফ দিয়ে পড়ল সামনে।

রানা তখনও শূন্যে। সাইকেলটা চালক ছাড়াই তীরের মত ছুটছে। শব্দ পেয়েই সম্ভবত ঘাড় ফেরাল জামাল আরসালান। উড়ন্ত সসারের মত কিছু একটা দেখল কি দেখল না সেই জানে, চোখের পলক পড়ার আগেই মুখের সামনে সে এক জোড়া পা দেখতে পেল। মুখটা সরিয়ে নেবার সময় পেল না।

পরমুহূর্তে নিজেকে কংক্রিটের উপর আবিষ্কার করল জামাল আরসালান। চোখের চশমা ছিটকে পড়েছে। মাথার হ্যাট চাপা পড়েছে শরীরের নিচে। মচকে গেছে ডান হাঁটুটা। বুকের উপর জলজ্যান্ত একটা মানুষ—ভারটা অসহ্য লাগছে তার। চোখ মেলতেই সে দেখল দু'পাটি মুক্তোর মত সাদা দাঁত। কার দাঁত তা

দেখার সুযোগ হল না। অসহ্য ব্যথায় ককিয়ে উঠল সে।

রানা বাঁকা করে মুচড়ে ধরেছে জামাল আরসালানের ডান হাত। একটু চাপ বাড়ালেই ব্যথায় শিরদাঁড়া বাঁকা করছে সে।

লোমশ বুক থেকে নামল রানা। হাতটা ছাড়ল না। চাপ একটু ঢিল করল শুধু। বলল, 'ঠিক আছে, দেখে নাও আমি কে। দেখো, ভয় পেয়ে আবার জ্ঞান-ট্যান হারিয়ে ফেলো না। আধবুড়ো লোকদের কোলে নিতে একটুও ভাল লাগে না আমার।'

রানাকে দেখার প্রয়োজন বোধ করল না জামাল আরসালান। কণ্ঠস্বরেই চিনল। হঠাৎ নিঃসাড় হয়ে গেল শরীরটা পেশীগুলো টান টান। পরমুহূর্তে তীব্র ব্যথায় শিরদাঁড়া বাঁকা হয়ে গেল তার। মুচড়ে ধরেছে রানা হাতটা।

'চোখ মেলো! দেখো। বলো আমি কে?' হাতটা আবার ঢিল করে দিল রানা।

'কিন্তু…আমাকে হয়ত মেরে ফেলবে তুমি, কিন্তু আমার বিজয় তুমি ঠেকাতে পারবে না, রানা।' জামাল আরসালান মন্তব্য করল। ফোঁটা ফোঁটা ঘাম জমে উঠেছে তার ভরাট মুখে। কোঁকড়ানো কাঁচাপাকা চুল ধুলোয় ধূসরিত। 'গোটা লেবাননের দিকে বিশাল বিমান বহর উড়ে আসছে। যদি তোমার হাতে মরি, আমার এই মৃত্যু নিতান্তই নগণ্য—কেননা বিনিময়ে আমার দেশের যে সুবিধে আমি করে দিয়ে যাচ্ছি…।'

'ঘোড়ার ডিম করে দিয়ে যাচ্ছো!' চাপ বাড়িয়ে হাতটা জামাল আরসালানের পিছন দিকে যতটা সম্ভব সরিয়ে নিয়ে গেল রানা। আর্তচিৎকার বেরিয়ে এল তার কণ্ঠ চিরে, 'বাপরে! মরে গেলাম! বাবারে…।'

সেন্ট্রি বক্স থেকে দু'জন সেন্ট্রি রাইফেল হাতে বেরিয়ে এল। কংক্রিটের উঠন পেরিয়ে যাচ্ছে রানা। জামাল আরসালানকেই শুধু চিনতে পারল সেন্ট্রি দু'জন। দ্রুত পা বাড়াল তারা।

'হল্ট!'

ঘাড় ফিরিয়ে হাসল রানা। 'সময় নেই। বেঈমানটাকে উইং কমান্ডারের জিম্মায় রেখে আসতে যাচ্ছি। শোনোনি, একে জীবিত বা মৃত ধরে দেবার জন্যে পাঁচ লাখ ডলার পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে?'

থমকে দাঁড়াল সেন্ট্রিরা। পরস্পরের দিকে তাকাল। কিছুই জানে না তারা। রানা ইতিমধ্যে করিডরে উঠছে জামাল আরসালানকে নিয়ে।

'ট্যা-ফোঁ করলেই দুমড়ে ভেঙে দেব হাতটা,' দ্রুত লিফটের সামনে গিয়ে দাঁড়াল ও।

অপারেশন কন্ট্রোলরুম। বিরাট একটা হলঘর। বত্রিশটা টেবিলে সত্তরজনের মত টেকনিশিয়ান, কেরানি, টাইপিস্ট ব্যস্তভাবে কাজ করে যাচ্ছে। রাডারের কয়েকটা পর্দা দেয়ালের গায়ে। বড় বড় ম্যাপ ঝুলছে গোটা এক দিকের দেয়াল জুড়ে।

কিম্ভূতকিমাকার যন্ত্র ইতস্তত দাঁড়িয়ে। কন্ট্রোল প্যানেলের পাশে কয়েকশো রঙিন আলোর রেখাবিশিষ্ট ইন্ডিকেটর বোর্ড দাঁড়িয়ে আছে। দৃশ্যটা জটিল বলে ভ্রম হয় প্রথম দর্শনে। স্টেনোগ্রাফারদের ছুটোছুটি দেখে বিশ্বাস করা কঠিন শৃংখলা নামে কোন ব্যাপার কেউ মানছে। উইং কমান্ডার তার ডেস্কের কাছে পায়চারি থামিয়ে থমকে দাঁড়ালেন। ছোঁ মেরে তুলে নিলেন ফোনের রিসিভার। ডায়াল করলেন দ্রুত। 'পাঁচ নম্বর পিট। সেন্ট্রিরা পৌঁছায়নি?'

পাঁচ নম্বর পিট থেকে সার্জেন্ট আল খাদিম কথা বলল। 'এইমাত্র পৌঁছেচে ওরা, স্যার। কিন্তু গানার রানা তো, স্যার, চলে গেছে। বলে গেল...।'

'ইউ গুড ফর নাথিং!' ফেটে পড়লেন রাগে উইং কমান্ডার। 'তাকে চলে যেতে দিয়েছ, এর জন্যে তোমাকে জবাবদিহি করতে হবে, সার্জেন্ট!'

'কিন্তু, স্যার, আপনি তো আমাকে... !'

কড়া ধমক খেয়ে চুপ করে গেল সার্জেন্ট। 'ইডিয়টের মত কথা বলছ তুমি, সার্জেন্ট। তোমার পিটে ফোন গেলে রিসিভার ধরে অন্যলোক। তোমার এই গাফলতির জন্যে লিখিত ব্যাখ্যা চাই আমি। সেন্ট্রিদের করপোরালকে রিসিভার দাও, কুইক!'

করপোরালের গলা শোনা গেল। 'ইয়েস, স্যার!'

'গানার রানাকে চাই আমি। হেডকোয়ার্টারে আসবে বললেও আমার বিশ্বাস গা ঢাকা দিয়েছে সে বা পালাবার চেষ্টা করছে। যে-কোন মূল্যে তাকে আটক করার ব্যবস্থা করো। ফোন করে সাবধান করে দাও গেটকে। তোমাদের ইনচার্জ মেজর হাসানকে খবরটা জানাও। দশ মিনিটের মধ্যে কি হল রিপোর্ট করে জানাও আমাকে।'

'ইয়েস, স্যার!'

রিসিভার নামিয়ে রাখতে যাবেন উইং কমান্ডার, দরজার দিকে দৃষ্টি পড়তে হাত থেকে সেটা পড়ে গেল ডেস্কের উপর ঠকাস করে।

'সেন্ট্রি!' হুঙ্কার ছাড়লেন তারেক হামেদী। 'অ্যারেস্ট হিম!'

হলঘরের আটটা দরজার পাশ থেকে ষোলোজন রাইফেলধারী গার্ড ছুটে এল।

জামান আরসালানের পিছন থেকে সাবধান করে দিল রানা। 'খবরদার!' দাঁড়িয়ে পড়ল সবাই একযোগে। ওর হাতে চকচক করছে একটা রিভলভার। জামাল আরসালানের পকেট থেকে বের করে নিয়েছে ও। 'আর এক পাও সামনে এগিয়ো না কেউ!' উইং কমান্ডারের দিকে ফিরল রানা। 'বিলিভ মি, আপনার নির্বুদ্ধিতার কথা আমি এয়ার কমোডোর নেহার কাদিনকে বিস্তারিত জানাব। কিন্তু, এ প্রসঙ্গ এখানেই থাক। আপনি এই মুহূর্তে আমার বন্দী, ব্যাপারটা যদি মেনে নেন তাহলে খুশি হব। অহেতুক রক্তপাত আমি পছন্দ করি না। এখন কাজের কথা। আমার কয়েকটা নির্দেশ আছে। পালন করলে কোন বিপদ ঘটবে না। কিন্তু কথা না শুনলে আমি লেবাননের স্বার্থে আপনাকে গুলি করব। উইং কমান্ডার তারেক হামেদী, আমি

ঠাট্টা করছি না। এবং আপনি আমার যে পরিচয় জানেন তা সত্যি নয়, একথাও জেনে রাখুন।'

টিক্-টিক্ টিক্-টিক্। দেয়ালঘড়ির শব্দ ছাড়া পনেরো সেকেন্ড কোন শব্দ শোনা গেল না। একচুল নড়ল না কেউ। তারেক হামেদী তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে আছেন। প্রকাণ্ড মুখটা টকটকে লাল দেখাচ্ছে তাঁর। সত্তর আশিজন লোক অনড়। সেন্ট্রিরা নির্দেশের অপেক্ষায় চেয়ে আছে উইং কমান্ডারের চোখের দিকে।

ব্যথায় মুখ বাঁকা করে আছে জামাল আরসালান। উইং কমান্ডারের দিকে চেয়ে মুখ ভেঙচাচ্ছে যেন সে।

'কে তুমি? কার হুকুমে···?' দ্বিতীয় প্রশ্নটা নিজেই সম্পূর্ণ করতে পারলেন না তারেক হামেদী। রানার কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝছেন না।

'আমার পরিচয় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের মুখ থেকেই শুনবেন।' রিস্টওয়াচ দেখল রানা। 'তাঁরা যথাসময়ে এসে পৌঁছুবেন এখানে, আমার কাছ থেকে খবর পেলেই। বেঈমানকে মুঠোর মধ্যে ভরতে পেরেছি, সুতরাং জরুরী কাজগুলো সেরেই তাদেরকে ফোনে খবরটা জানাতে যাচ্ছি আমি।' চারদিকে তাকাল রানা। লাউডস্পীকারের মাউথপীস, রেডিও ইত্যাদি যন্ত্র নিয়ে দু'জন লোক বসে আছে একটা ডেস্কের সামনে। একজন মেয়ে। অপরজন পুরুষ, তার মাথার মাঝখানে টাক। 'সময় দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে। আমার অনুমান যদি মিথ্যে না হয়, এখন থেকে পনেরো মিনিটের মধ্যে আকাশ পথে আক্রান্ত হতে যাচ্ছে লেবানন। প্রতিটি এয়ারফাইটার স্টেশনে প্যারাট্রুপ নামানো হবে। এই যে, টেকো ভদ্রলোক, শিরদাঁড়ায় গুলি খেতে না চাইলে যা বলছি অক্ষরে অক্ষরে পালন করো।'

টেকো ঘোষক চমকে উঠল। পিছন ফিরে তাকাতে গিয়েও হঠাৎ কি মনে করে শক্ত হয়ে গেল সে। 'প্লীজ। গুলি করবেন না। বলুন কি করতে হবে।'

'ঈগল স্কোয়াড্রনের দুটো মিগকে এই মুহূর্তে স্মোক সিলিন্ডার নিয়ে তৈরি হতে বলো।' নির্দেশ দিল রানা। 'তারপর মেটিয়োরোলজিক্যাল টাওয়ারে লোক পাঠিয়ে দুটো, একটা নীল আরেকটা লাল বেলুন সংগ্রহ করতে বলো গ্রাউন্ড ডিফেন্সকে। কুইক! পরবর্তী নির্দেশ একটু পর দিচ্ছি।'

ধীরে ধীরে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে, প্রথমে রানার রিভলভার ধরা হাত, তারপর উইং কমান্ডারের মুখের দিকে তাকাল টেকো।

'আমিই হুকুম দিয়েছি,' কঠোর শোনাল রানার কণ্ঠস্বর। 'কোন প্রশ্ন থাকলে আমাকে করো।'

'না না, প্রশ্ন কিসের!' দ্রুত ঘাড় ফিরিয়ে নিয়ে লাউডস্পীকারের সুইচ অন করল লোকটা। তার চাপা উত্তেজিত কণ্ঠস্বর পরিষ্কার শুনতে পেল সবাই।

রিপিট করা হল মেসেজ দুটো।

'এবার,' বলল রানা, 'গ্যাসে আক্রান্ত হবার আশঙ্কা নেই একথা ঘোষণা করো। গিভ দ্য অল ক্লিয়ার ফর গ্যাস।' যান্ত্রিক ঘোষণা ভেসে এল অস্পষ্টভাবে,

বহুদূর থেকে। 'অ্যাটেনশান, প্লীজ! গ্যাস অল ক্লিয়ার। সবাই এখন মুখ বের করতে পারে। মাস্কের আর কোন দরকার নেই। অফ!'

টেকো থামতেই কথা বলে উঠল জামাল আরসালান। 'হামেদী! তোমরা এতগুলো মানুষ একটা বদ্ধ উন্মাদকে এভাবে প্রশ্রয় দিচ্ছ! একজনেরও সাহসে কুলাচ্ছে না...।'

প্রচণ্ড একটা মোচড় দিল রানা জামাল আরসালানের হাতে। ব্যথায় নীল হয়ে গেল তার মুখ। আর্ত চিৎকার বেরিয়ে এল বুকের ভিতর থেকে। কিছু বলতে যাচ্ছিলেন উইং কমান্ডার, ঝনঝন শব্দে বেজে উঠল তার ডেস্কের একটা ফোন। তাকাল রানা। ছয়টা ফোন ডেস্কে। মনে হল লালটাই বাজছে। হাত বাড়ালেন উইং কমান্ডার রিসিভার ধরার জন্যে। লাল ফোনটাই, দেখল রানা। 'না,' বলল ও। তারেক হামেদীর হাতটা মাঝ পথে স্থির হয়ে গেল। 'আপনি ডেস্কের কাছ থেকে সরে যান, উইং কমান্ডার। ফোনে কথা বলব আমি।'

'অসম্ভব!' রাগে উত্তেজনায় মৃদু মৃদু কাঁপছেন তারেক হামেদী। 'ওটা এয়ার-ফোর্স হেডকোয়ার্টার আর আমার মাঝখানে হট-লাইন। আমি ছাড়া আর কারও অনুমতি নেই ওটা ধরার।'

উজ্জ্বল হয়ে উঠল রানার মুখ। 'তাই নাকি! ভেরি গুড। খবরটা পাঠাবার জন্যে এই হট-লাইনই দরকার আমার। কে ফোন করছেন? নিশ্চয়ই এয়ার কমোডোর নেহার কাদিন? খবরটা তাকে দিলেই পেয়ে যাবেন...।' রিভলভারের কান ফাটানো শব্দে বুকের রক্ত ছলকে উঠল সকলের। রানার ডানদিকে দাঁড়ানো সেন্ট্রিদের করপোরাল হতভম্ব হয়ে চেয়ে আছে নিজের হাতের দিকে। হাতের পিস্তলটা হাতে নেই তার, ছিটকে পড়ে গেছে সাত হাত দূরে। রানা দেখছে না ভেবে হোলস্টার থেকে সন্তর্পণে বের করে এনেছিল সে ওটা।

'আমার লক্ষ্য সম্পর্কে কারও মনে কোনরকম সন্দেহ যেন না থাকে,' বলল রানা, 'এরপর কাউকে চালাকি করতে দেখলে সরাসরি কপালে গুলি করব।' উইং কমান্ডারের দিকে ফিরল রানা। 'সরে যান ডেস্কের কাছ থেকে।'

রানার কণ্ঠে কঠোর নির্দেশ। দ্বিতীয়বার হয়ত উচ্চারণ করবে না ও কথাটা, মনে হল তারেক হামেদীর। ধীর ভঙ্গিতে গুনে গুনে তিন পা পিছিয়ে গেলেন তিনি।

'এগোও,' আরসালানের নিতম্বে হাঁটু দিয়ে গুঁতো মারল রানা। তাকে সামনে নিয়ে ডেস্কের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। কিন্তু ফোনটা এখন স্তব্ধ। মোট চারবার বেজে বন্ধ হয়ে গেছে সেটা।

পুরো ত্রিশ সেকেন্ড অপেক্ষা করল রানা। কোন সাড়া নেই ফোনটার। হাত বাড়িয়ে রিসিভারটা ধরতে যাবে, এমন সময় একযোগে ঝনঝন শব্দে বেজে উঠল পাশের ডেস্কের দুটো ফোন। ঝট্ করে সেদিকে তাকাল রানা। 'কেউ ধরবে না। আমি যাচ্ছি।' জামাল আরসালানকে ধাক্কা দিয়ে পা বাড়াতে যাবে ও, হঠাৎ ওর বাঁ দিকের একটা ডেস্ক থেকে বেজে উঠল আরও একটা ফোন। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতে

যাবে, এই সময় সামনের দুটো ডেস্ক থেকে বেজে উঠল এক সাথে দুটো ফোন।

দ্রুত এদিক ওদিক তাকাচ্ছে রানা। হঠাৎ ভৌতিক একটা কাণ্ড বলে মনে হল ব্যাপারটা। ঝনঝন শব্দে চারদিক থেকে গোটা পনেরো ফোন বাজতে শুরু করেছে।

'হোয়াট ইজ দিস!' উইং কমান্ডারের কণ্ঠে অকৃত্রিম বিস্ময়।

ব্যথার কথা ভুলে খক খক করে কেশে উঠল জামাল আরসালান, 'তোমরা তো পারলে না আমাকে পাগলটার হাত থেকে উদ্ধার করতে, হামেদী। কিন্তু আমার ভক্তের সংখ্যা নাবাতিয়া ছাড়া অন্যত্রও কম নেই। হোয়াট ইজ দিস মানে তারা আসছে, বুঝেছ!' কথা শেষ করে ব্যথা সামলাবার জন্যে আগাম চোখমুখ কুঁচকে ফেলল সে।

কিন্তু রানা নড়ল না একচুল। এক সাথে এতগুলো ফোন বাজার কারণ কি? দ্রুত ভাবছে ও। তবে কি আরসালানের রিজার্ভ বাহিনী বিপদ আঁচ করতে পেরে হামলা চালাতে আসছে স্টেশনে?

'আপনার ভক্তরা আপনাকে উদ্ধার করতে আসছে অন্য কোথাও থেকে? মানে?' উইং কমান্ডার প্রশ্ন করলেন। 'কি বলতে চাইছেন আপনি? নাবাতিয়া শহরে আপনার আবার ভক্ত কারা? তারা ঢুকবেই বা কিভাবে স্টেশনে?'

'তুমি সত্যি এক নম্বরের বোকা। এ ব্যাপারে রানার সাথে আমি একমত,' বলল জামাল আরসালান।

'আর একটাও কথা নয়!' কঠিন কণ্ঠে বলল রানা। জামাল আরসালানের নিতম্বে হাঁটু দিয়ে গুঁতো মারল ও। 'শান্তভাবে এগোও।'

'আগেই বলেছি তোমাকে, রানা,' পা বাড়িয়ে বলল আরসালান। 'আমাকে হয়ত তুমি মারতে পারবে, কিন্তু আমার বিজয়কে ঠেকাতে পারবে না। স্টেশনে পৌঁছেই ফোন করার কথা ছিল আমার। তা করিনি; কথা ছিল, ফোন যদি না করি তাহলে ওরা ধরে নেবে আমি বিপদে পড়েছি। এবং আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্যে কি ব্যবস্থা নেয়া হবে তাও স্থির করা আছে।' হোঃ হোঃ করে হাসতে শুরু করে হঠাৎ থেমে গেল সে। 'থাক, বেশি কথা বলতে চাই না। নিজের চোখেই সব দেখতে পাবে।'

এখনও বাজছে ফোনগুলো।

'এসব কি শুনছি! আপনার কথার মাথামুণ্ডু কিছুই আমি বুঝতে পারছি না, মি. আরসালান।'

'ইচ্ছা হয়, আপনার মাথাটা দু'ফাঁক করে দেখি কতটা গোবর আছে ওটার ভিতরে,' কথাটা উইং কমান্ডারের উদ্দেশ্যে বলে একটা ডেস্কের সামনে দাঁড়াল রানা। রিভলভার ধরা হাতটা দিয়েই কোনরকমে ধরল রিসিভার। সেটা তুলল কানে। 'অপারেশান কন্ট্রোলরুম।'

বিশ সেকেন্ড নিঃশব্দে শুনল রানা অপর প্রান্তের বক্তব্য। তারপর বলল, 'মেসেজটা এক্ষুণি দিচ্ছি আমি উইং কমান্ডারকে। সাথে কে আছেন? জেনারেল...?

ভেরি গুড! না, এখানে কোন গোলমাল নেই। আট নম্বর চেকপোস্ট ক্রস করেছেন, তার মানে খুব বেশি দেরি নেই, তাই না?…ঠিক আছে।' রিসিভার নামিয়ে রাখল ও। মুখ তুলতে গিয়ে কি যেন মনে পড়ে গেল ওর। রিসিভারটা ক্রেডল থেকে তুলে ডেস্কের উপর নামিয়ে রাখল। তারপর তর্জনী দিয়ে ডায়াল করতে শুরু করল। রিভলভারটা সেই হাতেই ধরে রেখেছে ও।

ডায়াল করার পর রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল। 'মেইন গেট এটা? গুড। অপারেশন কন্ট্রোলরূম থেকে দুটো জরুরী নির্দেশ। এক, এয়ার কমোডোর নেহার কাদিন এবং জেনারেল আরাবী আসছেন। পথ দেখিয়ে হেডকোয়ার্টারে পৌঁছে দিতে হবে ওদের। দুই, আর্মি এবং এয়ারফোর্স প্যার্সোন্যাল ছাড়া আর কাউকে যেন স্টেশনে ঢুকতে দেয়া না হয়। বিশেষ করে কোন ট্রাক, ভ্যান, মাইক্রোবাস যেন কোনভাবেই ভিতরে ঢুকতে না পারে। বৈধ প্রবেশপত্র থাকলেও এই জরুরী নির্দেশ যেন লঙ্ঘন করা না হয়। এ সংক্রান্ত ঘোষণা এক্ষুণি বিস্তারিত জানানো হচ্ছে লাউডস্পীকারের মাধ্যমে।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে রানা উইং কমান্ডারের দিকে তাকাল। 'স্যালুট করার জন্যে তৈরি থাকুন,' কথাটার কোন রকম ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করল না ও। তাকাল ঘোষকের ঘাড়ের দিকে। শিরদাঁড়া খাড়া করে বসে আছে সে. মাউথপীসটা হাতে নিয়ে। 'টেকো ভাই, জরুরী আরও একটা ঘোষণা। গার্ডদের কমান্ডার ইনচার্জ এবং প্রতিটি গেটের করপোরালকে জানিয়ে দাও স্টেশনে শত্রুপক্ষের অনুপ্রবেশ আশঙ্কা করা হচ্ছে। পরিচিত সামরিক লোক ছাড়া কাউকে যেন ভিতরে ঢুকতে দেয়া না হয়। বৈধ অনুমতি পত্র থাকলেও। বুঝেছ?'

'বুঝেছি।'

ঘোষণা শুরু হলো। তা শেষও হলো একটু পর।

'কেউ জানে এখানকার টাইপিস্ট মিস ইফফাত কোথায় গেছে?'

কেউ উত্তর দেবার আগে উইং কমান্ডারের বেসুরো গলা শোনা গেল, 'কে আসছেন? এয়ার কমোডোর নেহার কাদিন? ইমপসিবল! কোনরকম আগাম মেসেজ না দিয়ে তিনি আসতেই পারেন না।'

'তাহলে সত্যি হয়ত আসছেন না। চেকপোস্টগুলো মিথ্যে খবর দিতে চেষ্টা করছে ফোন করে।' বলল রানা। 'আপনি ঘুমের মধ্যে আছেন এখনও, উইং কমান্ডার। এখন থেকে আধ ঘণ্টা আগে রওনা হয়ে গেছেন এয়ার কমোডোর প্যালেস্টাইনি গেরিলা বাহিনীর চীফ অপারেশন্যাল ডিরেক্টর জেনারেল আরাবীকে সাথে নিয়ে। যদিও,' অনেকটা স্বগতোক্তির মত শোনাল রানার কণ্ঠস্বর, 'আমি জানি না তাঁরা কোত্থেকে, কার কাছ থেকে খবর পেয়েছেন।' চিন্তিত হয়ে উঠল ও মুহূর্তের জন্যে। কে খবর দিল? খবর না পেয়ে তো জেনারেল আরাবীর আসার কথা নয়। 'সে যাক, খবর পান বা না পান, তাঁরা আসছেন।'

'কিন্তু কেন? কি এমন ঘটেছে…আমি বলতে চাইছি, তাহলে কি সত্যি তুমি যা

দাবি করছ তা ঘটেছে, মানে, সত্যি মি. জামাল আরসালান···?'

কঠোর দৃষ্টিতে উইং কমান্ডারের দিকে তাকাল রানা। ধীরে ধীরে অবজ্ঞা ফুটে উঠল ওর দৃষ্টিতে। চোখ সরিয়ে নিয়ে জানতে চাইল সকলের উদ্দেশ্যে, 'মিস ইফফাতের কথা কেউ জানো?'

একটি মেয়ে কথা বলল। যেমন পিছন ফিরে বসে ছিল, তেমনি বসে রইল সে। তাকে নড়তেও দেখল না রানা। কথাগুলো ভেসে এল শুধু। 'হ্যাঁ, জানি। রাত দেড়টার দিকে স্কোয়াড্রন লিডার ইউনুস মেহের এখানে এসে তাকে সাথে করে নিয়ে গেছেন। কোথায় তা জানি না।'

জেনারেল আরাবীকে খবর কি তাহলে ইউনুস দিয়েছে? সম্ভবনাটা সাথে সাথে বাতিল করে দিল রানা। ইউনুস জানেই না এখানে ওর আসার সাথে জেনারেল আরাবী জড়িত। তাহলে?

রিস্টওয়াচ দেখে আঁতকে উঠল রানা। কন্ট্রোলরুমে ঢোকার পর ছয় মিনিট পেরিয়ে গেছে ইতিমধ্যে। অথচ আসল কাজটাই করা হয়নি এখনও।

'উইং কমান্ডার, তারেক হামেদী,' বলল রানা, 'একটা শেষ সুযোগ দিতে চাই আপনাকে আমি, যাতে পদে পদে যত অসংখ্য ভুল করেছেন তার কিছুটা প্রায়শ্চিত্ত করতে পারেন।'

প্রকাণ্ড লাল মুখটা থমথম করছে তারেক হামেদীর। জীবনে এরকম অপমানিত হননি তিনি কখনও। জবাব দিলেন না।

'একটা ফোনের রিসিভার তুলে একের পর এক লেবাননের প্রতিটি এয়ার ফাইটার স্টেশনে মেসেজ পাঠান···।'

'অর্ডার করো না আমাকে!' বললেন বটে, কিন্তু গলার সেই তেজ আর নেই। আপোষ করতে চাইছেন তিনি রানার সাথে, কিন্তু তা স্বীকার করতে পারছেন না। 'যাকে ইচ্ছা সাবধান করে দাও, মেসেজ পাঠাও, কোন কাজেই তোমাকে আমি বাধা দিতে যাচ্ছি না।'

'পারলে দিতেন, তাই না?' প্রশ্নটা করে উত্তরের অপেক্ষায় থাকল না রানা, জামাল আরসালানকে ছেড়ে দিয়ে বলল, 'সোজা এগিয়ে যাও, আরসালান। দেয়ালে নাক ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকো। মনে রেখো আমার হাতে রিভলভার আছে, আর চোখ দুটো তোমার দিকেই সারাক্ষণ স্থির থাকবে। যাও।'

দ্বিতীয়বার বলতে হলো না, হাতটা ম্যাসেজ করতে করতে পা বাড়াল জামাল আরসালান। দেয়ালের সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে।

ফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করল রানা। অপারেটরকে বলল, 'অপারেশন কন্ট্রোলরুম থেকে বলছি। এক এক করে প্রতিটি এয়ার ফাইটার স্টেশনের সাথে কথা বলতে চাই। একটার সাথে কথা শেষ করার পরপরই কি আরেকটার লাইন পাওয়া যাবে?···গুড। সবচেয়ে আগে বৈরুত এয়ার ফাইটার স্টেশনের সাথে লাইন দিন।' দ্রুত চারদিকে চোখ বুলিয়ে দেখে নিচ্ছে রানা। তারপর অনর্গল কথা বলতে শুরু

করল ও। একের পর এক এয়ার ফাইটার স্টেশনের সাথে যোগাযোগ করে দিচ্ছে অপারেটর।

দশ

জামাল আরসালানের পিঠটাই শুধু দেখতে পাচ্ছে রানা। আর কোনদিকে কোন খেয়াল নেই। হলঘরে কি হচ্ছে না হচ্ছে জানবার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। পদশব্দ শুনে বুঝতে পেরেছিল ও, ওকে আক্রমণ করার আর কোন সুযোগ নেই কারও। পুরো দুই মিনিট পেরিয়ে গেছে তারপর। নিচু গলায় আলাপ করতে শুনেছে ও। পরিচিত কণ্ঠস্বর। কথা বলছে ফোনে ও। গভীর মনোযোগের সাথে।

ঝাড়া পনেরো মিনিট পর রিসিভারটা নামিয়ে রাখল রানা। প্রতিটি ফাইটার স্টেশনকে সতর্ক করে দিয়েছে ও। জানিয়ে দিয়েছে, স্মোক কনটেইনারসহ ট্রাক ঢুকেছে তাদের স্টেশনে, সেগুলোকে খুঁজে বের করে ধ্বংস করতে হবে। ব্যাপক আক্রমণ আসছে আকাশ পথে, এ কথাও জানাতে ভুল করেনি।

হঠাৎ যেন অন্য জগত থেকে ফিরল রানা। ফিরতেই দেখল ঠিক ওর পিছনে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে সবাই।

'মি. রানা! স্যার!'

'আর ইউ অল রাইট, মেজর রানা?'

চারদিক থেকে অসংখ্য প্রশ্ন। সকলের কণ্ঠকে ম্লান করে দিল জেনারেল আরাবীর কণ্ঠস্বর। 'রানা, সব ঠিক আছে তো? কোনরকম ক্ষতি হয়নি তো তোমার?'

'মেজর রানা, কংগ্রাচুলেশনস!' জেনারেল আরাবীকে ঠেলে একপাশে সরিয়েই দিলেন একরকম এয়ার কমোডোর নেহার কাদিন। করমর্দনের জন্যে বাড়িয়ে দিলেন হাতটা।

'ধন্যবাদ,' নিরাসক্ত ভঙ্গিতে বলল রানা। এয়ার কমোডোরের হাতটা ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়েই ছেড়ে দিল ও। 'কিন্তু বিপদ কাটেনি এখনও। এইমাত্র সব ক'টা এয়ারফাইটার স্টেশনকে সতর্ক করে দিলাম। কত তাড়াতাড়ি কি কি করতে পারবে ওরা তার ওপরই নির্ভর করছে লেবাননের ভবিষ্যৎ।'

'কি আশঙ্কা করছ তুমি, রানা?' এগিয়ে এলেন জেনারেল আরাবী স্কোয়াড্রন লিডারদের ভিড় ঠেলে।

'ফোনে আমাকে যা বলতে শুনলেন ঠিক তাই আশঙ্কা করছি আমি।' ব্যস্ততার সাথে বলল রানা। হাত বাড়িয়ে একটা ফোনের রিসিভার তুলে নিল ও। দেখল জামাল আরসালানের হাঁটু দুটো আপনাআপনি ভাঁজ হয়ে যাচ্ছে।

'ওকে ধরো কেউ!' কে যেন চিৎকার করে উঠল।

'দরকার নেই,' বলল রানা। ডায়াল করতে শুরু করল ও। 'জেনারেল আরাবী?'

'বলো, রানা!'

'জ্ঞান হারাচ্ছে, ওই লোকই জামাল আরসালান,' দ্রুত বলল রানা, 'ইসরায়েলি গুপ্তচর। লেফটেন্যান্ট আতাসী ওরই ষড়যন্ত্রের শিকার। ওকে গ্রেফতার করে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যান। এবং লেফটেন্যান্ট আতাসীকে এখানে নিয়ে আসার নির্দেশ দিন উইং কমান্ডারকে।' ফোনে কথা বলায় মন দিল রানা। 'হ্যালো?...অপারেটর, গার্ডদের ডিটাচমেন্ট কমান্ডার মেজর হাসানকে চাই।...ঠিক আছে।' রিসিভার নামিয়ে রাখল ও। ফিরল জেনারেল আরাবীর দিকে। চাপা কণ্ঠে এয়ার কমোডোরের সাথে কথা বলছেন তিনি। ওদিকে তারেক হামেদী হাত নেড়ে নির্দেশ দিচ্ছেন একজন করপোরালকে।

করপোরাল সেন্ট্রিদের কি যেন বলল। জামাল আরসালানের দিকে এগোল তারা।

'রানা,' জেনারেল আরাবী এগিয়ে এসে হাত রাখলেন রানার কাঁধে। 'এয়ার কমোডোরের অনুরোধ স্টেশন নাবাতিয়াকে রক্ষা করার দায়িত্ব এই মুহূর্তে গ্রহণ করতে হবে তোমার।'

'মেজর রানা, আপনি আমার অনুরোধ রক্ষা করলে খুব খুশি হব।' বললেন এয়ার কমোডোর। 'আপনার কৃতিত্বের কথা আগেও শুনেছি আমি। চিনতে পারিনি। আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ছোট করতে চাই না। লেবানন এয়ারফোর্সের তরফ থেকে...।'

'মাফ করবেন, এয়ার কমোডোর,' বলল রানা। 'বেঁচে থাকলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আরও অনেক সময় পাবেন আপনারা। এখন কাজের সময়, কাজ করতে দিন।'

ঝনঝন শব্দে টেলিফোন বাজল। রিসিভার তোলার সময় রানা দেখল উইং কমান্ডার তারেক হামেদী ওর দিকে চেয়ে আছেন বোকার মত। ঢোক গিলছেন।

'হ্যালো? মেজর হাসান? এক মিনিট ধরুন,' রানা রিসিভারটা এয়ার কমোডোরের দিকে বাড়িয়ে দিল, 'গার্ডদের ডিটাচমেন্ট কমান্ডার মেজর হাসান, ওকে আপনি জানিয়ে দিন আমি মাসুদ রানা এখন থেকে কমান্ডিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করছি।'

'ব্যাপারটা লাউডস্পীকারে ঘোষণা করতে বলে দিয়েছি আমি,' বললেন এয়ার কমোডোর। রানার হাত থেকে রিসিভারটা নিলেন তিনি। 'মেজর হাসান? এয়ার কমোডোর...।'

লাউডস্পীকার এই সময় ঘড়ঘড় করে উঠল, অস্পষ্ট শব্দ ভেসে এল দূর থেকে। এয়ার কমোডোরের হাত থেকে রিসিভার নিল রানা। 'মেজর হাসান!'

'ইয়েস, মেজর রানা।'

'অ্যারোড্রামের উত্তরে একটা ট্রাক আছে। আপনি আমার ডিটাচমেন্ট কমান্ডার গওহর জুমলাতের সাথে যোগাযোগ করে খবর নিন armoured car ট্রাকটার ব্যাপারে কি করতে পেরেছে।'

'ইয়েস, মেজর।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে মুখ তুলতেই ইফফাত আর ইউনুস মেহেরকে দেখল রানা। 'আরে! কোথায় ছিলে তোমরা?'

মিটিমিটি হাসছে দু'জন। প্রশ্নের জবাবই দিল না কেউ। ওদের পিছন থেকে সামনে এগিয়ে এল কালো আর বেঁটে এক লোক, মাথায় চকচক করছে বিরাট টাক। 'হ্যালো, রানা? পুরো মাত্ করে দিয়েছ দেখতে পাচ্ছি!'

'মাই গড!' কপালে চোখ তুলল রানা। 'দায়রা দাউদ, দোস্ত, তুমি এখানে কিভাবে পৌঁছুলে!'

এগিয়ে এসে রানাকে জড়িয়ে ধরল ডেইলি সানের নির্বাহী সম্পাদক।

ইউনুস বলল, 'বেড়হিলে ফোর্সড ল্যান্ডিঙের পর স্টেশনে ফিরে দেখি তোমার বন্ধু আমার জন্যে গেটে অপেক্ষা করছেন। উইং কমান্ডারের সাথে দেখা করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয় ও...।'

কথার মাঝখানে কথা বলল ইফফাত, 'রানা, মি. দাউদ প্রমাণ পেয়েছেন নিঃসন্দেহে জামাল আরসালান একজন ইসরায়েলি গুপ্তচর।'

'তুমি কিভাবে জানলে, দাউদ?'

জেনারেল আরাবী, এয়ার কমোডোর নেহার কাদির, উইং কমান্ডার তারেক হামেদী এবং অন্যান্য সবাই ওদেরকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। কারও মুখে কথা নেই। ওদের কথা শোনার দিকেই গভীর আগ্রহ সকলের।

'জামাল আরসালান আসলে জামাল আরসালানই নয়, একথা জানার পর আর জানতে বাকি থাকে নাকি কিছু?' রানাকে ছেড়ে দিয়ে বলল দায়রা দাউদ। 'আসল জামাল আরসালানকে শেষবার দেখা গেছে তেলআবিবের একটা জেলখানার হাসপাতালে উনিশশো ছিয়াত্তর সালের ডিসেম্বর মাসে অর্থাৎ মাত্র দু'বছর আগে। অথচ তোমাদের এই জামাল আরসালান আজ সাড়ে চার বছর ধরে এখানে রয়েছে। কি প্রমাণ হয় এ থেকে?'

'তেলআবিবে দু'বছর আগে জামাল আরসালানকে শেষবার দেখা গেছে? কে বলল তোমাকে?'

'তোমার মেসেজ পাবার পর জামাল আরসালানের ব্যাকগ্রাউন্ড সংগ্রহ করার জন্যে সম্ভব্য সব চেষ্টা চালাই আমি,' পকেট হাতড়ে চুরুটের বাক্স বের করল দায়রা দাউদ। দুটো চুরুট বের করে রানাকে দিল একটা। দু'জনের চুরুটে আগুন ধরাল সে। 'কিন্তু তার কোন আত্মীয় বেঁচে নেই। শেষ পর্যন্ত অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের সদর দফতর জেনেভায় টেলিগ্রাম পাঠাই। ওখান থেকেই উত্তরে একথা জানানো হয় আমাকে। দু'বছর আগে একটা প্রতিনিধি দল তেলআবিবের হাসপাতাল পরিদর্শনে যায়, সেখানে তারা জামাল আরসালানকে মুমূর্ষু অবস্থায় দেখে।'

পিঠ চাপড়ে দিল রানা দাউদের। 'ধন্যবাদ, দোস্ত,' বলল ও, 'বাইরে অপেক্ষা করো আমার জন্য, পরে আলাপ করব, কেমন?'

ইফফাত এগিয়ে এসে দাঁড়াল রানার সামনে, 'তোমার খবর না পেয়ে মি. মেহের দুশ্চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলেন। আমাকে সাথে নিয়ে তিনি···।'

'আল মাকারদানায় গিয়ে দেখি এক অশীতিপর বৃদ্ধ ছাড়া আর কেউ নেই সেখানে। খুব খাতির যত্ন করল সে আমাদের। বলল, দু'জন গানার এসেছিল বটে, কিন্তু রাত না কাটিয়েই চলে গেছে।'

'বুড়োটা জামাল আরসালানের লোক,' বলল রানা, 'মেহের, ডিসপারসাল পয়েন্টে চলে যাও, তুমি এখুনি।'

'ইয়েস, মেজর!' করমর্দন সেরে অপারেশন কন্ট্রোলরূম থেকে দ্রুত বেরিয়ে গেল স্কোয়াড্রন লিডার।

একটা ভরাট, গম্ভীর কণ্ঠস্বর গমগম করে উঠল, 'মেজর রানা, C. O. নাবাতিয়া, আপনার ফোন।'

ফিরতেই মুখোমুখি হল রানা এয়ার কমোডোরের। হাসছেন তিনি। হাতের রিসিভারটা বাড়িয়ে দিলেন রানার দিকে।

দুর্লভ একটা সম্মান, সন্দেহ নেই। মুখটা একটু যেন লাল হয়ে উঠল রানার। রিসিভারটা নিয়ে মৃদু হাসল ও। 'হ্যালো?'

'মেজর হাসান বলছি, মেজর রানা। ট্রাকটাকে অক্ষত অবস্থায় দখল করা গেছে। সাতজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।'

'গুড! ট্রাক এবং বন্দীদেরকে স্টেশন হেডকোয়ার্টারে সাথে করে নিয়ে আসুন, কুইক!' রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা। রিস্টওয়াচ দেখল। কন্ট্রোলরূমে ঢোকার পর মাত্র আধঘণ্টা সময় পেরিয়েছে। অথচ মনে হচ্ছে···হঠাৎ চিন্তার মোড় ঘুরে গেল ওর। আক্রমণ আসছে না এখনও—কেন? নির্দিষ্ট সময় কখন? চারদিকে তাকাল রানা।

তাকিয়ে আছে সবাই ওর দিকে। নির্দেশের অপেক্ষায় আছে। এয়ার কমোডোরকে নিয়ে একধারে সরে গেছেন জেনারেল আরাবী। ঘনঘন পাইপে টান দিচ্ছেন তিনি। উইং কমান্ডার নিচু গলায় কি যেন বলছেন এয়ার কমোডোরকে। তিনি শুনছেন বলে মনে হল না রানার। চেয়ে আছেন রানার দিকে।

'প্রত্যেকে যার যার কাজে হাত লাগান,' বলল রানা, 'যে-কোন ব্যাপারে পরামর্শ দরকার হলে আলাপ করবেন আমার সাথে।'

এক মিনিটের মধ্যে বদলে গেল কন্ট্রোলরূমের চেহারা। ভীষণ ব্যস্ততার সাথে মেয়েরা লিখতে শুরু করল টেলিফোন মেসেজগুলো। আরেকদল মেয়ে এক ডেস্ক থেকে আরেক ডেস্কে নিয়ে যাচ্ছে কাগজের চিরকুট, গোটা হলঘর হঠাৎ যেন লাফ দিয়ে জীবন্ত হয়ে উঠল।

লেবাননের উপকূল ভাগ আঁকা রয়েছে একটা টেবিলের উপর কাঁচের গায়ে, সেখানে ছোট ছোট আলোকিত তীরচিহ্ন ফুটে উঠতে শুরু করল। প্রতিটি তীরচিহ্নের মুখ লেবাননের দিকে। তীরচিহ্নগুলোর গায়ে তিনটে অক্ষর লেখা A.F.I. অর্থাৎ

এয়ারফোর্স অফ ইসরায়েল। প্রতিটি তীরচিহ্নের গায়ে নম্বরও লেখা রয়েছে। মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ লেখা অনেকগুলোএবং ষাট আর সত্তর লেখা একটা করে রঙিন তীরচিহ্ন ফুটে উঠল কাঁচের গায়ে। প্রতিটি তীরচিহ্নের অর্থ একটা করে শত্রুবিমানের ঝাঁক। এক নিঃশ্বাসে একশো সত্তরটা শত্রুবিমান গুণল রানা। আরও অসংখ্য তীরচিহ্ন ফুটে উঠতে গোনার কাজটায় ইস্তফা দিল নিজে থেকেই।

'দুটো স্কোয়াড্রনকেই টেক অফ করতে বলুন,' নির্দেশ দিল রানা।

পরমুহূর্তে লাউডস্পীকারের অস্পষ্ট ধ্বনি ভেসে এল। 'বোথ স্কোয়াড্রন স্ক্র্যাম্বল! টাইগার স্কোয়াড্রন স্ক্র্যাম্বল! ঈগল স্কোয়াড্রন স্ক্র্যাম্বল। স্ক্র্যাম্বল। অফ!'

রিসিভার হাতে নিয়েই ছুটে এল একটি মেয়ে। রানার সামনে দাঁড়াল সে। 'অনেকগুলো বিশাল ঝাঁকের শত্রুবিমান দক্ষিণ-পুব দিক থেকে ছুটে আসছে। ফ্রন্ট সেকশন রাডার রিডিং রিপোর্ট হচ্ছে, ওগুলো সম্ভবত ফাইটার এসকর্ট সহ ট্রুপ ক্যারিয়ার।'

'উচ্চতা?'

'পনেরো থেকে পঁচিশ হাজার ফুট, স্যার।'

ব্যস্ততার ঝড় বইতে শুরু করল অপারেশন কন্ট্রোলরুমে। আট দশজন অফিসারকে সাথে নিয়ে উইং কমাণ্ডার এগিয়ে এলেন এয়ার কমোডোরের নির্দেশে। উদ্দেশ্যঃ রানাকে সাহায্য করা।

নতুন পর্যবেক্ষণ রিপোর্ট অনবরত আসছে, সেইসাথে কাঁচের টেবিলে আলোকিত তীরচিহ্নগুলো সামনে বাড়ছে, নতুন তীরচিহ্নও যোগ হচ্ছে আগেরগুলোর সাথে। লেবানন এয়ারফোর্সের বিমানগুলোর প্রতীক লাল তীরচিহ্ন, সেগুলোর সংখ্যা একেবারেই নগণ্য। উপকূলের দিকে দ্রুত ছুটে যাচ্ছে দুটো স্কোয়াড্রন। ক্রমশ সুগঠিত আকার নিচ্ছে শত্রুবিমানের প্রতিটি ঝাঁক।

যুবক আর্টিলারি অফিসার মুসা কায়ানীকে কাছে ডাকল রানা। স্মোকস্ক্রিনের ত্রিশ ফুট ওপরে ওড়াতে হবে বেলুনগুলো। ওগুলোর সাথে আলো থাকবে। লাল বেলুন স্টেশন হেডকোয়ার্টারের ঠিক পুবে, হ্যাঙ্গারগুলোর ওপর। নীলগুলো মেইন গেটের ওপর। মনে থাকবে? আশি ফুট, তার চেয়ে বেশি ওপরে যেন উঠে না যায়। পাঁচ মিনিটের মধ্যে পারবে শেষ করতে কাজটা?'

'ইয়েস, স্যার।'

কপালে নেমে পড়া চুল সরিয়ে রানা বলল, 'ভেরি গুড! এক্ষুণি আমি স্মোকস্ক্রিন তৈরি করার নির্দেশ দিচ্ছি তাহলে। ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ ফুটের মধ্যে থাকবে পর্দাটা। পর্দা তৈরি করা শেষ হবার আগেই যাতে বেলুনগুলো ওঠে, সেদিকে খেয়াল রেখো।'

'ইয়েস, স্যার,' মুসা বায়ানী ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল কন্ট্রোলরুম ছেড়ে।

সুইচবোর্ডের সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা। টেলিফোনিস্ট মেয়েটির কাঁধের উপর ঝুঁকে পড়ে বলল, 'দু'নম্বর ডিসপারসালের কানেকশন দাও আমাকে।' লাইন পেয়ে

রিসিভার তুলে দিল মেয়েটি রানার হাতে। রানা বলল, 'হ্যালো, মামুন? ধোঁয়া নিয়ে মিগ দুটো রেডি তো?'

'ইয়েস, স্যার!'

'গুড! এক্ষুণি টেক অফ করতে হবে ও-দুটোকে। অ্যারোড্রোমের পুব প্রান্ত বরাবর একটা স্মোকস্ক্রিন চাই আমি। নাবাতিয়া হাইওয়ে থেকে শুরু হবে, ল্যাণ্ডিং ফিল্ডের উত্তর প্রান্তের দিকে গিয়ে শেষ হবে। ধোঁয়া যেন ত্রিশ ফুটের নিচে না নামে, আর পঞ্চাশ ফুটের ওপর না ওঠে। দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থেও ছোট বা বড় যেন না হয় পর্দাটা। পাইলটদের জানিয়ে দাও সিলিণ্ডার নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত অথবা নতুন কোন নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত থামা চলবে না।...রাইট। টেল দেম টু স্ক্র্যাম্বল!'

রিসিভার নামিয়ে দ্রুত একটা ডেস্কের কাছে এসে দাঁড়াল রানা। একটা প্যাড টেনে নিয়ে খসখস করে লিখল কিছু, তারপর সেটা টেনে ছিঁড়ে বাড়িয়ে দিল নির্দেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েদের দিকে। 'অ্যানাউন্সারকে দাও।'

কাগজটা নিয়ে অ্যানাউন্সারের ডেস্কের দিকে ছুটল ইফফাত। কাজের সময় রানার দ্রুততা ও তীব্রতার নমুনা দেখে বিস্ময়ের সীমা নেই তার। ইতিমধ্যে কমপক্ষে ছয়বার এটা-ওটা করার নির্দেশ দিয়েছে রানা তাকে, কিন্তু একবারও মুখ তুলে তাকিয়ে দেখার প্রয়োজন বোধ করেনি, কাজটা কাকে করতে দিচ্ছে।

ফোনের দিকে হাত বাড়াচ্ছে রানা। এমন সময় এক মেয়ে এসে দাঁড়াল সামনে। হাতটা বাড়িয়ে ধরেছে সে। একটা চিরকুট। মেয়েটির হাত থেকে ছোঁ মেরে নিল সেটা রানা।

চিরকুটে লেখা রয়েছে, 'একটা ফোন করতে চাই এখান থেকে। অনুমতি পাব কি, মেজর রানা?' লেখাটার নিচে একটা সই। সইটা দেখে মুচকি একটু হাসি ফুটে উঠল রানার ঠোঁটে।

মুখ তুলে মেয়েটির দিকে তাকাল রানা। 'জেনারেল আরাবীকে গিয়ে বলো, ফোনটা যেন তিনি নিজে করেন। এবং স্টেশনের বাইরে এখন কারও সাথে কথা বলা উচিত হবে না।'

দূর থেকে লাউডস্পীকারের শব্দ ভেসে আসছে। 'অ্যাটেনশান, প্লীজ! আমাদের দুটো মিগ অ্যারোড্রোমের ওপর স্মোকস্ক্রিন তৈরি করতে যাচ্ছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে, শত্রুপক্ষের ট্রুপ ক্যারিয়ারগুলো ল্যাণ্ড করার জন্যে বেপরোয়া চেষ্টা চালাবে। যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে তাতে ধারণা করা যায়, শত্রুপক্ষের এই ট্রুপ ক্যারিয়ারগুলো অধিকাংশ অ্যারোড্রোমের ওপর বিধ্বস্ত হবে। বিধ্বস্ত বিমানের রেহাই পাওয়া ট্রুপ যাতে কোনরকম আক্রমণাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করতে না পারে তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে গ্রাউণ্ড ডিফেন্সকে। কামানগুলোকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেয়া হয়েছে যাতে কোন শত্রু বিমান রানওয়েতে নেমে পড়লে গুলি করতে পারে। সুতরাং কামানগুলোর লাইন অফ ফায়ারের মধ্যে কেউ যেন কোনক্রমেই না যায়। অফ!'

রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা। মেইন গেট রক্ষার দায়িত্ব পালনরত মেজর মওদুদ এবং সেন্ট্রিদের ডিটাচমেন্ট কমাণ্ডার মেজর হাসানকে দ্বিতীয়বার সাবধান করে দিল ও, যাতে কেউ স্টেশনে ঢুকতে না পারে। কড়া নির্দেশ দিল, স্টেশন থেকে কোন অজুহাতেই কাউকে যেন বেরিয়ে যাবার অনুমতি দেয়া না হয়। পালাবার চেষ্টা যদি কেউ করে তাকে থামাতে হবে, প্রয়োজন হলে গুলি করে।

'স্যার, ফোনে মেজর হাসান চাইছেন আপনাকে,' টেলিফোনিস্ট মেয়েটা ডাকল রানাকে।

ভুরু কুঁচকে উঠল রানার। ওর ইঙ্গিতে রিসিভারটা নিয়ে এগিয়ে এল একজন।

'মেজর হাসান? কি জানতে চান আবার?'

অপরপ্রান্ত থেকে চঞ্চল কণ্ঠস্বর ভেসে এল। 'মেজর রানা, আমাদের একজন লোক নিজের মাথায় গুলি করে...।'

বাক্যের বাকি অংশটা পূরণ করল রানা, 'আত্মহত্যা করেছে, এই তো? একজন করপোরাল। করারই কথা। জামাল আরসালানের অনুচর ছিল লোকটা। ভুলটা আমারই, মেজর হাসান। ব্যস্ততার মধ্যে মনে ছিল না, তাই আপনাকে সাবধান করে দিতে পারিনি। তারকাঁটার বেড়ায় বিদ্যুৎ চালিয়ে দিয়ে আমাকে খুন করার চেষ্টা করেছিল ও আর নঈম যাকের।'

'আর কাউকে সন্দেহ করেন আপনি, মেজর রানা?'

'আপনার ডিটাচমেন্টে সম্ভবত আর কেউ নেই,' বলল রানা, 'তবে স্টেশনে আরও কিছু লোক পাওয়া যাবে যারা ইসরায়েলের হয়ে কাজ করছে। তাদেরকে এখুনি বা একদিনে খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। ধীরে ধীরে তারা নিজেরাই ধরা পড়বে। চোখ-কান খোলা রাখবেন, তাহলেই হবে।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে মুখ তুলল রানা। দেখল, ছোটখাট একটা ভিড় জমে উঠেছে ওর সামনে। প্রত্যেকের হাতে টাইপ করা একটা করে কাগজ। বাড়িয়ে ধরা হাতগুলো দেখল রানা। তারপর ওদের মুখের দিকে তাকাল। ইফফাত হাসছে। ওর হাতের কাগজটাই প্রথমে নিল রানা।

এদ্ দায়রা থেকে একটা শুভ সংবাদ এসেছে। চারটে ট্রাক, স্মোক সিলিণ্ডারসহ, দখল করতে পারা গেছে।

দ্রুত এবং সংক্ষেপে বলল রানা, 'রিপোর্টটা এয়ার কমোডোরকে গিয়ে দেখাও।'

একের পর এক গোটা লেবাননের এয়ারফাইটার স্টেশনগুলো থেকে রিপোর্ট আসছে। প্রতিটি রিপোর্টের বক্তব্য, যথাসময়ে সাবধান করে দেয়ায় শত্রুপক্ষের ট্রাকগুলোকে হয় ধ্বংস নয় আহত বেঈমান সহ দখল করা গেছে। প্রতিটি রিপোর্টের শেষে স্টেশন কমাণ্ডার অকুণ্ঠ ভাষায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন রানার প্রতি।

পরপর সতেরোটা রিপোর্টে চোখ বুলিয়ে সেগুলো তৎক্ষণাৎ এয়ার কমোডোর নেহার কাদিনের কাছে পাঠিয়ে দিল রানা। তার মধ্যে চারটে রিপোর্টের বক্তব্য প্রায়

একই রকম।

ঃ লেবাননের সামরিক বাহিনীর উচ্চপদস্থ অফিসাররা জানতে চাইছেন, মাসুদ রানা কে, কি তার পরিচয়, তাঁর ঋণ কিভাবে পরিশোধ করা সম্ভব? অর্থাৎ বীরত্বের সবচেয়ে বড় পদকটি তাঁকে দেয়া হবে কিনা।

বৈরুতে যুদ্ধমন্ত্রী জেনারেলদের নিয়ে গোপন বৈঠকে মিলিত হয়েছেন, বৈঠকে টেলিফোনের মাধ্যমে অংশ গ্রহণের জন্যে এয়ার কমোডোরকে আহ্বান জানানো হয়েছে, আলোচ্য বিষয়ের একটিঃ মাসুদ রানাকে লেবাননের নাগরিকত্ব গ্রহণ করার অনুরোধ জানালে তা তিনি গ্রহণ করবেন কিনা, অথবা বিকল্প কি উপায়ে তাঁকে সম্মানিত করা যেতে পারে?

তৃতীয় রিপোর্টটি এসেছে প্রধান মন্ত্রীর দফতর থেকে। জানতে চাওয়া হয়েছেঃ মি. মাসুদ রানা সুস্থ আছেন কিনা।

রিপোর্টগুলো পাঠিয়ে দিয়ে হাঁপ ছাড়ল রানা। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, এয়ার কমোডোর গভীর মনোযোগের সাথে কথা বলছেন ফোনে।

'রানা!'

চমকে উঠে ঘুরে দাঁড়াতেই ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল ওকে স্বামী স্ত্রী দু'জন একসাথে।

'আরে! দম আটকে মেরে ফেলবে নাকি তোমরা আমাকে! উপকার করার এই বুঝি প্রতিদান?'

স্ত্রীকে জায়গা ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে গেল এক পা আতাসী। মুখ ভর্তি খোঁচা খোঁচা দাড়ি, চোখের কোণে কালি, উসকোখুসকো মাথার চুল—কিন্তু চোখ দুটো উজ্জ্বল আতাসীর। 'ওস্তাদ! এই ঋণ...।'

'থাক, থাক,' আতাসীকে নয়, কথাটা রানা মার্শিয়াকে বলছে। চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিচ্ছে সে রানার কপাল। দু'হাত দিয়ে তাকে ধরে সরিয়ে দিল রানা। একটু এগিয়ে ঝুঁকে পড়ল আতাসীর দিকে। 'ওহে, তোমার বউ আমার কপাল আর নাক ভিজিয়ে দিয়েছে, মুছে দাও!'

'ওস্তাদ!' রানার ভিজে কপালে চুমু খেল আতাসী, 'কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা জানা নেই আমার। আমার প্রাণ বেঁচেছে বলে নয়, লেবানকে তুমি রক্ষা করেছ...।'

'এখনও রক্ষা পেয়েছে কিনা জানি না,' বলল রানা, 'আতাসী, মার্শিয়া, আমাকে এখন ক্ষমা করতে হবে। তোমাদের সাথে পরে কথা বলব, সুযোগ মত। এই মুহূর্তে...।'

মার্শিয়া খপ্ করে একটা হাত ধরে ফেলল রানার। 'জানি, তোমার কাঁধে মস্ত দায়িত্ব, চাইলেও তোমাকে আঁকড়ে ধরে রাখতে পারব না। ঠিক আছে, পরে দেখা হবে—তুমি তোমার কাজ করো।'

গালে হাত বুলাতে বুলাতে জেনারেল আরাবীর দিকে এগোল রানা। ওকে

দেখতে পেয়ে পায়চারি থামিয়ে এগিয়ে এলেন তিনি। গম্ভীর দেখাচ্ছে তাঁকে। মুখোমুখি দাঁড়াল দু'জন। পরস্পরকে দেখল নিঃশব্দে।

কেটে গেল পাঁচটা সেকেণ্ড। তারপর রানা কথা বলল। জবাবদিহি চাইবার সুরটা স্পষ্ট অনুভব করলেন জেনারেল আরাবী। 'স্যার, একটা প্রশ্ন আছে আমার। প্রশ্নটা আমি করিনি, তার কারণ, ভেবেছিলাম জানতে চাইবার আগেই উত্তরটা আপনি দেবেন। কিন্তু আপনি আমাকে নিরাশ করেছেন।'

কেমন যেন একটু অপ্রতিভ দেখাল জেনারেল আরাবীকে। 'রানা, আমি জানি, মানে···।'

'স্যার, আমার প্রশ্নটা কি তা নিশ্চয়ই আপনি বুঝতে পেরেছেন!' রানা বলল, 'আমি জানতে চাই, কোত্থেকে খবর পেলেন আপনারা? কথা ছিল, শুধুমাত্র আমার সাফল্যের চূড়ান্ত খবর আমার কাছ থেকে পেলে তবেই আপনি আমার পরিচয় প্রকাশ করার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবেন। কিন্তু···।'

'ব্যাপারটা তোমাকে খুলেই বলি তাহলে,' বললেন জেনারেল আরাবী, 'তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, আতাসীকে ষড়যন্ত্রের জাল থেকে উদ্ধার করার ব্যাপারে তোমার প্রস্তাব শুনে আমি প্রথমেই তোমাকে জানিয়ে দিয়েছিলাম যেহেতু আমি লেবানন সামরিক বাহিনীর কেউ নই, তাই তোমাকে এয়ার ফাইটার স্টেশন নাবাতিয়ায় ঢোকাবার ব্যাপারে সাহায্য করতে পারলেও তোমার নিরাপত্তার ব্যাপারে কোন রকম দায় দায়িত্ব পালন করতে পারব না?'

'এসব পুরানো কথা আমাকে মনে করিয়ে দেবার কোন দরকার নেই,' বলল রানা, 'আমি আপনার সব শর্ত মেনে নিয়েই এখানে এসেছিলাম।'

'ঠিক,' বললেন জেনারেল আরাবী, 'কিন্তু তুমি মেনে নিলেও, আমার বন্ধু আমার এ সব যুক্তি মেনে নিতে রাজি নন। তিনি···।'

'আপনার বন্ধু?' ভুরু কুঁচকে উঠল রানার।

'মেজর জেনারেল রাহাত খান।'

'হোয়াট! তিনি এসব ব্যাপার জানেন?'

'শুধু জানেন তাই নয়,' জেনারেল আরাবী গম্ভীর। 'তিনি আমাকে যা-তা বলে গালিগালাজ করেছেন। কড়া একটা নোট পেয়েছি আমরা তাঁর কাছ থেকে। তাতে তিনি বলেছেন, তোমাকে একা বিপদের মুখে এভাবে ঠেলে দেবার কোন অধিকার আমার নেই। অভিযুক্ত করেছেন এই বলে যে কাজটা করে আমি দায়িত্বহীনতার চূড়ান্ত পরিচয় দিয়েছি। হুমকি দিয়ে বলেছেন, তোমার যদি কোন ক্ষতি হয়, বন্ধুত্ব তো শেষ হয়ে যাবেই, তিনি এই অন্যায়ের প্রতিশোধ না নিয়ে ক্ষান্ত হবেন না। মোটকথা এমন রেগে আছেন যে, সামনাসামনি হলে সাধারণত যা হবার কথা, যা এতদিন হয়ে এসেছে—আন্তরিক কুশল বিনিময়, উষ্ণ আলিঙ্গন—তার বদলে হাতাহাতি; মারামারি ইত্যাদি যত খারাপ ব্যাপার তিনি না ঘটিয়ে ছাড়বেন না।'

কি এক অবর্ণনীয় আনন্দে বিহ্বল হয়ে পড়েছে রানা। ঝিরঝির ঝিরঝির ফুলের

পাপড়ির মত স্বর্গের শান্তি ঝরছে ওর সর্বাঙ্গে। চিকচিক করে উঠল চোখ দুটো। বুড়ো তাকে ভোলেনি তাহলে? এখনও তার খবর রাখে, তার নিরাপত্তার কথা ভেবে দুশ্চিন্তা করে? ভালবাসে?

'তোমার ব্যাপারে তাঁর উদ্বেগ লক্ষ করে একটু অবাকই হয়েছি আমি, রানা,' জেনারেল আরাবী বলে যাচ্ছেন, 'এমন কড়া ধমক কারও কাছ থেকে জীবনে খাইনি। শেষ পর্যন্ত এয়ার কমোডোরকে সব কথা না জানিয়ে পারলাম না। সব কথা শুনে তিনি কাউকে কিছু না জানিয়ে বৈরুত থেকে আমাকে নিয়ে রওনা হলেন···।'

হঠাৎ যেন স্বপ্ন থেকে জাগরণ ঘটল রানার। দেখল, এয়ার কমোডোর এগিয়ে আসছেন ওদের দিকে।

'মি. রানা, আপনার প্রতি আমাদের প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর কয়েকটা অনুরোধ আছে···।'

'পরে,' এয়ার কমোডোরকে বাধা দিয়ে বলল রানা, 'সময় যদি হয়। এখন, স্যার, আমি আমার সহকর্মীদের কাছে ফিরে যেতে চাই।'

দু'জনের কেউই বুঝলেন না ওঁরা রানার কথা।

আবার বলল রানা, 'যাদের সাথে এতদিন ছিলাম, তাদেরকে এতবড় বিপদে ফেলে আমি নিরাপদ কন্ট্রোলরুমে থাকতে পারি না, স্যার। আমি আমার গানপিটে ফিরে যাচ্ছি। উইং কমাণ্ডারকে ডাকুন, তাঁর হাতে দায়িত্ব দিয়ে যেতে চাই আমি।'

'রানা, তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে?' জেনারেল আরাবী প্রতিবাদ জানালেন, 'এতক্ষণ তাহলে কি বললাম তোমাকে? তোমার যদি কিছু হয়, মেজর জেনারেল রাহাত খান আমাকে স্বর্গ পর্যন্ত ধাওয়া করবেন গুলি করার জন্যে। অসম্ভব, গানপিটে তোমাকে আমি যেতে দিতে পারি না।'

'তাছাড়া প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এবং প্রেসিডেন্টের প্রাইভেট সেক্রেটারি আমার ওপর দায়িত্ব দিয়েছেন আপনার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যে,' বললেন এয়ার কমোডোর। 'গানপিটে কিভাবে যেতে দিই আপনাকে? ওখানে নয়, এই কন্ট্রোল-রুমেই আপনার উপস্থিত থাকা প্রয়োজন।'

জেনারেল আরাবীর দিকে তাকিয়ে রানা বলল, 'ওটা আপনার ভুল ধারণা, স্যার। মেজর জেনারেল রাহাত খান শুনলে খুশিই হবেন যে আমি গানপিটে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করার সুযোগটা হাত ছাড়া করিনি। তাছাড়া, স্যার, এই ফাইটার স্টেশনে যারা আমাকে বন্ধুত্বের বন্ধনে জড়িয়েছে তাদের অধিকার সবচেয়ে আগে বিবেচনা করতে হবে আমাকে।' এয়ার কমোডোরের দিকে ফিরল রানা, 'আমার নিরাপত্তার কথা ভেবে দুশ্চিন্তা করবেন না, স্যার। যেখানে বিপদের ভয় আছে সেখানেই আমাকে যেতে হয়, কেন না, সেখানে যাবার একটা তাড়না প্রতি মুহূর্তে আমাকে রোমাঞ্চিত করে রাখে। চললাম, স্যার। আবার হয়ত দেখা হবে।'

'কিন্তু···।'

হাঁটতে শুরু করেছে রানা। পিছন ফিরে তাকাল না ও। উইং কমাণ্ডার তারেক

হামেদীর সামনে গিয়ে দাঁড়াল দশ সেকেণ্ডের জন্যে। কিছু বলল তাঁকে। একদিকে মাথা কাত্ করে সায় দেবার ভঙ্গি করলেন উইং কমাণ্ডার। রানা আবার এগোল।

পিন-পতন স্তব্ধতা। সবাই দেখছে ওকে। বেরিয়ে গেল রানা দরজা খুলে।

'গুড লাক, রানা!' জেনারেল আরাবীর কণ্ঠস্বর শুনতে পেল রানা।

দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল ওর পিছনে।

এগারো

সেই সাইকেলটাকে গেট থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে দেখতে পেল রানা।

সাইকেলে চড়ে দ্রুত প্যাডেল মেরে টারমাকে উঠল ও। অ্যারোড্রোমের প্রায় বিপরীত দিকে ওদের গানপিটটা আবছা ভাবে দেখতে পাচ্ছে। ধূসর, সমতল আর ঠাণ্ডা লাগছে ল্যাণ্ডিং ফিল্ডটাকে। গ্রাউণ্ড-ডিফেন্সের ট্রেঞ্চগুলোর উপর নীল আর খাকী স্টীল হেলমেট দেখা যাচ্ছে। দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে সৈন্যরা, হাতে রাইফেল নিয়ে প্রস্তুত, কংক্রিটের পিল বক্সের প্রবেশ পথের কাছে। চোখমুখে রূঢ়তার ছাপ। প্রত্যাশার অপ্রীতিকর একটা পরিবেশ তৈরি হয়ে গেছে।

হ্যাঙ্গারের সামনে টারমাক পেরোবার সময় একটা মিগকে দেখল রানা ল্যাণ্ডিং ফিল্ডের পুব কিনারা বরাবর উড়ে যেতে। এত নিচু দিয়ে উড়ছে দেখে মুহূর্তের জন্যে ছ্যাঁত করে উঠল ওর বুক প্রথম ডিসপারসাল পয়েন্টের সাথে ধাক্কা লাগতে যাচ্ছে ভেবে। দিগন্তরেখার একেবারে গা ঘেঁষে ঝলমলে নীল আকাশের গায়ে সরু পেন্সিলের দাগের মত একটা রেখা পিছনে রেখে যাচ্ছে মিগটা। প্রতি সেকেণ্ডে বড় হচ্ছে রেখাটা। দেখতে দেখতে প্রকাণ্ড কালো মেঘের আকৃতি পেল। অ্যারোড্রোমের উত্তর প্রান্তে পৌঁছে ধোঁয়া ছাড়া বন্ধ করল প্লেনটা। বাঁক নেবার জন্যে কাত্ হতে শুরু করতে সেটাকে আর দেখতে পেল না রানা।

স্টেশন হেডকোয়ার্টারের সবচেয়ে কাছের হ্যাঙ্গারের পাশে কয়েকজন লোকের একটা ভিড়কে একটা বেলুন নিয়ে ব্যস্ত দেখল ও। বেলুনটাকে ব্যারেজ বেলুনের ক্ষুদ্র সংস্করণ বলে মনে হল ওর। বেলুনটার ঠিক নিচেই লাল একটা আলো ঝোলাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। হ্যাঙ্গারের পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখল, বেলুনটা ধীর এবং স্বচ্ছন্দ গতিতে উপরে উঠে যাচ্ছে।

পুব প্রান্ত ধরে সাইকেল ছুটিয়ে যাচ্ছে রানা। দ্রুত ঢাকা পড়ে যাচ্ছে মাথার উপর আকাশ। সাত-সকালে সন্ধ্যা নামছে নাবাতিয়া ফাইটার স্টেশনে। কালো ধোঁয়ার পুরু শামিয়ানা মাথা থেকে এত কাছাকাছি, হাত বাড়ালেই ছুঁতে পারবে বলে মনে হল ওর। দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে যাচ্ছে বিশাল ধোঁয়ার মেঘ, দ্রুত আকাশ গ্রাস করতে করতে। এখান-ওখান থেকে হাতির শুঁড়ের মত বাঁকা হয়ে মাটিতে নেমে এসেছে ধোঁয়া কয়েক জায়গায়, ধীর গতিতে মোচড় খাচ্ছে, ওগুলোর মাঝখান দিয়ে দ্রুত সাইকেল ছুটিয়ে যাবার সময় কটু গন্ধে নাক জ্বালা করে উঠল ওর। ওদের

গানপিটের ঠিক উত্তরের ডিসপারসাল পয়েন্টের পাশ দিয়ে যাবার সময় দ্বিতীয় মিগটা মাথার উপর দিয়ে তীরবেগে উড়ে যাচ্ছে টের পেল ও। শব্দ শুনে, দেখতে না পেলেও, ঝট্ করে নামিয়ে নিল মাথাটা ধাক্কা লাগার ভয়ে। ধোঁয়ার সাথে আরও ধোঁয়া যোগ হতে নিকষ কালো হয়ে উঠল পর্দাটা।

গানপিটে ঢোকার সময় রানা সকলের মুখের দিকে তাকাল। গওহর জুমলাত, সাইয়িদ হাকাম, কুতুব দীন, আফাজী···কিন্তু কাফা কোথায়?

'মেজর, আ-আপনি···!' সাইয়িদ হাকাম সম্বোধনটা সহজে উচ্চারণ করতে পারছে না।

'সার্জেন্ট জুমলাত!' তেড়ে গেল রানা। 'খবরদার বলছি, হাতাহাতি হয়ে যাবে কেউ যদি আপনি, মেজর ইত্যাদি অশ্রাব্য গালি দেয় আমাকে।'

গওহর জুমলাত সগর্বে হাসল সকলের দিকে তাকিয়ে। বলল, 'কি, বলিনি? দেখলে তো, আমার কথা ঠিক কিনা? আমি জানতাম মেজর রানা··· ।'

'ফের?'

'থুড়ি,' জিভ কাটল সার্জেন্ট জুমলাত।

'কাফা কোথায়?' উদ্বেগ ফুটে উঠল রানার কণ্ঠে।

'ফুলের মালা যোগাড় করতে যাচ্ছি বলে সেই যে গেছে··· ।'

'ফুলের মালা! কেন?'

'আপনার···,' রানা ঘুসি পাকাচ্ছে দেখে সাইয়িদ হাকাম তাড়াতাড়ি সংশোধন করে নিল সম্বোধনটা, 'তোমার হাত থেকে নিজের গলায় মালা পরবে, তাই।'

'কি যে বলতে চাইল, ঠিক বুঝিনি আমরা ওর কথা,' বলল জুমলাত।

'আমি বুঝেছি,' মুচকি একটু হাসল রানা।

'রানা,' বলল হাকাম, 'নঈম যাকের কাকের চেয়েও চালাক ছিল, বুঝলে? তারকাঁটার বেড়ায় বিদ্যুৎ চালাবার প্রস্তাবটা আমাকে দিয়ে সে উত্থাপন করায়, কৌশলটা··· ।'

'ওসব কথা থাক,' বলল রানা, 'ইসরায়েলের পক্ষে তোমার কোন ভূমিকা ছিল না, এটুকু জেনেই আমি খুশি। আমাদের বদরাগী হাকাম আমাদেরই আছে দেখে সন্তুষ্ট।'

'রানা, এই ধোঁয়ার কি মানে?' জানতে চাইল জুমলাত।

উত্তর দেবার সময় পেল না রানা, তার আগেই লাউডস্পীকার চারদিক কাঁপিয়ে ঘোষণা করতে শুরু করল, 'মাস ফরমেশন অ্যাটাক অ্যালার্ম! মাস ফরমেশন অ্যাটাক অ্যালার্ম! বিশাল ঝাঁকের আক্রমণ সংকেত! ট্রুপ ক্যারিয়ারের দুটো বড় আকৃতির ঝাঁক, সামনে ফাইটারগুলোকে সাথে নিয়ে দক্ষিণ-পুব দিক থেকে অ্যারোড্রোমের দিকে আসছে!'

ঝনঝন শব্দে বাজল টেলিফোন। রিসিভার তুলে জুমলাত বাড়িয়ে দিল রানার দিকে, 'ওস্তাদ!'

রিসিভার নিয়ে কানে ঠেকাল রানা। খানিকপর সেটা নামিয়ে রেখে বলল,

'ঝাঁকের মধ্যে ট্রুপ ক্যারিয়ারগুলো বেশির ভাগই ডগলাস C-124 গ্লোবমাস্টার। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ওগুলো আট হাজার ফুট ওপর থেকে আরও নিচের দিকে নামছে। কন্ট্রোলরুম অনুমান করছে আমাদের রানওয়েতে পঞ্চাশটার মত ল্যাণ্ড করার চেষ্টা করবে।'

'পঞ্চাশটা!' কুতুব দীন আঁতকে উঠল। 'গুড গড! রানা, তোমার কি মনে হয়, রক্ষা করতে পারব আমরা লেবাননকে?'

হেসে উঠে অভয় দিল রানা, 'কেন পারব না? অভ্যর্থনা জানাবার কি ব্যবস্থা করেছি আমরা তা দেখছ? বিধ্বস্ত হবার মাত্র ক'সেকেণ্ড আগে ওদের পাইলটরা ফাঁদটা দেখতে পাবে, তখন করার কিছুই থাকবে না।'

'কিন্তু পঞ্চাশটা গ্লোবমাস্টার! একটা গ্লোবমাস্টারে দুশো প্যারাট্রুপার বসতে পারে।' হাকাম ঢোক গিলল। 'তার মানে আমাদের এই স্টেশনেই দশ হাজার ইসরায়েলি প্যারাট্রুপ নামতে যাচ্ছে!'

'হ্যাঁ। তার কারণ, নাবাতিয়া লেবাননের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এয়ার ফাইটার স্টেশন। অন্যান্য স্টেশনে এক থেকে তিন হাজার সৈন্য নামাবার চেষ্টা করবে ওরা।'

'কিন্তু রানা, একটা ব্যাপার আমার মাথায় ঢুকছে না,' গওহর জুমলাত সমীহের সাথে প্রশ্ন করল, 'এই ঘন স্মোক স্ক্রিনের ভিতর দিয়ে দৃষ্টি তো চলবে না, কামান দাগব কিভাবে শত্রুবিমান না দেখে?'

'যতক্ষণ স্মোক স্ক্রিন থাকবে,' বলল রানা, 'ততক্ষণ কামান দাগার বিশেষ দরকার হবে না। শত্রুবিমান ভিড় জমাবে হ্যাঙ্গারগুলোর কাছে।' সংক্ষেপে রানা ব্যাখ্যা করল কিভাবে বেলুনগুলো শত্রুবিমানগুলোকে অপচালিত করবে।

'বুঝলাম। কিন্তু, যেগুলো ল্যাণ্ড করতে পারবে?'

ফোন বাজল হঠাৎ। রিসিভার তুলল রানা। বিশ সেকেণ্ড মেসেজ শুনল ও। 'জুমলাত, তোমার প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেছে। হ্যাঙ্গারের কাছাকাছি যখন আসবে ওগুলো, স্টেশন হেডকোয়ার্টার থেকে সার্চলাইটের সুইচ অন করে দেয়া হবে।'

'কিন্তু আলো দেখে ফাঁদটা টের পেয়ে যাবে না ওরা?' জানতে চাইল আফাজী।

'না,' বলল রানা। 'ওরা ভাববে স্মোকস্ক্রিনটা ওদেরই লোকের তৈরি। আলোর সাহায্যে ওদেরকে আমরা দেখার চেষ্টা করব, সেটাই তো স্বাভাবিক।'

'ওই শোনো!' চেঁচিয়ে উঠল হাকাম।

মিগ দুটো এখনও আকাশে। ও-দুটোর শব্দকে ছাপিয়ে উঠেছে গম্ভীর একটা ভরাট আওয়াজ। বাতাসে একটা কম্পন অনুভব করল রানা। টেনে ফড়ফড় করে কাপড় ছেঁড়ার মত শব্দ হল মেশিনগান ফায়ারের। পরপর দুটো বিস্ফোরণের শব্দ হল। ইসরায়েলি বিমানের আওয়াজে যেন মহাশূন্য ভরাট হয়ে উঠছে। আরও মেশিনগানের আওয়াজ।

হঠাৎ ভরাট গুঞ্জনটাকে ছাপিয়ে উঠল পুব দিক থেকে ভেসে আসা শত্রুবিমানের তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী একটা শব্দ।

'অ্যাটেনশান, প্লীজ! অ্যাটেনশান প্লীজ! ট্রুপ ক্যারিয়ারগুলো এই মুহূর্তে ল্যাণ্ড করার জন্যে অ্যারোড্রোমের চারধারে চক্কর মারছে। ওগুলো উত্তর থেকে দক্ষিণে আসবে। বীর যোদ্ধা ভায়েরা, মেজর রানার নেতৃত্বে ওদেরকে জন্মের মত উচিত শিক্ষা দিয়ে দাও। অফ!'

'এটা আমাদের পূর্ব-পুরুষের ভাগ্য যে...।'

'থাক, থাক,' কি বলতে চাইছে হাকাম তা বুঝতে পেরে তাকে থামিয়ে দিল রানা।

'দোস্ত!' কাফা ঢুকল গানপিটে হাঁপাতে হাঁপাতে। 'বড্ড দেরি হয়ে গেল! কখন এসেছ, দোস্ত? এই নাও ফুলের মালাটা। দাও, আমার গলায় পরিয়ে দাও দেখি,' হাতের মালাটা বাড়িয়ে দিল রানার দিকে।

ছোঁ মেরে সেটা কাফার হাত থেকে নিয়ে নিজের গলায় পরল রানা। 'তোমার পরিচয় আমি জানি, হুসাইন কাফা। ভেবেছিলে, নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পেরেছ। কিন্তু সেটা তোমার ভুল ধারণা।'

কালো হয়ে গেল কাফার মুখ। 'তুমি! তুমি জানো আমি গানার নই? যা করেছি সব অভিনয়...?'

'জানি। জেনেছি অবশ্য একটু দেরিতে,' বলল রানা, 'তবে, দোস্ত, একটা কথা স্বীকার করতেই হবে আমাকে, তোমাকে চিনতে দেরি হবার কারণ তোমার অপূর্ব অভিনয়। সত্যি, তুলনা হয় না।'

একগাল হাসল কাফা। মুখের কালো ছাপটা অদৃশ্য হয়ে গেছে মুহূর্তে। 'প্রশংসার জন্যে ধন্যবাদ। কিন্তু, রানা, তুমি আমাকে সন্দেহ করেছ এ আমি কল্পনাই করিনি। সে যাক, একটা চমক এখনও আছে—এখন নয়, সিজ ফায়ারের পর টের পাবে।'

ল্যাণ্ডিং ফিল্ডের দিকে কামানের ব্যারেল ঘোরাতে বলল জুমলাত। আফাজী এবং কুতুব দীন প্ল্যাটফর্মের সীটে গিয়ে বসল। কামানের পিছনে লকার, তাতে শেল, দরজা খুলে তৈরি হয়ে আছে সাইয়িদ হাকাম।

তীক্ষ্ণ শব্দগুলো একত্রিত হয়ে একাকার, ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। কিন্তু একেবারে মিলিয়ে গেল না। অ্যারোড্রোমের চারদিক থেকে গভীর, ভরাট আওয়াজ কাঁপিয়ে রেখেছে বাতাস। আতঙ্কটা অদৃশ্য। শুধুই শব্দ শুনে আঁচ করতে হচ্ছে বিপদটাকে।

সমস্ত আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠল একটা প্লেনের ইঞ্জিন। উত্তর দিক থেকে দ্রুত এগিয়ে আসছে সেটা। 'রাইট। ফিউজ এ হাফ। লোড!' জুমলাতের কণ্ঠস্বর স্পষ্ট এবং শান্ত।

হঠাৎ স্টেশন হেডকোয়ার্টারের সার্চলাইট জ্বলে উঠল। চওড়া আর বিরাট লম্বা আলোর থামটা অদ্ভুত একটা দৃশ্যের সৃষ্টি করল ল্যাণ্ডিং গ্রাউণ্ডে। ধোঁয়ার জন্যে আলোটাকে নিষ্প্রভ দেখাচ্ছে। ল্যাণ্ডিং গ্রাউণ্ডটা খোদ আলোর দ্বারা নয়, আলোকিত ধোঁয়ার আভায় কিছুটা উজ্জ্বলতা পেল। আলোর থামের উপর ঘন কালো মেঘের

মত আলোড়িত হচ্ছে ধোঁয়া।

এগিয়ে আসছে প্লেনটা। বাতাসে এখন আর মন্থর গতি কম্পন নেই। তীক্ষ্ণ একটা শব্দ ধেয়ে আসছে। ওদের সামনে দিয়ে অ্যারোড্রোমটাকে পেরিয়ে গেল আওয়াজটা। ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে পথ চিনে অনায়াসে যেতে.পারল মনে হল রানার।

তারপর হঠাৎ করে ধোঁয়ার ভিতর শুধু দেখা গেল ল্যাণ্ডিং হুইলগুলো। ধোঁয়ার ভিতর সাদাটে কি যেন ফুটে উঠছে ক্রমশ। দুটো ডানা, অনুমান করল রানা। সার্চলাইটের ভিতর আসতে যেন এক যুগ সময় নিচ্ছে প্লেনটা। সহজ ভঙ্গিতে নিচে নামছে, হুইলের সাহায্যে রানওয়ে খুঁজছে যেন।

গোটা প্লেনটা দেখা যাচ্ছে এখন। কুয়াশা ঢাকা রাতে রাস্তার ধারে ল্যাম্পপোস্টের আলোর নিচে রূপোলী একটা পোকা উড়ছে যেন। এত দ্রুত আকৃতি বদলাচ্ছে, দীর্ঘ ডানার বাস্তবতাটাকে অবিশ্বাস্য, রূপকথার একটা ঘটনা বলে মনে হল রানার।

ধোঁয়া থেকে বেরিয়ে সোজা B হ্যাঙ্গারের দিকে উড়ে এল প্লেনটা। অনেক দেরিতে পাইলট দেখতে পেল ফাঁদটা।

দুর্ভাগা শয়তান! ভাবল রানা।

পুরু ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে আসার সময় দেখতে না পেলেও, নিশ্চিত ছিল সে, আর একটু নিচে নামলেই রানওয়ে স্পর্শ করবে প্লেনের চাকা। অকস্মাৎ ধোঁয়া থেকে বেরিয়েই সে চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বল আলোয় দেখল তার ককপিটের সামনে বিশাল হ্যাঙ্গারের কালো ছায়া ঝুলে রয়েছে।

অকস্মাৎ মরিয়া হয়ে উঠল পাইলট। ইঞ্জিনের নিদারুণ উদ্দীপনায় তড়পে উঠল প্লেনটা। সামান্য একটু উপরে উঠল। এক সেকেণ্ডের জন্যে মনে হল রানার, হ্যাঙ্গারটাকে বুঝি এড়িয়ে যেতে পারবে। কিন্তু হ্যাঙ্গারের কিনারাটা যেন ওৎ পেতে ছিল, নাগালের মধ্যে আসতেই প্লেনটার আণ্ডার ক্যারেজ ধরে ফেলল সে। প্রকাণ্ড প্লেনটা ধীর গতিতে খাড়া হয়ে যাচ্ছে। নাকের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াল সেটা। তারপর আছড়ে পড়ল চিৎ হয়ে। সংঘর্ষের শব্দে খাড়া হয়ে উঠল গায়ের রোম। ছাদটা ধসে পড়তে অদৃশ্য হয়ে গেল প্লেনটা।

এরই মধ্যে পরবর্তী শিকার পৌঁছে গেছে তার মৃত্যুপথে। গানপিটের মাথার উপর, ধোঁয়ার পর্দার কাছ থেকে অনেক উঁচুতে একনাগাড়ে মেশিনগান ছুটছে। সকালবেলার পবিত্র আলোয় ওদের দৃষ্টির বাইরে তুমুল ডগ ফাইট চলেছে। দ্বিতীয় প্লেনটা আসছে, যদিও তাকে এখনও দেখতে পাচ্ছে না ওরা কেউ। দ্রুত এগিয়ে আসছে তীব্র আওয়াজটা। ল্যাণ্ডিং গ্রাউণ্ড পেরোচ্ছে এই মুহূর্তে। নিজের চারদিকে একবার তাকাল রানা। সকলের দুটো করে চোখ স্থির হয়ে আছে। সার্চলাইটের সাদা উজ্জ্বলতা ওদেরকে সম্মোহিত করে রেখেছে যেন। অপেক্ষা করে আছে কখন প্লেনটাকে দেখতে পাবে, ধোঁয়ার ভিতর থেকে নিচের দিকে ধীর ভঙ্গিতে নেমে আসছে।

অনুমান করতে পারছে রানা, ল্যাণ্ডিং ফিল্ডের চারদিক থেকে সবাই নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে হ্যাঙ্গারের উপর ধোঁয়ার উজ্জ্বল পেটের দিকে।

'অ্যাটেনশন, প্লীজ! অ্যাটেনশন, প্লীজ!' লাউডস্পীকার থেকে ঘোষণা ছড়িয়ে পড়ছে, 'দক্ষিণ গ্রাউণ্ড ডিফেন্স-এর এই মুহূর্তের কর্তব্য B হ্যাঙ্গারের প্রবেশ পথে প্রতিরোধ তৈরি করা। অফ!'

পুরো ঘোষণাটা কানেই ঢুকল না রানার। সমস্ত চেতনা দিয়ে প্লেনটাকে আসতে দেখছে ও। পিটের ভিতর কেউ নড়ল না। কেউ নিঃশ্বাস ছাড়ল না।

সার্চলাইটে সাদা হয়ে আছে ধোঁয়া। হঠাৎ রুপোলী মাছের মত চকচকে প্লেনটাকে দেখা গেল তার ভিতর। আকৃতিটা ভয়ঙ্কর লাগছে, আগেরটার চেয়ে অনেক বেশি দ্রুত নিচে নামছে এটা। হ্যাঙ্গারটাকে পাইলট দেখতে পেয়েছে বলে মনেই হল না। পুরোটা ভিতরে ঢুকে গেল সোজা। ডানা দুটো দুমড়ে ভেঙে গেল। ভাঙাচোরা হ্যাঙ্গারটাকে নিয়ে মাটিতে পড়ল প্লেনটা। পায়ের নিচের মাটি মৃদু কেঁপে উঠল। কয়েকটা মূর্তি ছিটকে পড়ল প্লেন থেকে বাইরে। নেশাগ্রস্ত মাতালের মত টলছে। একটা মেশিনগান গর্জে উঠল কাছ থেকে। তারপর আরও একটা। হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল মূর্তিগুলোর, লুটিয়ে পড়ল সব ক'টা।

হঠাৎ উপলব্ধি করল রানা, ধোঁয়ার কালিমা কেটে গেছে বেশ খানিকটা। মাথার উপর থেকে সরে গেছে পুরু ধোঁয়া। চারপাশ থেকে ছিটেফোঁটা উড়ে এসে একটা জাল তৈরি করছে শুধু। আরেকটা গ্লোবমাস্টার আসছে। মাথার উপর মেশিনগানের আওয়াজ এখন অবিরাম, একটানা। ট্রুপ ক্যারিয়ারগুলো চক্কর মারছে অ্যারোড্রোমকে ঘিরে, ভরাট গুঞ্জন শুনে বোঝা যাচ্ছে। গুঞ্জনটার পিছন থেকে আসছে ফাইটার-গুলোর ডাইভ দেয়ার, পাক খাওয়ার আর খাড়া উঠে যাবার শব্দ। ম্লান আলো যেন চুইয়ে চুইয়ে নামছে গানপিটে। ধোঁয়ার নিচে দেখা যাচ্ছে এখন পুবাকাশ, ঝলমল করছে রোদে। ধোঁয়ার কিনারার কাছে আকাশের রঙ নীলচে সবুজ। এক ঝাঁক পাখির মত দশ বারোটা গ্লোবমাস্টারকে বাঁক নিতে দেখল রানা, একটার লেজের সাথে আরেকটার নাক প্রায় ঠেকে আছে।

হঠাৎ রানার শার্টের আস্তিন খামচে ধরল জুমলাত। 'ওই দেখো!'

চরকির মত আধপাক ঘুরে ল্যাণ্ডিং ফিল্ডের দিকে তাকাল রানা। বাতাস লেগে দ্রুত গুটিয়ে যাচ্ছে ধোঁয়ার কিনারা। যদিও ফিল্ডের দুই তৃতীয়াংশ এখনও ঢাকা পড়ে আছে। সার্চলাইটের আলো এখনও নিষ্প্রভ। অনায়াস ভঙ্গিতে উড়ে আসতে দেখল রানা বিমানটাকে। ধোঁয়ার নিচে নেমে পড়েছে অনেকটা আগে থাকতেই। পাইলট বিপদটা তাই দেখার সময় পেল। ইঞ্জিনের শেষ মরণপণ গর্জন পিটটাকে কাঁপিয়ে দিল ভীষণ ভাবে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না, প্লেনটাকে আধহাতও উপরে উঠতে দেখল না রানা। শুধু গতিই বাড়ল তার, অসম্ভব দ্রুত অনিবার্য মৃত্যুর দিকে ছুটে আসছে। পাইলটের উপস্থিত বুদ্ধির প্রশংসা না করে পারল না রানা। যখন সে দেখল কোন উপায়ই নেই, হাল ছাড়েনি তবু। গোটা প্লেনটাকে কাত করে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করল সে বিধ্বস্ত হ্যাঙ্গারটার কাঠামোটাকে। সাফল্যের সাথে ফাঁদ গলে

বেরিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ ঠোকর খেল ডানাটা হ্যাঙ্গারের একটা পিলারের সাথে। গোটা দৃশ্যটা অবাস্তব বলে মনে হলো রানার চোখে। ওদের মাঝখানে ধোঁয়ার উপস্থিতি যেন একটা মস্ত প্রাচীর—এপারের গানপিটে দিনের আলোয় দাঁড়িয়ে আছে কয়েকজন, ওপারের কৃত্রিম অন্ধকার তাড়াচ্ছে কৃত্রিম আলো, তার মধ্যে হ্যাঙ্গার এবং প্লেনটা রয়েছে—দৃশ্যটা রানাকে থিয়েটার মঞ্চে ফুটলাইটের প্রতিক্রিয়া স্মরণ করিয়ে দিল।

আর সবগুলোর মত দুমড়ে মুচড়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে গেল প্লেনটা। তারপর অকস্মাৎ প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণ ঘটল। জলোচ্ছ্বাসের মত লাফদিয়ে উঠল শূন্যে বিশাল একটা আগুনের পতাকা। মুহূর্তের মধ্যে গোটা হ্যাঙ্গারকে গ্রাস করল শিখাটা। লাল আভা মুড়ে ফেলল ধোঁয়ার পেটটাকে। নারকীয় দৃশ্য একেই বলে! ভাবছে রানা। জ্বলন্ত ধ্বংসস্তূপ আলোড়িত হচ্ছে মন্থর ভঙ্গিতে, ড্রাগনের জিভের মত আগুন চাটছে হ্যাঙ্গারের বিধ্বস্ত দিকটাকে। মনে হল, চিৎকার শুনতে পাচ্ছে ও। ব্যাপারটা কল্পনাও হতে পারে।

পরবর্তী প্লেনটা আসার পথে লাল আগুনের আভা দেখে ভয় পেল। ইঞ্জিনের শব্দ বদলে উচ্চকিত হয়ে উঠল। মনে হলো, ওদের দিকে আসছে। হঠাৎ সেটাকে ধোঁয়ার নিচে দেখা গেল। কাত্ হবার প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছে ইতিমধ্যে। সোজা গানপিটের দিকে, একদিকে কাত্ হতে হতে নেমে আসছে।

'ডেঞ্জার!' আর্তনাদ করে উঠতে শুনল রানা জুমলাতকে। 'লোড!'

কামানের ব্যারেল অনুসরণ করছে প্লেনটাকে। মুহূর্তের মধ্যে বোঝা গেল গানপিটের পাশ ঘেঁষে উড়ে যাবে সেটা।

অসম সাহসের সাথে ধৈর্যের পরীক্ষা দিচ্ছে গওহর জুমলাত। গানপিটের পাশে প্লেনটা না পৌঁছানো পর্যন্ত অপেক্ষা করল সে। তারপর হুকুম করল, 'ফায়ার!'

কামান গর্জে উঠল। ব্যারেল থেকে আগুনের হলকা পুরোটা বেরোবার আগেই শেলটা বিস্ফোরিত হল। শেল ফাটার শব্দটা কামান দাগার শব্দের মত প্রচণ্ড আঘাত করল কানের পর্দায়। এত কাছে রয়েছে যে লক্ষ্য ব্যর্থ হওয়া অসম্ভব। ফিউজ রেঞ্জ পরিমাপ করার ব্যাপারে জুমলাতের নৈপুণ্য বিস্ময়কর। শেলটা ঠিক প্লেনের নাকের উপর চড়ে বসে ফাটল। ভোজবাজির মত এক পলকে ভাঁজ হয়ে গেল ডানা দুটো নিচের দিকে। তারপরই গোটা প্লেনটা টুকরো হয়ে গেল। মাঝখান থেকে দু'ভাগ হয়ে গেল ফিউজিলাজ। ঝরে পড়তে দেখল রানা বড় আকারের পুতলের মত লোক-গুলোকে। উপত্যকার গাছের মাথা স্পর্শ করল প্লেনের টুকরো অংশগুলো।

কার্পেটের মত গুটিয়ে কেউ যেন আকাশের দূর প্রান্তে ধোঁয়াটাকে সরিয়ে রেখেছে। নিচু মেঘের মত অ্যারোড্রোমের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে দেখা যাচ্ছে সেটাকে।

প্রায় নির্মেঘ আকাশ। অনেক উঁচুতে বড় একটা মেঘের টুকরো স্থির হয়ে আছে। তার গায়ে কালো বিন্দুর মত নড়ছে কয়েকটা ফাইটার। অ্যারোড্রোমের চারদিকে ঘুরছে প্রকাণ্ড আকারের ট্রুপ ক্যারিয়ারগুলো। কখন তাদের শিকার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে নিঃসাড় হয়ে যাবে, হিংস্র শকুনের মত তারই অপেক্ষায় চক্কর মারছে যেন ওরা। ওদের মাঝখানে খেপা ষাঁড়ের মত ছুটোছুটি করছে নিচের স্তরের

ফাইটারগুলো।

ওদের এখন করার আছে কি? পেটের ভিতর শয়ে শয়ে প্যারাট্রুপ রয়েছে, ভাবছে রানা, থ্যাঙ্ক গড, প্যারাট্রুপের বদলে যে কয়েক টন করে বোমা নিয়ে আসেনি ওরা! পরিকল্পনাটা ব্যর্থ হয়েছে বুঝতে পেরে বাড়িমুখো হচ্ছে না কেন ভেবে পেল না রানা। কিসের আশায় এই সময় কাটানো? সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না, নাকি নতুন কিছু ঘটার অপেক্ষায় আছে?

সকল সন্দেহের অবসান ঘটল পরমুহূর্তে। ডগ ফাইটের ক্ষেত্র ছাড়িয়ে, আরও উপর থেকে গোটা বিশেক ইসরায়েলি F-4 ফ্যান্টম 11-এর একটা ঝাঁক গোত্তা খেয়ে খাড়াভাবে অ্যারোড্রোমের দিকে নামতে শুরু করল। জুমলাতই প্রথম দেখতে পেয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল সেদিকে।

ওদের উত্তর দিকে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত বিশালাকার ফাইটারগুলো নেমে এল। মাত্র দু'হাজার ফুট উপরে থাকতে সমান্তরাল হলো ঝাঁকটা। চক্কর শুরু করে দিয়ে নতুন আকৃতিতে ঝাঁক বাঁধল দ্রুত। তারপর এক এক করে ডাইভ দিল সরাসরি অ্যারোড্রোমের দিকে।

পাইলটদের উদ্দেশ্য পরিষ্কার আঁচ করতে পারল রানা।

'টেক কাভার!' কি ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে হুঙ্কার ছাড়ল গওহর জুমলাত। যে যেখানে ছিল লাফ দিয়ে পড়ল বালির বস্তার গোড়া লক্ষ্য করে। রানার পাশে হুমড়ি খেয়ে পড়ল জুমলাত। ওর দেখাদেখি বালির বস্তার গায়ে পেট ঠেকিয়ে মাথা তুলে উঁকি দিয়ে তাকাল। প্রাচীরের উপর মাথা ওদের। পরিষ্কার দেখল ওরা আক্রমণের ভয়াবহ প্রকোপটা। চারদিক থেকে মেশিনগানের গর্জনে কানে তালা লাগার অবস্থা। ওদের উত্তরে Bofors পিটটাকেই সামলাতে হলো প্রথম আক্রমণের প্রচণ্ড চাপটাকে। অ্যারোড্রোমের অপরপ্রান্ত থেকেও একই ধরনের আক্রমণের শব্দ পাওয়া গেল।

হঠাৎ দলছুট একটা ফাইটার প্রকাণ্ড পাখির মত ছায়া ফেলে ছুটে এল ওদের দিকে। মেশিনগানের শব্দে দাঁতে দাঁতে বাড়ি লাগছে। পিটের কংক্রিটের মেঝে টুকরো টুকরো হয়ে তীরবেগে ছুটে গেল চারদিকে। ওদের বিপরীত দিকের বালির বস্তার উপর ক্ষুদ্র গর্ত করে ভিতরে ঢুকল ঝাঁক ঝাঁক বুলেট। একটা বস্তা খসে পড়ল। রানার মাথার উপর পড়ে ছিঁড়ে গেল সেটা। প্লেনটা ঠিক তখন ওদের মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে। অ্যারোড্রোমের চারদিক থেকে মেশিনগান এলোপাতাড়ি গুলি বর্ষণ শুরু করে দিয়েছে।

মাথা ঝাড়া দিয়ে বালিমুক্ত হচ্ছে রানা, গওহর জুমলাতের চিৎকার কানে ঢুকল ওর। 'গেট রেডি! কুতুব, অ্যামুনিশান। কাফা, নাম্বার সিক্স। রিমাইণ্ডার গেট আণ্ডার কাভার।'

চোখ মেলে রানা দেখল তিনজন যার যার আসনের দিকে পাগলের মত ছুটছে। জুমলাতের ব্যস্ততার কারণ কি বোঝার জন্যে ঘাড় সোজা করে সামনের দিকে ফিরল ও। একটা ট্রুপ ক্যারিয়ার। দেখতে পাচ্ছে রানা। ল্যাণ্ড করতে আসছে।

'ফিউজ ওয়ান। লোড!' সময় নেই বুঝতে পেরে হুকুম দিতে এক সেকেণ্ডও দেরি করল না জুমলাত, 'ফায়ার!'

আরও একটা গ্লোবমাস্টারের আগমন সংকেত বাজতে শুরু করেছে বাতাসে। অপর তিন ইঞ্চি কামানটাও ওদের কামানের সাথে একই সময়ে গর্জে ওঠায় আলাদা কোন শব্দ সেটার পাওয়া গেল না। বিমানটার ঠিক সামনে দুটো শেলই ফাটল। এক সেকেণ্ডেরও কম সময়ের মধ্যে Bofors-এর একটা ট্রেসার শেলকেও সেই একই জায়গায় ফাটতে দেখল রানা।

মাথার উপর দিয়ে একটা জ্বলন্ত নরকের মত স্যাঁৎ করে বেরিয়ে গেল বিমানটা। আগুনের উত্তাপ অনুভব করল ওরা চোখেমুখে। মনে হল, পঞ্চাশ গজ দূরে গিয়ে পড়বে। কিন্তু না, পাহাড়ের নিচের দিকে উপত্যকার সীমানা ছাড়িয়ে আরও নিচে নেমে গেল সেটা।

এই একই ঘটনা ঘটল পরপর তিনবার। চতুর্থবার জুমলাতের ধাক্কা খেয়ে কংক্রিটের উপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেল রানা, যেন ওকে রক্ষা করার জন্যেই ওর উপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল জুমলাত। তৎক্ষণাৎ মারা গেল আফাজী। তার তলপেট থেকে মাথার চুল পর্যন্ত এক লাইনে পাশাপাশি অসংখ্য বুলেটের গর্ত। কুতুবের পায়ে একটা বুলেট লাগলেও, ব্যাপারটা সম্পর্কে সে সচেতন বলে মনে হল না রানার। জুমলাত নেমে পড়েছে ওর শরীর থেকে।

পিছনে তাকিয়ে বিস্মিত হলো রানা। আগুন ধরে গেছে প্লেনটায়। কিন্তু এখনও মেশিনগানের গুলি ছুঁড়ছে।

তারপর হঠাৎ করে ডায়নামিকস আর গ্লোবমাস্টার নাক ঘুরিয়ে রওনা হল বাড়ির দিকে। ফাইটারগুলো চক্কর মারছে ট্রুপ-ক্যারিয়ারগুলোকে ঘিরে, যাতে পালানোটা নিরাপদে সারা যায়। মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে থেমে গেল সব। গোটা আকাশ নিষ্কলুষ দেখাচ্ছে এখন। পলায়নপর শত্রুবিমানের ঝাঁক দিগন্তরেখার সাথে মিশে যাচ্ছে। তাদের ভোঁতা গুঞ্জনও এখন আর শুনতে পাওয়া যাচ্ছে না। গোটা স্টেশন শান্ত হয়ে গেছে। একমাত্র শব্দ করছে B হ্যাঙ্গারের বিশাল আগুনের কয়েকটা পতাকা। কামানের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রানা। অবশেষে শান্তি। এবং সবশেষে; বিদায়। ভাবছে রানা।

কিন্তু শান্তি? কোথায়? জানে না রানা। কোথায় এর শুরু, কোথায় এর শেষ, জানে না। নাকি, শান্তি নেই-ই মানব জীবনে?

বিদায়ই বা পাওয়া যায় কি? বিদায় নিয়ে কোথায় যাবে সে শেষ পর্যন্ত? কত দূর? কার কাছে? কেউ তো নেই ওর, তবে?

কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল রানা কামানের গায়ে ওভাবে হেলান দিয়ে, জানে না ও।

'দোস্ত!' চমকে উঠল রানা কাফার ডাকে। 'দোস্ত, কি হয়েছে তোমার?'

ইফফাতকে দেখল রানা কাফার পাশে। হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে আছে দু'জন ওর সামনে।

গোটা ডিটাচমেন্ট ওদের দু'জনের পিছনে। সবাই অবাক হয়ে গেছে। চোখে

পলক নেই। দেখছে ওরা। রানাকে।
হঠাৎ মৃদু হাসল রানা। কাঁধ ঝাঁকাল কি ভেবে। ইফফাতের মুখের দিকে ক'সেকেণ্ড চেয়ে রইল ও। তারপর তাকাল কাফার দিকে। 'এটাই তাহলে তোমার শেষ চমক?'
হাসছে ওরা।
'হ্যাঁ,' বলল ইফফাত, 'কিছু একটা গোলমাল চলছে সন্দেহ করেই পাঠানো হয়েছিল আমাদের। আমরা…।'
'আঙ্গুল চুষছিলাম,' বলল কাফা। 'প্রথমে তো সন্দেহ করে বসেছিলাম তোমাকেই।'
'তোমরা দু'জনেই কি লেবানন এয়ারফোর্সের ইন্টেলিজেন্সে আছো'?'
হাসল কাফা। 'এবং ইফফাত আমার স্ত্রী, ভবিষ্যৎ সন্তানের জননী। বাপ-মা দু'জনকেই এখন কেটে পড়তে হবে—এখানকার কাজ শেষ।'
'সুখী, সুন্দর হোক তোমাদের জীবন,' বলল রানা। গওহর জুমলাত, তারপর একে একে আর সকলের দিকে তাকাল রানা। 'বিদায়, বন্ধুরা!'
আর একটা শব্দও উচ্চারণ করতে পারল না সে। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল। হাঁটতে শুরু করল।
গানপিট থেকে বেরিয়ে আসছে রানা হেঁটে। মূর্তির মত পিছনে দাঁড়িয়ে আছে সবাই। গানপিট থেকে বেরিয়ে মাথার স্টীল হেলমেটটা খুলে হাতে নিল রানা। পিছন ফিরে তাকাল একবার। হেলমেটটা নাড়ল।
গানপিটের ওরা সবাই হেলমেট নামাল মাথা থেকে। নাড়ল রানার উদ্দেশে।
হাঁটছে রানা। দৃঢ়, দ্রুত পায়ে। ক্রমশ ছোট হয়ে যাচ্ছে শরীরটা। আরও, আরও ছোট দেখাচ্ছে ওকে।
রানওয়ে ধরে হাঁটছে রানা। হঠাৎ সামনের বাঁকে দেখা গেল মিগটাকে। ঝড় তুলে তীব্র বেগে ছুটে আসছে সেটা।
রানওয়ের একধারে সরে গেল রানা। হাঁটছে এখনও। ক্রমশ বড় হচ্ছে মিগের আকৃতি।
রানার কাছ থেকে পঞ্চাশ গজের মত দূরত্বে থামল মিগটা। ককপিটের দরজা খুলে গেল। খানিকপরে নামল পাইলট। একটু সরে রানার পথ রোধ করে দাঁড়াল সে। তারপর মাথার হেলমেট ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল পিছন দিকে।
ইউনুস মেহের। সটান দাঁড়িয়ে আছে সে। হাসছে। সামনে গিয়ে থামল রানা।
নিখুঁত সামরিক কায়দায় ঠকাস করে স্যালুট করল স্কোয়াড্রন লিডার ইউনুস মেহের রানাকে। মুচকি হেসে কপালে হাত ঠেকাল রানা। কথা না বলে এক পাশে সরে গেল স্কোয়াড্রন লিডার। আবার হাঁটতে শুরু করল রানা।
পিছন ফিরে রানাকে দেখছে ইউনুস। ক্রমশ ছোট হয়ে যাচ্ছে রানা। স্টেশন হেডকোয়ার্টারের মেইন গেটের দিকে হাঁটছে ও। একসময় ছোট হতে হতে বহুদূরে মিলিয়ে গেল ও। দেখা গেল না আর।